উপাসনা

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।)

পৃষ্ঠপোষক

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহোদয়।

সম্পাদক

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

ষষ্ঠবর্ষ।
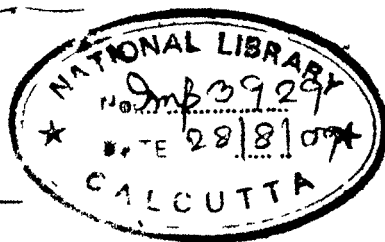
কাশিমবাজার, সত্যরত্ন যন্ত্রে
শ্রীললিতমোহন চৌধুরী প্রিণ্টার
দ্বারা প্রকাশিত।

সূচীপত্র।

—০ঃ০ঃ০—

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পত্রাঙ্ক।

উপাসনা।

গীতিকাব্যে রবীন্দ্রনাথ

(৩)

উৎসবের আগের দিন তাই বলিতেছে—মরণের সুখে প্রাণ তাহার উচ্ছ্বাসিত। সুখের মাদকতায়—সমাধির শীতলতা, মৃত্যুর দংষ্ট্রা সব তার অনেন্দেরই অঙ্গ হইয়া যাইতেছে।—বলিতেছে—

"To-morrow 'ill be of all the year
The maddest and the merriest day,
For I'm to be Queen of the May,
Mother, I'm to be Queen of the May."

কবি মরণ মাধুরীকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় সরস,—সকল তাপের সান্ত্বনা ও সকল শ্রমের বিশ্রাম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—মরণ সে ত,—

"Mother !
To lie within the light of God,
As I lie upon your breast,
And the wicked cease from troubling
And tne weary are at rest."

কবি পুনরায় অন্য স্থলে মরণমধুরিমাকে প্রেমের গরিমা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়াছেন—"Make love himself more dear"—মৃত্যুমাধুরী প্রেমমাধুরীর সহিত মিশিয়া প্রেমকে মহিমান্বিত ও মধুরতর করিয়াছে—

"Death may give more life to love,
Than is or ever was in our low world."

(Tennyson)

জীবাত্মা সে ত দেহের বন্ধন ছাড়িয়া মুক্ত হইতে পাইলে বাঁচে। তাহার মহাতপস্যার ধন পরমাত্মা তাহাকে ডাকিয়াছে,—সংসারই ত কেবল আঁখি জলের বাঁধন দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে—তাহার বিভীষিকা জন্মাইয়া দিতে চাহে। শ্মশানবাসীর কলকল শব্দ সঙ্গে ববম্‌ শব্দে দিক পূরিয়া, বিষাণ ফুকারি, গলায় কপালাভরণ লইয়া ত্রিলোচন যখন বিবাহে আসেন তখন—গৌরীর

"বাম আঁখি ফুরে থর থর
তার হিয়া দুরু দুরু দুলিছে
তার পুলকিত তনু জর জর
তার মন আপনারে ভুলিছে।"

তখন তাহার পিত্র মনে পরমাদ মানে এবং মাতা ক্ষ্যাপা বরেরে বরণ করিতে শিরে করা-

ঘাত করে। কিন্তু গৌরী কি তাহে ভয় পায়? চির তপস্যার বাঞ্ছিতের আশায়—সুখে তাহার আঁখি ছল ছল করে।

করালীর ভৈরবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া হিন্দু একদিনও ভয় পায় নাই, চিরদিন তাঁহাকে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়া তাঁহার চরণযুগ আঁকড়িয়া ধরিয়াছে—উল্লাসে করালীর সহ নৃত্য করিয়াছে।—নরশির ও খড়্গ বাম করে দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণহস্তে শঙ্কাহরণ বরাভয় দেখিয়াছে। সেই বরাভয়ের ভরসাতেই হিন্দু মরণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছে।

জানি না কবি কি ভরসা মরণের মধ্যে দেখিয়াছেন—তাই তাঁহাকে এত প্রেমভাবে বরণ করিয়াছেন—তাই কখনও বলিতেছেন "তুমি হেসে কাছে এসে ঢাকিয়া অঞ্চল শেষে তুলে লয়ে যাও কোলে করে।"—রাধার নয়নে শ্যামের মতন সুন্দর বাঞ্ছিত মরণকে আপন পরাণ বধূ সঁপিয়া দিয়া বলিতেছেন "মন্ত্র পড়ি নিও, রক্তিম অধরতার নিবিড় চুম্বন দানে পাণ্ডু করি দিও।" জানি না আবার কোন্ অতলবিলয়—কোন্ মহানির্ব্বাণের মূর্ত্তি আপনাতে কল্পনা করিয়া হৃদয় যমুনার অগাধজলে মরণ সুখ দান করিতে ডাকিতেছেন—"যদি মরণ লভিতে চাও, এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে।" —জানি না কোন্ ভরসায় মরণের তরী দেখিয়া মহা বরষার রাঙা জল নীরবে তরণ করিতে চাহিয়াছেন। ভরসা অনেক আছে—এক বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্য বাস পরিধান বই ত নয়। আর, "এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।

যে প্রবাসে রাথ সেথা প্রেমে রাথ বেঁধে।" বড় সাধ—"বিকশিত হ'বো আমি ভুবনে ভুবনে—নব নব পুষ্পদলে।" বড় আনন্দ—"নব নব মৃত্যুপথে, তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।" যদিও "স্তন হ'তে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে"—কিন্তু সে যে "মুহূর্ত্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের কবি—তাঁহার এক একটি কবিতা সৌন্দর্য্য সাগরের এক একটি তরঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের উপাসনা সুন্দরের উপাসনা। যে চিরসুন্দর, সত্যমঙ্গল, প্রেমময়, অন্ধকারে ধ্রুবজ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহারি উপাসনা। কবির আনন্দস্রোত অন্তরের অন্তরতম গুহা হইতে বহির্গত হইয়া সৌন্দর্য্যের ভূখণ্ড দিয়া ভগবদ্ভক্তির মহাসিন্ধুতে নিপতিত হইতেছে, কবি যেন প্রকৃতির মহারঙ্গমঞ্চে যবনিকার পর যবনিকা তুলিয়া আমাদিগকে স্বর্ণকুহেলিকায় মুগ্ধ করিয়া পরিশেষে চিরসুন্দরের পাদপীঠে লইয়া যাইতেছেন। কলিকা হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল, ফল হইতে বীজ, শেষে বীজ হইতে মহাতরুর উৎপত্তি দেখাইতেছেন; সৌন্দর্য্য হইতে আনন্দ—আনন্দ হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে সত্য—সত্য হইতে মহাসত্যে উপনীত হইতেছেন। আর একজন কবি এই সত্যসুন্দর ও আনন্দের উপাসনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি Keats. যাঁহার সাধন মন্ত্র ছিল "A thing of beauty is joy for ever." যাঁহার বিশ্বাস ও জ্ঞান Beauty is truth, truth is beauty." সেই কবিও একদিন নিবিড় সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিমল আনন্দ ভোগ এবং বিমল আনন্দ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। "Ode to Nightingale, Ode to Autumn ইত্যাদি Ode গুলিতে Keats প্রকৃতির সকল মাদকতা, সকল সৌন্দর্য্য এবং বর্ণগন্ধনামের সকল বৈচিত্র্য চয়ন করিয়া এক একটি অপার্থিবী আলোকপ্রতিমা

গঠিয়া তুলিয়াছেন—কিন্তু Keats সৌন্দর্য্যকে ঐহিকতার মধ্যে ভোগের দ্বারা,—রবীন্দ্রনাথ স্বর্গীয়তার মধ্যে আনন্দের দ্বারা বাঁধিতে চাহিয়াছেন।

গগনে চন্দ্রোদয় দেখিয়া ভ্রান্ত অপরিপক্কমতি শিশু যেমন একেবারে হাত বাড়াইয়া "আকাশের চাঁদ ধরিতে" ব্যাকুল হইয়া উঠে, তরুণ কবিচিত্তও তেমনি প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জীবনের প্রথম যৌবনে লালসা বিলাসে উন্মত্ত ও মদির মোহে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্য্যকে বক্ষে পাইতে চায়, তাহাকে ইন্দ্রিয়ের সীমায়, ভোগের আয়ত্তে পাইতে ব্যাকুল হইয়া কস্তূরীমৃগসম বৃথা ঘুরিয়া মরে।—তৃষ্ণার মূর্ত্তি ধরিয়া অনন্ত ক্ষুধাভরা হৃদয়ে রূপবহ্নির স্ফটিকাবরণের চারিধারে পতঙ্গের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বৃথা শ্রান্ত হয়। তার পর—লালসার অবসন্ন অতৃপ্তিতে দগ্ধ ও লাঞ্ছিত হইয়া উজ্জ্বল আলোক মোহ ও সৌন্দর্য্যের তেজোরেখাশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী মহাতেজোবিন্দুটিকে আবিষ্কার করিয়া তাহার পানে শ্রদ্ধা বিস্ময় ও সন্তোষের সহিত চাহিয়া থাকে—প্রেম তখন ভক্তিরূপে জ্বলিয়া উঠে, মোহ তখন মুক্তিরূপে জাগিয়া উঠে।

সৌন্দর্য্যের কবি Keats এবং রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন ঐ একইরূপে আরম্ভ হইয়াছিল—Blackwood ও Quaterly Reviewএর বিষাক্ত তীক্ষ্ণ শেলে আহতমন্ম Keats বিধাতার অঙ্গুলিস্পর্শে—লালসার শরশয্যাতেই নয়ন মুদিয়াছিলেন—অকালমৃত্যু সে মহাস্থবির ভোগস্পৃহাকে সংযম ও নিবৃত্তির পথে আনিতে অবসর দেয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রের ভোগ ও লালসার ব্যাকুলতা—সংযম ও সন্তোষের আনন্দে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু একদিন—কবির এমন দিন গিয়াছে, যখন কত ফুল লয়ে বসন্ত আসে, তাহাও নয়নে পড়িত না, তখন কেবল চয়নে ব্যস্ত ছিলেন। তাই এক দিন আলোকবসনা, বাসনাবাসিনী, মানসীরূপিণী সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিকে নগ্নবক্ষে বাহুপাশে পাইবার জন্য মূর্ত্তি ধরিয়া আসিতে সাধিয়াছিলেন—তাই জ্যোৎস্নাময়ী—রজনীরাণীর বাসরপ্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া মানবত্বের ব্যবধানে থাকিয়া—উৎসব গৃহের নূপুরশিঞ্জিত শব্দে কুসুমসুরভিত সমীরস্পর্শে ও কনকপাত্রভরা কিরণামৃতের গন্ধে ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিয়াছেন।

কিন্তু সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে—নয়ন ধাঁধান আলোকবলয় ভেদ করিয়া মহাতেজোবিন্দুতে নেত্র পড়িয়াছে—বাহিরের মাদকতায় বিলাসচঞ্চল চিরপুরাতন বসন্ত দেখিয়া ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হইয়াছে, তাই হৃদয়ে নববসন্ত দেখিতে পাইয়াছেন—নূতন ভুবনে আসিয়া যেন নূতন সুন্দর মূর্ত্তি নয়নে পড়িল—যার—

"নীল অম্বর চুম্বননত
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত
অঞ্চল ঘেরি গুঞ্জরে কত
সঙ্গীত শতবার।
যথা—ঝলকিছে কত ইন্দু কিরণ
পুলকিছে ফুল গন্ধ
যার—ললিত অঙ্গে চরণ ভঙ্গে
চমকে চকিত ছন্দ।"

এ মূর্ত্তি হেরিয়া কবি আত্মহারা হ'ননি, আপনাতে নিজ আত্মা ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাই তাঁর মর্ম্মের শত বন্ধন ছিঁড়িয়া শত-

ক্রন্দন, ফুল্লচন্দন, বন্দন উপহার সানন্দে আনন্দময়ের চরণারবিন্দ পানে ছুটিয়াছে।

কবি, বিশ্বসরসীর সমগ্র সৌন্দর্য্যশক্তি আপনাতে পুঞ্জীভূত করিয়া রক্তকমলরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া হৃদয়ের সমগ্র বিকাশানন্দ সচ্চিদানন্দের চরণকমলে সমর্পণ করিতেছেন, প্রাণভরে তাই গাহিতেছেন—

"দিকে দিগন্তে যত আনন্দ,
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ ;
আমারি চিত্তে মিলি একত্রে
তোমারি মন্দির উচ্ছ্বাসে।"

সৌন্দর্য্যের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে কবি আত্মহারা হইয়া দেখিতেছেন অন্তরের শিরা উপশিরা লাবণ্য প্রবাহে ভরিয়া উঠিয়াছে, মহানন্দে চেতনা বেদনা—বন্ধ টুটিয়া যাইতেছে,—তখন দুঃখ দৈন্য অতৃপ্তি শোকজরা মরণের বন্যাজলের কল কল নাদ, ঘূর্ণন,—আবর্ত্তন, উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষোভ, সবই সৌন্দর্য্যেরই অঙ্গ হইয়া যাইতেছে। কবি নেত্র মুদিয়া দেখিতেছেন—

"আজি যত তারা তব আকাশে।
মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে॥
নিখিল তোমারি এসেছে ছুটিয়া
মোর মাঝে যেন পড়েছে লুটিয়া।
নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত,
আমারি অঙ্গে বিকাশে।"

নিখিলের সমগ্র সৌন্দর্য্য আপনাতে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পাইতেছেন ; সৌন্দর্য্যকে এইরূপ একবার পরিধিতে প্রসারিত হইতে, অন্যবার কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত হইতে দেখা, সৌন্দর্য্যের সহিত এই দোললীলা করিতে যাইয়া রবীন্দ্রের কবিতা এত সুন্দর হইয়াছে। অনঙ্গ যখন অঙ্গ ধরিয়া কুসুমরথে মধুপবনে ভ্রমণ করিত তখন কবি একবার তাহাকে দেখাইতেছেন ;—যখন কুমারী দলে সন্ধ্যাকালে তাহার বিজন দেউলে প্রদীপ জ্বালিত, তরুণ-তরণী অঞ্চল হইতে অশোক চাঁপা ছড়াইত, আবার সেই ভস্মীভূত পঞ্চশরকে বিশ্বময় ছড়ান দেখিতে পাইতেছেন। বকুল তরু পল্লবে, পুষ্প পথে, আকাশে, বাতাসে, তাহার ভাষা পরশ অশ্রু ও বিলাপ দেখিতেছেন।

"বসন কার দেখিতে পাই
জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত,
নয়ন কার নীরব নীল গগনে।
বদন কার দেখিতে পাই
কিরণে অবগুণ্ঠিত,
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে॥"

আবার মিলনে যাহা বাঁধা ছিল, জীবনবনে সৌন্দর্য্যে কুসুমিত হইয়া, প্রণয়ে বিকসিত হইয়া যাহা ছিল ; তাহাকে "বিরহে টুটিয়া বাধা, আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ প্রিয়ে, তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে"। ধূপে যাহা পুঞ্জীভূত ছিল—তাহা দগ্ধ হওয়ায় দেখিতেছেন "গন্ধ পুষ্প তার পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।" 'জীবনে' যাহা হৃদয়াকাশে ধ্রুবতারা হইয়াছিল, 'মরণে' তাহা বিশ্বের অন্দকারে ধ্রুবজ্যোতি হইয়া জাগিতেছে। এক দিন যে সৌন্দর্য্যের আদর্শরূপিণীকে "জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—ওগো বিচিত্ররূপিণী" বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন, নীলগগনে যাহাকে অযুত আলোকে ঝলসিতে—ফুলকাননে যাহাকে আকুল পুলকে উলসিতে, চলচরণে যাহাকে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকসিতে দেখিয়াছিলেন—সেই বিশ্বব্যাপিনী

সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিকেই আবার উর্ব্বশীতে কেন্দ্রী-ভূতা দেখিয়াছেন—

"জগতের অশ্রুধারে ধৌত
যার তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে
আঁকা যার চরণ শোণিমা"

অখিল মানস স্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী—মুক্ত-বেণী বিবসনা সেই উর্ব্বশী মূর্ত্তিকে বিশ্বজননীর [illegible] সিত অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রাখিতে দেখিয়াছেন। সংস্কৃত মহাকবি যে উর্ব্বশীর অলক্তকাক্ষা চারুপদ পংক্তিগুলিকে মেঘাতি-বৃষ্ট সিকতা বনস্থলীপরে গুরু নিতম্বভারে পশ্চান্নতা দেখিয়াছিলেন—রবীন্দ্রের উর্ব্বসী সে উর্ব্বসী নহে। কবি নিখিলের সকল বৈচিত্র্য চয়ন করিয়া, বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য একত্র [illegible]ভূত করিয়া যে মূর্ত্তি দেখাইলেন তাহা [illegible] মানসস্বর্গে ভোগের রাজ্যের সহস্র যোজন দূরে কোটী বিদ্যুৎরেখা, স্থির অচঞ্চল হইয়া রূপের গাঢ়তা প্রাখর্য্য মাদকতা ও মোহে মানব নয়নকে ঝলসিয়া দিতে থাকে।

এই বিশ্বসৌন্দর্য্যের সঙ্কোচন ও প্রসারণ, এই খেলায় কবি মাতিয়া গিয়াছেন। কবি ধীবরের ন্যায় সৌন্দর্য্যের জাল ফেলিতেছেন এবং গুটাইতেছেন,—লাভ হইতে আনন্দের মুক্তা প্রবাল গুলি। তাহাই জীবনে দেবতার চরনে অর্পন করিতেছেন। কবি এই লীলার-বিশ্বের মহাসত্যকে প্রকাশ করিতেছেন। এই খেলাধুলায় বিশ্বের মহাসত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই কেন্দ্রীভূত হওয়া আর পরিধিতে ছুটিয়া পড়া,—এই কলিকা হইতে পুষ্পবিকাশ, আর পুষ্প হইতে কলিকাতে মুদিত হওয়া, বীজ হইতে তরু এবং তরু হইতে বীজ,—আর "কখনও বা ভাবময় কখনও মূরতি।" এবং সর্ব্বশেষে এই যে সৃষ্টি প্রলয়, এই বিশ্বসৃষ্টিতে প্রকট হওয়া, আর সূক্ষ্মতর পরব্রহ্ম চৈতন্যে বিলীন হওয়া, এই 'যথোর্ণনাভ সৃজতে গৃহ্নতে চ।'—এই মহাসত্যকে কবি লীলার ছলে সঙ্গীতে গাহিয়াছেন। দর্শনের রুদ্রতেজ তাপসকে যেন ধ্যান ভাঙিয়া কবিতার বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তির চরণে তপস্যার ফল দান করিয়া ফুলের মালায় বাঁধা পড়িতে হইয়াছে। কবি, দার্শনিক সত্যের রুদ্রাণী তারামূর্ত্তিকে কবিতার কমলামূর্ত্তিতে আনিয়া অভয়ানন্দে গাহিয়াছেন—

"ধূপ আপনার মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝের ছাড়া।
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হ'তে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
রূপ হ'তে ভাবে অবিরাম যাওয়া আসা;
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতার উপর কোনও কোনও ইংরাজ কবির প্রভাব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে বড় বিশেষ কৃতকার্য্য হই নাই। ইংরেজ কবির সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার ভাব মিলিতে পারে, কিন্তু কোন্ কাব্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ কোন্ কাব্য লিখিয়াছেন;—অথবা কোন্ কবিতা তাঁহার মনে কোন্

ভাবের উদয় করিয়া দিয়াছে,—অথবা কাহার চিন্তাপ্রণালী ইনি কি ভাবে গ্রহণ করিয়া, আপন সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছেন,—তাহা বলা দুঃসাধ্য। তবে যুগধর্ম্মগুণে এবং ইংরেজী সাহিত্যসেবার ফলে একটা Indirect influence তাহার কবিতার কাজ করিয়া থাকিবে। তবে, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্য ও সত্যের একত্ব দেখিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্য ও সত্যের দাস বলিয়াই যে তিনি এ ভাবটি Keats হইতে লইয়াছেন, কেননা Keats বলিয়াছেন,—Beauty is truth, truth beauty—that is all Ye know on earth and all ye need to know" ইহা মনে করিবার কি কারণ আছে? Tennyson এর Locksley Hall এর অন্তর্মর্ম্মের সহিত বিদায় ও অভিশাপের অন্তর্মর্ম্মের মিল আছে বলিয়াই যে এ ভাবটি Tennyson হইতে লওয়া তাহা কি কেহ ভাবিতে পারে? অথবা, Shelley র Adonais এর (He is made one with nature etc.) সহিত রবীন্দ্রের মরণবিষয়ক কবিতার (বিলয় ইত্যাদি কবিতার) ভাবসাম্য আছে এবং Elizabeth Barret Browning-এর Inclusions এর ভাবটি রবিবাবুর "হৃদয় যমুনার" প্রতিবিম্ব হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এ ভাবগুলি ইংরেজ কবির নিকট লইয়াছেন—তাহাও সাহস করিয়া বলা যায় না। রবীন্দ্রের "একান্ত নির্জ্জন সন্ধ্যার তারার মত" অথবা "তারায় তারায় তার ব্যথা গিয়া বাজে" ইহা Wordsworth এর "Like a star when only one shining in the sky" এবং Tennyson এর "Star to star vibrates the light" এর অনুবাদ, তাহাও ভাবা বাতুলতা। আমাদের দেশেও তারা ফুটে, ফুল ফুটে, নদী বহে, চাঁদ উঠে। ভারতের প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা মনোমোহিনী। এবং প্রকৃতির সহিত ভারতীয় কবির পরিচয়সাধন ইংরেজ কবিকে করিয়া দিতে হইবে না। তদ্ব্যতীত, ভারতের মহাকাব্য,—ভারতের আদর্শ, ভাবরাজ্য,—ভারতের শিল্পাগারের কবিনির্ম্মাণের উপাদানগুলি সকল অপেক্ষা মহৎ এবং তেজস্বী।

তাই বলিতেছি—বঙ্গীয় কবি যদি যথার্থ কাহারও নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, যদি যথার্থ ঋণ কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া থাকেন,—তাহা হইলে, তাহা তাঁহার জাতীয় গুরু হইতে এবং ঘরের মহাত্মার নিকট হইতেই করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত কবির দাস—মৈথিলী কবির শিষ্য; এবং বঙ্গীয় কবিদের ভক্ত। ভাষা, ভাব, গঠন নৈপুণ্য,—বর্ণনা,—প্রেমের আদর্শ,—সৌন্দর্য্য বুদ্ধি, ছন্দ, অনুপ্রাস, অলঙ্কার ইত্যাদি সকল বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশীয় কবির নিকট কিছু না কিছু ঋণী। তেজোবীর্য্যবান্ জগৎপ্রকাশক সূর্য্যের আলোকে যেমন চন্দ্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য,—সংস্কৃত কবিদের প্রভাবে তেমনি রবীন্দ্রের মধুরতা অনুস্পর্শী। আমার দেশের কবি—আমার জাতীয় ভাষার কবি, যাহাদের সহিত আমাদের ধর্ম্ম জাতিভাব রুচি সব মিলিয়া যায়,—আমাদের সাহিত্যের স্মরণ চিহ্নগুলি আধুনিক কবিতায় দেখিতে পাইলে কত তৃপ্তি সুখ আনন্দ ও গৌরব অনুভূত হয়!

এই অধঃপতিত দেশে—এই দৈন্য দুঃখ, পীড়ণময় দুর্দ্দিনে আবার যে কবি পুনঃ সেই

প্রাচীন কবির কনকপাত্র হইতে রবীন্দ্রের কণ্ঠে এক বিন্দু বাসন্তমকরন্দ পতিত হইয়া যেন কবির "বসন্ত" কবিতার জন্মদান করিয়াছে। কবি বলেন, মানস লোকের কবি—এক মানসলোক হইতে অন্য মানসলোক যাইবার সময় মরজগতে যে একটি বিদ্যুৎরেখা আঁকিয়া গিয়াছেন—তাহাই তাঁহার উজ্জয়িনী জীবন,—আমাদের কবি সেই মানসকবির চঞ্চল অদ্ভুত জীবনের গোপন বারতা দুই একটি জানিয়া লইয়াছেন—তাহা তিনি তাঁহার—"কাব্য" "ঋতুসংহার" "মেঘদূত" ইত্যাদি কবিতাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—তাই তিনি বলিতেছেন, চিরদিন যেমন সুখের সংসারে শোকের আবির্ভাব হয়—চিরদিন যেমন প্রমত্ত আনন্দের শীর্ষে অভিশাপের বজ্রনিপাত হইয়া থাকে, তেমনি যক্ষের ভাগ্যেও হইয়াছিল,কবির ভাগ্যেও ঘটিয়াছিল। ঋতুসংহার শুধু ঋতুবর্ণনা নহে, তাহা কবির মিলনানন্দের অসংযত উচ্ছ্বাস। মেঘদূতও শুধু যক্ষের বিরহগাথা বা মেঘাদি বর্ণনা নহে, তাহা কবির নিজের বিরহতাপিত হৃদয়ের সাবেগাশ্রু ব্যাকুলতা। বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোকে, সহানুভূতি দান করিয়া এবং নিজের বিরহবেদনায় বিশ্বের সহানুভূতিলাভ করিয়া, ঋতুসংহারের সুখের প্রতিক্রিয়ায় উত্থিত মেঘদূতের সঘনসঙ্গীত আপনার মেঘমন্দ্র শ্লোক বহন করিতেছে। এত সব গোপন বারতা জানিতে রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয়ই 'হর-গৌরীর সভাকবি'র সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিতে হইয়াছে। হয় ত শিষ্য হইয়া বহুদিন সেবা করিতে হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবিগণের প্রভাব রবীন্দ্রনাথে এত বেশী, যে রবীন্দ্রকে তাঁহাদেরই শিষ্য বলা যাইতে পারে; অথবা সর্ব্বশেষ বৈষ্ণবকবি বলিলেও চলে। চৈতন্যযুগের সহিত রবীন্দ্রের যুগের বন্ধনশৃঙ্খল ব্রজাঙ্গনা কাব্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণবকবিতার মত এমন উপাদেয় বৈষ্ণবকবিতা বহুদিন বঙ্গদেশে দেখা যায় নাই। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী এবং অন্যান্য ঐ জাতীয় গান ও কবিতাগুলি—রবীন্দ্রের বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ, অধ্যয়ন, ভক্তিভাবে সেবা এবং প্রাণের যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত অনুকরণের ফল। তাঁহাদের ভাব এবং ভাষা এমন সুন্দর অনুকরণ করিতে পারিয়াছেন—যে ইঁহাকে তাঁহাদের মধ্য হইতে চিনিয়া বাহির করা কঠিন। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সমালোচককে ভানুসিংহ কোন্ যুগের লোক তাহা বাহির করিতে হিমালয় পানে ছুটিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রের ভাষামাধুর্য্য, ছন্দবৈচিত্র্য, —প্রেমগদ্গদ্ রসাবেশ সাত্ত্বিক প্রেমের স্বেদ বেপথু রোমাঞ্চ, তাঁহার 'দেবতারে প্রিয় করা প্রিয়েরে দেবতা।" 'যারে বলে ভালবাসা তারে বলে পূজা।' এবং মরণকে শ্যামের মতন সুন্দরদর্শন—এগুলি সবই বৈষ্ণব-কবিদের নিকট শিক্ষা। চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গুরু। যাঁহার উক্তি "পীরিতি লাগিয়ে পরাণ ত্যজিলে পীরিতি মিলয়ে তথা।" অথবা "দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও থাকিলে পীরিতি আশ।" প্রাণের সহিত গুঞ্জন করিয়া যাহার কাছে কামগন্ধহীন পীরিতি বড় হইয়াছিল; সেই মহাকবিই রবীন্দ্রকে প্রেমের আদর্শ দান করিয়াছেন। রায়বসন্ত তাঁহাকে এ বাস্তব-জগৎ অতীত একটি স্বপ্নবাসনাময় প্রেমজগৎ রচনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। রবীন্দ্রের বিরহ ও নিরাশপ্রণয় বিষয়ক কবিতাগুলিতে

পুরাতন সুখের দিনের কথাগুলি মনে পাড়াইয়া দেয়—সে কবি আমাদের কি প্রিয় কবি নহে? রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমাদিগকে সহস্রবার সেই পুরাতন সুখের দিনে ফিরিয়া যাইতে হয়। কবি কখনও আমাদিগকে স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে;—মহর্ষি বাল্মীকির সন্নিধানে, কখনও অন্ধকার বনচ্ছায়ায় সরস্বতীতীরে—শুক গৌতমের কুটীর প্রাঙ্গনে 'হোমের আলোকে'—'যথায় মালিনীনদী বহে যায় নিরবধি—ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে,' যেথানে 'দময়ন্তী আলবালে—স্বর্ণঘটে জল ঢালে নিকুঞ্জবিতানে,'—অথবা 'প্রচ্ছায় তমসাতীরে'—যথায় 'শিশু কুশলব ফিরে সীতা হেরে হরিষে বিষাদে,'—আচ্ছোদ সরসীকূলে মহাশ্বেতার তপঃকুঞ্জে, কিংবা যথা বিন্ধ্যপাদমূলে উপল ব্যথিত রেবা বহিয়াছে, বেত্রবতীকূলে জম্বু-বনছায়ে যথায় দশার্ণ নাম লুকায়ে আছে এবং কখনও বা অলকানগরে যথায় অনন্ত বসন্তে নিত্য পুষ্পবনে নিত্য চন্দ্রালোকে—সরোবর কূলে মণিহর্ম্যে—বিরহবেদনাতুরা যক্ষনারী বীণাক্রোড়ে কাঁদিতেছে—তথায় লইয়া গিয়াছেন।•

সন্ধ্যাভ্রশিখরে উমাপতি ধ্যান ভাঙিয়া ভূমানন্দভরে, সজলজলদ গর্জ্জন মৃদঙ্গরব দণ্ডতালে যখন নৃত্য করিতেন,—কবি—মহাকবি কালিদাসকে কখনও তাঁহার তাৎকালিক বন্দনা গাহিতে, গৌরীর নয়নে ব্যাকুল সরমখানি নামিতে দেখিয়া কখনও তাহাকে অসমাপ্ত কুমারসম্ভব গানে থামিতে, আবার তাঁহার প্রিয়কবিকে ছয়ঋতু,—ছয় সেবাদাসীর দ্বারা পরিষেবিত দেখিয়াছেন,—নব নব পাত্রভরি ঢালি দেয় তারা—নব নব বর্ণময়ী মদিরার ধারা।" আবার আমরা রবীন্দ্রের কবিতায়—'সামগীতি বন-বীথি হোমাগ্নি",—'বৌদ্ধমঠ, বিহার স্তূপ ভিক্ষুটীর বাস',—'স্ফীতস্ফূর্ত্ত ক্ষত্রিয় গরিমা, মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা,' ফিরিয়া পাই। আবার চন্দনের পত্রলেখা, ভূর্জ্জপত্রের নবগীত রচনা,—কেতকী কেশরে কেশপাশ সুরভীকরণ,—কঙ্কন আঘাতে ভবর্সশিখীর নৃত্য, চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহ,—সুন্দরীর পদাঘাতে সপল্লব অশোক কুঞ্জের বিকাশ,—সুখের মন্দিরাতে বকুলের আকুলতা, কুরুবকচূড়া, লীলাকমল, ফিরিয়া আসে, বেণু বীণার কলরবের সঙ্গে রেবার কূলের কলহংসের কলধ্বনি কর্ণে পশিতে থাকে। লোধ্রেরেণু ধূপধূম্র এবং কলোগুরুর শুরুগন্ধ নাসিকাকে পরিতৃপ্ত করে। আমার মঞ্জরিত কুঞ্জবনের গোপন অন্তরাল হইতে শৌরসেণী—মালবিকা মন্দালিকা—কাদম্বরী শকুন্তলা—তড়িৎ চকিত নয়না জনপদবধূ এবং ঘন নালাসনা অভিসারিকা, উঁকি মারিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় শত শত স্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমাদর লক্ষিত হয়। সংস্কৃত কবিদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কবির সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। "কবি"সংস্কৃত সাহিত্যযুগের সুখের দিনের কথা বারবার অনুরাগের সহিত স্মরণ করিয়া "কালিদাসের কাল," রচনা করিয়াছেন। ভারতের অতীত যুগের বর্ষাবিলাসের আনন্দ ও সম্ভোগ বহন করিয়া কবির "বর্ষামঙ্গল" যেন কালক্রমে বঙ্গভাষার আকার ধারণ করিয়া আমাদের হৃদয়দ্বারে মঙ্গলবারতা লইয়া আসিয়াছে।

বিদ্যাপতির পদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। রবির কবিতায় শত শত স্থলে "ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্যমন্দির মোর।" 'ভাল করে পেখন না ভেল মেঘমালা সনে তড়িতলতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল।" এবং "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল." ইত্যাদি বহুবার পতিধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবার আমাদের নয়নে দিগন্তের তমাল বিপিনে শ্যামচ্ছায়াপূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর জাগিয়া উঠে। আবার শ্রবণে কালিন্দীর জলকল্লোলকোলাহল,—তমাল কুঞ্জ তিমির হইতে দাদুরীর ও বকুল বৃক্ষের শাখা হইতে ডাহুক ডাহুকীর ছাতি-ফাটান স্বরলহরী এবং গোপাঙ্গনার দুগ্ধদোহন ও দধিমন্থনধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকে। আবার তিমিরাবগুন্ঠিতা রজনীতে ঘনশব্দ-বিরুব পুরমার্গে,—ঘননীলবসনা অভিসারি-কার মুখর অধীর মঞ্জীর ত্যাগ করিয়া অভিসার, বর্ষাপূর্ণিমার নীপশাখের ঝুলনা,—গুঞ্জাফলের মালা, কোকিলকাকলীকূজিত কুঞ্জকুটীরে উৎকলা কলাপীর নৃত্য,—কুঙ্কুম কস্তুরী কদম্বকেশর চন্দনমৃগমদানুলেপন—কুসুমশয়ন ও বাঁশরীর স্বরলহরী—সেই পুরাতন সাধক-গুলির প্রেমাশ্রুমিশ্রিত স্বর্গীয় সামগ্রীগুলি ফিরিয়া পাই।—বৈষ্ণবসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে একটি নববৃন্দাবন সৃজন করিয়াছে।—বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্যে কবি এত মুগ্ধ যে—যদি কোনও জন্মে কবি ব্রজের রাখাল বালক হইতে পারেন—তাহা হইলে নববঙ্গে নবযুগের চালক হইতে চা'ন না—

'আমি, হবো না ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক।
আমি, জ্বালাব না আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক।
যদি, ননী ছানার গাঁয়ে,
যদি, অশোক নীপের ছায়ে,
কোনও জন্মে হ'তে পারি ব্রজের
রাখাল বালক,
তবে চাইনা হ'তে নববঙ্গে
নবযুগের চালক।"

বিধবাবিবাহ।

—✶—
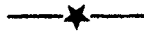
সম্প্রতি কালের হিল্লোলে এই একটা কথা জাগিয়াছে যে.বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি না, ও তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব রক্ষিত হইবে কি না? বিধবাবিবাহ যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে প্রচলিত ছিল, যখন ঋষিরা উহার উপকার অপকারের গৌরবলাঘব তুলনা করিয়া উহার প্রচলনজন্য বিধিপ্রণয়নও করিয়া গিয়াছেন, তখন আবার এ বিষয়ে

বিরুদ্ধতর্কের অবতারণা করিয়া সমাজের অকল্যাণ ডাকিয়া আনা কেন? বলিবে, ইহাতে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের সনাতনত্ব থাকে কোথায়?

জগতের কোন ধর্ম্মই যখন এ পর্য্যন্ত সনাতন রহিল না, তখন হিন্দুধর্ম্মও যে চির-কাল একভাবে থাকিবে, হেলিবে দুলিবে না, চলিবে টলিবে না, ইহা দুরাশাবিশেষ। যেমন মানুষ বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা ও বার্দ্ধক্যে ঠিক তেমনটি থাকিতে পারে না, তেমনই জগতের কোন ধর্ম্ম, কোন কর্ম্ম, কোন মত বা কোন সিদ্ধান্তও চিরকাল ঠিক একভাবে থাকিতে পারে না। যেমন ঋতু-ভেদে অন্ন ও বস্ত্রের বিভেদ করিতে হয়, তেমনই ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মাকর্ম্মও কালভেদে অবস্থাভেদে বিভিন্ন করিয়া করার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আমরা অতি পূর্ব্বে কেবল একমাত্র অগ্নি, জল ও সূর্য্য প্রভৃতি জড়ের উপাসনা করিতাম, ঈশ্বর কাহাকে বলে তাহা জানিতাম না, তখন উহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ছিল। ঐ সময়ে আমরা যাগযজ্ঞ করিতাম, যজ্ঞে গো, গবয়, মেষ, ছাগ ও উষ্ট্রাদি ব্যাপাদিত ও উহাদের মাংস মেধ্য বলিয়া সাদরে সভক্তিতে ধর্ম্মবোধে ভক্ষিত হইত। ঐ সময়ে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ অতিথিকে পর্য্যন্ত গোমাংসদ্বারা আপ্যায়িত করিতে হইত। তখন উহাই আমাদের সনাতন ধর্ম্ম ছিল। ঐ সময়ে আমরাও যাগযজ্ঞে গোহত্যা করিতে না পাইলে বাধা প্রদানকারীদিগকে বিধর্ম্মী ও পাপী নরাধম বলিয়া ঘৃণা করিতাম, পিতৃশ্রাদ্ধে পল গবাদির মাংস ধর্ম্মবোধে ব্যবহৃত হইত, এখন আমরা আর সে পলপৈতৃকশ্রাদ্ধরূপ সনাতনধর্ম্ম পছন্দ করি না, উহাকে নামঞ্জুর করিয়াছি। কেন? না, যখন পূর্ব্বাচার্য্যেরা দেখিলেন যে, মাতৃসমা গাভীকে হনন করা অযুক্ত, আর, অন্যের প্রাণবধ করিয়া নিজের নশ্বরদেহ পোষণ করা অতি বিগর্হিত কার্য্য, তাই তখন তাঁহারা উহার পরিহার করিলেন। এইরূপে যুগে যুগে যখন যাহা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, ঋষিরা তখনই তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। সুতরাং একালের মনু যে বলিয়াছেন—

> যেনাস্য পিতরো যাতা
> যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
> তেন যায়াৎ সতাং মার্গং
> তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥ ১৭৮-৪অ।

অর্থাৎ পিতা ও পিতামহগণ যে পথে চলিয়াছেন, যে ধর্ম্ম মানিয়াছেন, তোমাদেরও তাহাই মানা কর্ত্তব্য, সে পথে চলিলে কোন প্রত্যবায় হয় না।

ইহা যুক্তির কথা নহে। কেন না আমরা কিয়ৎকাল ভিন্ন কোন দিন চিরকাল কোন পৈতৃকধর্ম্মের পালন করিবার অবসর প্রাপ্ত হই নাই। কেন না ধর্ম্ম ও বিধিসকল স্থিতি-স্থাপক ছিল, উহা নিত্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আমরা উক্ত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমরা এখন আর অতিথিকে মহোক্ষা দান করি না, অর্জ্জুনের ন্যায় মামাত ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে অনুমত হই না, কুন্তীর মতনও সুযোগ দিতে দশজনে নারাজ। কুন্তী কিন্তু পাণ্ডুর দ্বারা উত্তরকুরুর পূর্ব্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কালে উক্ত সনাতনত্ব দুষ্ট পন্থা বলিয়া

পরিত্যক্ত হয়। অতএব যে পথে পিতা বা পিতামহ চলিয়াছেন, তাহা যদি যুক্তিসঙ্গত নিষ্কণ্টক পথ হয়, তবেই তাহার পথিক হইব, নতুবা নহে। এথন আর—

"বায়ব্যং শ্বেত মালভেত" বা

"গাং আলভেত"

এ বিধি বহুযুগের পৈত্রিক বিধি হইলেও উহা এথম আর চলে না, কেন না যুক্তিদ্বারা উহার অপবিত্রতা ও অকর্ত্তব্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা এই রূপ যুক্তির আশ্রয়েই আবার আমাদিগের দেশে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলনের কথা বলিতে বদ্ধপরিকর।—

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তথাঽপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ

পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলিয়াছেন যে, মানুষ যেমন কোন বিষয়ের উপকারিতা ভাবিয়া দেখিবে, তেমনই উহাতে কোন অপকারও ঘটিবে কি না, উপকার ও অপকারের মধ্যে কোন্‌টি বলবান্, তাহাও ভাবিয়া দেখিবে। ভাবিয়া দেখিয়া তবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

এথন দেশে বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলনের আবশ্যকতা কি হইতেছে? আর আমাদের দেশে যে পূর্ব্বেও বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? আমাদের দেশে যে চিরকাল অব্যাহতভাবে বিধবাবিবাহের প্রচলন ছিল, তাহা যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন ও যাঁহারা সত্যাপলাপ করিতে ভীত, তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না। আমরাও এই প্রবন্ধে যে সকল প্রমাণের অবতারণা করিব, তৎপাঠেও চেতস্বান্ সহৃদয় পাঠকেরা "এ দেশে কোন দিন বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল না," এরূপ ব্যাহত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। তবে "বিধবাবিবাহের এথন কি প্রয়োজন," এ কথা উত্থাপিত হইতে পারে।

১। বিধবাবিবাহের প্রথম প্রয়োজন, ভগবানের মহতী সদিচ্ছার পরিপূরণ ও পরিপালন।

স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর সমবেত হইয়া সন্তানের উৎপাদন, পরিরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি রক্ষার কার্য্যে সহায়তা করিবেন ইহাই ঈশ্বরের নরনারীসৃষ্টির যেন প্রধান উদ্দেশ্য। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর জগতে কতকগুলি জটাজূটসমাযুক্ত সশ্মশ্রু সগুম্ফ ক্লীব মহাযোগীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনুষ্যসৃষ্টির যবনিকাপাত করিতেন। পার্থিব সুখ অপেক্ষা অধ্যাত্মজগতের সুখ সৌভাগ্য অবশ্যই শ্রেষ্ঠতর ও গরীয়ান্। কিন্তু কোন পুরুষ বা নারী ঋতুকালে পরস্পর মিলিত হইয়া সন্তানোৎপাদন করিবেন, ইহা পার্থিব সুখ নহে, পরন্তু ইহাই অধ্যাত্মজগতের প্রথম অধিরোহণী মাত্র। সন্তানোৎপাদনকে আমরা হীনকার্য্যে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা জগতের সমুদায় সাধু কার্য্যের মধ্যে এক অতি প্রধান কার্য্য। তবে কামরিপুর চরিতার্থতা সাধন তাহা নহে। মনু বলিয়া গিয়াছেন—

মহর্ষিপিতৃদেবানাং
গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য
বসেৎ মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥ ২৫৭—৪অ

গৃহস্থগণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ পরিশোধ করিয়া পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। তথাহি শ্রুতিঃ—

জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণ
স্ত্রিভিঋ ণৈর্ঋ ণী ভবতি।
ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন
দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।

সুতরাং মানুষ যদি জন্মিয়াই নাড়ীভূঁড়ি জড়াইয়া তপস্যা করিতে বনে গমন করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃঋণ পরিশোধ কে করে? প্রকৃত কথা এই যে, মানুষ যে কেবল বংশরক্ষার জন্যই পিতাপিতামহের নিকট দায়ী তাহা নহে, মানুষ ভগবানের সৃষ্টিরক্ষার জন্য সন্তানোৎপাদন করিতে ভগবানের নিকটও দায়ী। কিন্তু পুত্রোৎপাদনে পুরুষ কেবল একাকী সমর্থ নহেন, তাঁহাকে নারীর সহায়তা গ্রহণ করিতে হইবে। নরনারী এ বিষয়ে ভগবানের নিকট দায়ী। তুমি যদি মৃত পত্নীকগণকে পুনর্বিবাহের অনুমতিদানে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়া নারীর পুনর্বিবাহে আপত্তি উত্থাপন কর, তাহা হইলে তাহা তোমার পক্ষে ন্যায়ের কার্য্য হইবে না। যখন প্রতিমাসেই রজোনিঃসরণদ্বারা নারীর গর্ভাধানের আবশ্যকতা বিজ্ঞাপিত হইতেছে, তখন তুমি তাহাকে গর্ভধারণের অবসর প্রদান না করিয়া পারনা। বিধবার আর সন্তান হইবে না, তাহার আর পুরুষসংসর্গের প্রয়োজন নাই, ইহা মহান্ ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নারীগণের রজের স্রাব সংরুদ্ধ হইয়া যাইত, স্তনদ্বয় খসিয়া পড়িত ও জরায়ু উদ্বায়ু হইয়া আকাশে মিশিয়া যাইত। যদি কুমারীকন্যাগণের রজোদর্শনে পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মহাপাপ হয়, উঁহারা মাসে মাসে উক্ত রজঃ পান করেন, তাহা হইলে বালবিধবার পিতা মাতা ও ভ্রাতারা তাহার আর্ত্তব শোণিত কেন পান করিবেন না? বলিবে, তাহার ত একবার বিবাহ হইয়াছে? অপ্রাপ্তবয়াঃ অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদা অজ্ঞাতপতিসেবা বালিকার কোন্ শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হয়, তাহা আমরা জানি না। বৈদিক যুগ কেন, কলিযুগের প্রথমেও দ্রৌপদী, কুন্তী, সুভদ্রা ও উত্তরা প্রভৃতির যৌবনবিবাহ হইয়াছে। বাল্যবিবাহ বিবাহই নহে, উহা অবৈধ ব্যাপারবিশেষমাত্র। এবং হাতগড়া সম্প্রদানের মন্ত্রসকলও প্রতারণামূলক। কে কাহাকে কি দান করেন? "এই কন্যা এত দিন আমাকে বাপ বলিয়া ডাকিত, আজ থেকে তোমাকে বাপ বলিয়া ডাকিবে" ইহা বলিয়া পিতা অন্যের হস্তে পিতৃত্ব স্বত্ব দান করেন না। উহা ছাড়া কন্যার উপর পিতার আর কোন স্বত্বই নাই, সুতরাং বাল্যবিবাহের সম্প্রদান ব্যাপার প্রহেলিকামাত্র। যাহা প্রকৃত বিবাহই নহে, তাহাতে কোন নিরপরাধ বালিকার কি প্রকারে বৈধব্য জন্মিয়া থাকে? ধব কোথায়? পারিবে কি কেহ বেদ বা প্রকৃত স্মৃতি হইতে কন্যাসম্প্রদানের মন্ত্র বাহির করিতে?

২। বিধবাবিবাহের দ্বিতীয় প্রয়োজন, নিরপরাধ বালিকাগুলিকে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা হইতে নির্ম্মুক্ত করা।

যৌবনক্ষুধা ও যৌবনতৃষ্ণার মতন নিদারুণ ক্ষুৎপিপাসা আর জগতে নাই। বামদেব ঋষি সামান্য পেটের ক্ষুধায় অস্পৃশ্য কুক্কুরমাংস পর্য্যন্ত ভোজন করিয়াছিলেন, আর অনিবার্য্য যৌবনক্ষুধা ও যৌবনপিপাসার নিবৃত্তির জন্য বিধবারা কি না করিতে পারে? ও কিই বা না করিতেছে? কয় জন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও

সাধুপুরুষ এই ক্ষুৎপিপাসার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ, বা সমর্থ হইয়াছেন? ইহা ঈশ্বরদত্ত নৈসর্গিক বিধি, কাহার সাধ্য যে এ প্রকৃতির দ্বার অর্গলিত করে? যিনি বিধবার বেদনার কথা মনে ভাবেন, তন্ময় হইয়া তাহাদের হাহুতোহস্মি হাহাকার, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস এবং জ্বালাময়ী তীব্র অন্তর্বেদনার উত্তালতরঙ্গের উত্থানপতনগুলি, একটি একটি করিয়া গণনা করিতে জানেন, তিনিই বুঝেন বিধবার হৃদয়ে কি এক মহাশ্মশান নিত্য জ্বলিতেছে। নিতান্ত নরাধম, নিতান্ত পামর ও নিতান্ত ক্রূরচেতাঃ না হইলে সে বিধবার নিঃশব্দ করুণক্রন্দনে বিগলিত না হইয়া থাকিতে পারে না। অহো ভারতের আজি কি মহাদুর্দ্দিন উপস্থিত, যে এখনও কেহ পুণ্যভূমি ভারত, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুজাতির এই মহাকলঙ্ক উন্মোচনে যত্নবান্ হইল না? প্রৌঢ়বয়স্ক এম, এ, বিএ, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পাশ করা পিতা অম্লানবদনে দশবারটি সন্তানের পিতা হইয়াও পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতেছেন, নূতন প্রেমচাঁদ হইতেছেন, আর তাঁহারই গৃহে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা ষোড়শী বালবিধবা-কন্যা অনুক্ষণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে!!! এহেন পিতা বা পিতৃবোরাই কি উক্ত বালবিধবাগণের সংযমের আদর্শভূমি নহেন?

৩। বালবিধবার বিবাহের তৃতীয় কারণ, উক্ত বিধবা, তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগিনী ও প্রতিবেশবাসিগণকে ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যারূপ মহাপাপ ও তন্মহাপাপের সংসর্গ হইতে রক্ষা করা।

বিধবার বিবাহ না হওয়াতে আমাদের দেশের কত ক্ষতি, তাহা গত দশ বৎসরের সেন্সাস রিপোর্ট হইতেই সপ্রমাণ। এই দশ বৎসরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা দশ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আমাদের জন্মিল না দশ বা বিশলক্ষ, আর ভ্রূণহত্যায় ক্ষতি করিল আর বিশ লক্ষের। যে গৃহে কোন প্রকার ব্যভিচার প্রবেশ করে, সে গৃহের অন্যান্য স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা ও পুরুষগণ পর্য্যন্ত উহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়েন। যাঁহারা বলেন, আমাদের বিধবারা সকলেই পরম পবিত্র ও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধা, আমি বলিব, হয় তাঁহারা জন্মান্ধ ও ঋজুপাঠের লম্বকর্ণের ন্যায় কর্ণহৃদয়রহিত মাংসপিণ্ডবিশেষ, না হয় তাঁহারা সত্যাপলাপী মিথ্যাবাদী। অবশ্য শতকরা দশ বিশজন মূর্ত্তদেবতা বিধবাকুলে না আছেন, তাহা নহে। কিন্তু সর্ব্বজনবরেণ্যা তাদৃশ মহাদেবীর সংখ্যা কয়টি? তোমরা যদি মনের ফটোগ্রাফ তুলিয়া দেখিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইতে বিধবার হৃদয়ে নিত্যোত্থিত জ্বালাময়ী তীব্র মনোবেদনা তাঁহাদিগকে নিয়তই কালসর্পের ন্যায় দংশন করিতেছে, আর তাঁহাদের অভিসম্পাতেই জগদ্বরেণ্য তোমাদের মস্তক আজি যার তার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। আহা! যে ভারতললনার ধর্ম্ম ভিন্ন পতি ভিন্ন আর গতি নাই— যাঁহারা স্বামীকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাই মনে করিয়া থাকেন, আত্মাবহ ভৃত্য বলিয়া মনে করেন না, আজি তোমরা এক বাল্যবিবাহের মিথ্যা স্ত্রীত্ব ও মিথ্যা পতিত্বের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যভিচারিণী করিতেছ, ইহা অপেক্ষা পুণ্যভূমি ভারতের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় আর কি আছে?

অবশ্য নির্লজ্জ ও পাষাণ-হৃদয় তোমরা ইহাও না বলিতেছ তাহা নহে যে, বিধবাবিবাহ যুক্তি ও ধর্ম্মানুমোদিত হইলে মন্বাদি ঋষিরা কি উহার জন্য বিধি প্রণয়ন করিয়া যাইতেন না? মনে কর আমাদের দেশের কোন শাস্ত্র নাই, ঋষিরা কেহ ছিলেন না, আমরা কামস্কটকার ইস্কুইম বা আফ্রিকার নিগ্রোজাতি। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, বিধবার বিবাহ না দেওয়াতে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অনেক গৃহ নরকে পরিণত হইতেছে ও পাপের স্রোতঃ সবেগে প্রবাহিত হইয়া সমুদায় পুণ্য-ভূমিকে পঙ্কিল করিয়া ফেলিতেছে, তখন আমাদের শাস্ত্রবচনের অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? নরমেধ, অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞে মহাপাপ হইতেছে, ইহা দেখিয়া যখন তোমরা বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াও উক্ত গো-বধকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতেছ ও দিয়াছ, তখন তোমার দেশ, সমাজ ও জাতিকে ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যারূপ মহাপাতক হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশাচারের নির্ব্বাসন করিয়া দেশে পুনরায় বিধবাবিবাহের প্রচলন কেন করিবে না?

উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞ স্তথাঽপায়ঞ্চ চিন্তয়েৎ

একবার স্তিমিতনেত্রে মানুষের রক্ত মাংসের হৃদয় দিয়া দেখ না কেন, বিধবার বিবাহেই বা ক্ষতি বা লাভ কত, আর বিবাহ না দেওয়াতেই বা ক্ষতি ও লাভ কত হইতেছে? তোমরা কি জান না যে হিন্দুর বালবিধবার দ্বারা কত মহাপবিত্র পুণ্যতীর্থ এখন নরকে পরিণত হইতেছে। বালবিধবা পতি ও পুত্র লাভ করিলে তাহাতেই কি সমাজে অপেক্ষাকৃত সমধিক শান্তির কথা নহে? যে তোমরা অন্য সমাজের যৌবনবিবাহে—কন্যাগণকে যে তিন কি চারি বৎসর কাল অবিবাহিত রাখে বলিয়া নাসিকাকুঞ্চন করিয়া থাক, যে তোমরা নিজের কুমারী কন্যাগণকে ঋতুমতী দেখিলে বজ্রাহত হও সেই তোমরা কেমন করিয়া বালবিধবাগণকে ষাট ও সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত পবিত্র দেখিবার শেষ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পার? মন্বাদি ঋষির সময়ে যে দেশে ধর্ম্ম পূর্ণ চারি পদ ছিল, সেই সময়েই যখন ঋষিগণ বিধবাগণকে পুনরায় বিবাহের বিধি দান করিয়া গিয়াছেন, সেই একই দেশে এখন আট পোয়া অধর্ম্মের যুগে তোমরা কেমন করিয়া বিধবাগণকে ব্রহ্মচারিণী রাখিয়া সুফল লাভের শেষ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিতে পার? হে মহাপুরুষগণ! তোমরা একবার তোমাদিগকে দ্বাদশদণ্ড বিপত্নীক করিয়া রাখ দেখি? স্বয়ং জগন্মান্য মনু কি বলিয়া যান নাই যে যদি কোন বিধবা কঠোরসাধ্য ব্রহ্মচর্য্য করিতে না পারে, যদি কোন বিধবা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বিবাহ করিতে চাহে, তবে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দিবে?

> যা পত্যা বা পরিত্যক্তা
> বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
> উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা
> স পৌনর্ভব উচ্যতে॥ ১৭৫-৯অ।

যে নারীকে তাঁহার স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন (আমাদেরও পূর্ব্বে তালাক বা Divorce ছিল), কিংবা যে নারীর পতি উপরত হইয়াছেন, সেই পরিত্যক্তা বা সেই গতভর্তৃকা নারী যদি নিজে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি পুনরায় বিবাহ করিতে পারেন। তাদৃশ

নারীর নাম "পুনর্ভূ" এবং তিনি যে পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেন তাহার নাম পৌনর্ভব।

অতএব যাঁহারা বলেন যে মনুতে বিধবা বিবাহের অনুকূল কোন বিধি নাই, পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, তাঁহারা কতদূর সমীক্ষ্যবাদী, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। কেবল বিধবাবিবাহ নহে, আমাদের মধ্যে তালাক ছিল, এবং সেই তালাক দেওয়া স্ত্রীকে অন্যে বিবাহ করিয়া তালাক দিলে, আবার তাঁহার পূর্ব্ব পতি তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। শক, যবন ও কম্বোজ প্রভৃতি জাতি, আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে এই সকল ধর্ম্ম লইয়া যান এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সে পৈতৃক প্রথা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবেই প্রচলিত রহিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ইহা মনুর বিধবা বিবাহের বিধি নহে। (৺প্রসন্নকুমার শর্ম্মা প্রণীত বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠা দেখ) ইহার অর্থ ইহাই যে কোন বিধবা নিজে ইচ্ছা করিলে অন্যকে পতি গ্রহণ করিতে পারে, সেই পতির ঔরসজাত সন্তানের নাম পৌনর্ভব্।

আমরা মনে করি দানিয়াড়ী মহাশয়ের এই মত সাধীয়ান্ নহে, কেননা যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গণ্যমান্য ঋষিরা সকলেই কি ইহাকে সংস্কার বা বিবাহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই? যথা—

> অক্ষতা বা ক্ষতাচৈব
> পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।
> স্বৈরিণী যা পতিং হিত্বা
> সবর্ণং কামতঃ শ্রয়েৎ॥ ৬৭-১অ।

অর্থাৎ কোন অক্ষতযোনি বালিকাই হউন, কিংবা কোন ক্ষতযোনি নারীই হউন, তাঁহারা পুনরায় সংস্কৃতা বা বিবাহিতা হইলে তাঁহাদের নাম "পুনর্ভূ" হইবে। আর যে নারী আপনার পতি পরিত্যাগ করিয়া কোন প্রকার সংস্কারের অধীন না হইয়া কেবল কামনাবশতঃ সজাতীয় অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, তাহার নাম স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিধবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলে তাঁহাকে পুনর্ভূ বলিতে হইবে, পরন্তু স্বৈরিণী বলা যাইতে পারিবে না। এই পুনর্ভূ বা পুনর্বিবাহিতা বিধবার সন্তানের নাম "পৌনর্ভব", আর স্বৈরিণীর পুত্রের নাম কুণ্ড। যদাহ ভগবান্ মনুঃ—

> পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ
> সুতৌ কুণ্ডগোলকৌ।
> পত্যৌ জীবিত কুণ্ডঃ স্যাৎ
> মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥
> ১৪৭-৩ অ।

পরপুরুষদ্বারা পরপত্নীতে জাত সন্তানের নাম কুণ্ড ও গোলক। পতি জীবিত থাকিলে সধবার গর্ভে অন্য পুরুষদ্বারা যে পুত্র হয়, সে কুণ্ড, আর বিধবার গর্ভে যে পুত্র হয় তাহার নাম গোলক।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল যে বিধবা যদি কাহাকেও গান্ধর্ব্বাদি কোন প্রকারে বিবাহ না করিয়া অন্য পুরুষদ্বারা সন্তান জন্মান, তবে তাহার নামই গোলক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সেই বিধবাই বিবাহের পর (অন্য পুরুষ নহে) দ্বিতীয় বৈধ পতিদ্বারা সন্তানোৎপাদন করাইলে তাহার নাম হইবে পৌনর্ভব। সুতরাং পৌনর্ভব পুত্র বৈধবিবাহজাত, পরন্তু জার-

জাত নহে। যদি পৌনর্ভব পুত্র পিতা মাতার বৈধসন্তান না হইত, তাহা হইলে মহাত্মা মনু কখনই তাঁহাকে পিতার ধনের রিকথভাগী করিয়া যাইতেন না—

দ্বৌ দ্বৌ যৌ বিবদেয়াতাং
দ্বাভ্যাং জাতৌ স্ত্রিয়াধনে।
তয়োর্যৎ যৎ পিত্র্যং স্যাং
তৎসগৃহ্লীত নৈতরৎ॥ ১৯১—৯অ

কোন পুত্রবতী বিধবা পুনরায় বিবাহ করাতে তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসে আবার পুত্র হওয়ার পর সে দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু হইয়াছে, উভয় স্বামীর ধনই স্ত্রীর নিকট আছে। এখন কিরূপে ধনবিভাগ হইবে? তাই মনু বলিতেছেন যে—

দুই পিতার দ্বারা জাত দুই পুত্র মাতার নিকট রক্ষিত ধনের জন্যে যদি পরস্পর বিবাদ করে, তবে তাহারা আপন আপন পিতার ধন (যাহা মাতার হস্তে আছে) গ্রহণ করিবে, অন্য ধন নহে।

দুঃখের বিষয় এই যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর বা প্রসন্নবাবু কেহই এই বচনটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, করিলে তখনই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত। যেখানে মনু নিজেই পৌনর্ভব পুত্রগণকে পিতৃধনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তোমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বে কেবল যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা নহে, সেই সকল বিবাহ বৈধবিবাহ ও তদুৎপন্ন সন্তানেরা পিতার বৈধ ঔরসপুত্র বলিয়াও স্বীকৃত ও গৃহীত হইতেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরাও এই মনুবচনের সন্ধান পাইলে বিধবাবিবাহের সন্তানগণের দায়ভাগসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে নূতন বিধি প্রণয়নের জন্য উৎপীড়িত করিতে বাধ্য হইতেন না।

বলিবে "হাঁ—এই দুইটী বচন দৃষ্টে ত মনে হয় যে পূর্ব্বকালে বিধবা'র বিবাহ হইত। তবে মনুতেই কেন আবার ইহার বিরুদ্ধ কথাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে?"

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী
ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি
যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ১৬০
অপত্যলোভাৎ যা তু স্ত্রী
ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দা মবাপ্নোতি
পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ১৬১
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ
ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং
ক্বচিৎ ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ১৬২
পাণিগ্রাহস্য সাধ্বী স্ত্রী
জীবতো বা মৃতস্য বা।
পতিলোক মভীপ্সন্তী
না চরেৎ কিঞ্চিদপ্রিয়ম্॥ ১৫৬—৫অ

হাঁ, এই সকল কথা মনুতে অবশ্যই রহিয়াছে। কিন্তু ইহা স্বয়ং মনুর কথা নহে। আমরা এপর্য্যন্ত কেহই প্রকৃত মনুসংহিতা নয়নগোচর করি নাই। যাহা এখন মনুর সংহিতা বলিয়া প্রচলিত তাহা ভৃগুপ্রোক্ত।

ইদং শাস্ত্রন্তু কৃত্বাসৌ
মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবৎ গ্রাহয়ামাস
মরীচ্যাদীন্ ত্বহং মুনে॥ ৫৮—১অ

সেই উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকবাসী সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা একখানি সংহিতা রচনা করিয়া তাহা পূর্ব্বে আমাকে যথাবিধি অধ্যাপিত করেন। আমি স্বায়ম্ভুব মনু আবার আমার দশ পুত্র মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণকে উহা অধ্যাপিত করিয়াছিলাম। ইহার টীকার একাংশে কুল্লূক বলিতেছেন—

ইদং তু উচ্যতে বহ্মণা শত সাহস্র মিদং ধর্ম্মশাস্ত্রং কৃত্বা মনু রধ্যাপিতঃ আসীৎ ততস্তেন চ স্ববচনেন সংক্ষিপ্য শিষ্যেভ্যঃ প্রতিপাদিতং। তথা চ নারদঃ—শতসাহস্রোঽয়ং গ্রন্থ ইতি স্মরতি স্ম।

অর্থাৎ আচার্য্যেরা এরূপ বলিয়া আসিতেছেন যে প্রথমে ব্রহ্মা লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে তাহা পড়ান। তৎপর স্বায়ম্ভুব মনু আবার উহা নিজভাষায় সংক্ষিপ্ত করিয়া আপনার শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন। নারদসংহিতাতেও উক্ত আছে যে এই গ্রন্থ লক্ষশ্লোকাত্মক।

কিন্তু আমরা এ পর্য্যন্ত কেহই সেই ব্রহ্মসংহিতা বা আদি মনুসংহিতা নয়নগোচর করি নাই। বাজারে যাহা বৃদ্ধমনু বলিয়া প্রথিত, উহাও প্রকৃত মনুসংহিতা নহে। উহাও এখন জর্ম্মানীতে প্রাপ্য। যাহা হউক, মনুর চারি জন শিষ্য প্রথমে তাঁহার সংহিতা অবলম্বন করিয়া চারিখানি সংহিতার প্রণয়ন করেন। যথা—

ভার্গবী নারদীয়া চ
বার্হস্পত্যাঙ্গিরস্যপি।
স্বায়ম্ভুবস্য শাস্ত্রস্য
চতস্রঃ সংহিতা মতাঃ॥ স্কন্দপুরাণ।

ভৃগু, নারদ, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা ঋষি, এই চারিজনে স্বায়ম্ভুব মনুসংহিতার ছায়াতে চারিখানি নূতন সংহিতার প্রণয়ন করেন। আমরা এখন যাহা মনুসংহিতা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি, উহাই সেই ভৃগুপ্রোক্ত ভার্গবী সংহিতা। মনুও বলিতেছেন—

এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং
শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতৎ হি মত্তোঽধিজগে
সর্ব্বমেবাখিলং মুনিঃ॥ ৫৯ ১অ

হে মুনিগণ! মহর্ষি ভৃগু, তোমাদিগকে এই শাস্ত্র আদি অন্ত শ্রবণ করাইবেন। তিনি আমা হইতে ইহা সমগ্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভৃগুও বলিয়াছেন—

স্বায়ম্ভুবো মনু র্ধীমান্
ইদং শাস্ত্র মকল্পয়ৎ। ১০২—১অ

ধীমান্ মহর্ষি স্বায়ম্ভুব মনু এই মনুসংহিতার প্রণয়নকর্ত্তা। ভৃগু, প্রথমাধ্যায়ের সমাপ্তিতেও লিখিয়া গিয়াছেন—

ইতি মানবে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভৃগুপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কেবল ইহাই নহে। ভৃগু বহুস্থলে "মনুরব্রবীৎ" বলিয়া মনুর নাম লইয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানি যেমন মনুসংহিতা, তেমনই ভৃগুসংহিতাও বটে। সুতরাং তাহাতে মতদ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা। তৎপর তোমরা ৫ম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক ও প্রথমাধ্যায়ের ৩১।৩২ ৩৩। ৩৪ প্রভৃতি শ্লোক পড়িয়া দেখ, ইহাতে আরও ৫।৬ জনের শ্রীহস্ত প্রবেশ করিয়া ইহা এখন ভানুসংহিতায় পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ বিধবাবিবাহবিরোধী ঐ সকল শ্লোক পরবর্ত্তী যুগের লোকের। যিনি সর্ব্বাদৌ মনুর বিধবাবিবাহ-বিধির সঙ্কোচ করিতে

চাহেন, তিনি প্রথমে এই শ্লোকটি রচনা করিয়া মনুতে প্রক্ষিপ্ত করেন।

সাচেৎ অক্ষতযোনিঃ স্যাৎ
গতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবেণ ভর্ত্রা সা
পুনঃ সংস্কার মর্হতি॥ ১৭৬—৯অ

অর্থাৎ গতভর্তৃকা বিধবার বিবাহ ও পুনঃপ্রত্যাগতা স্বামিত্যক্তা নারীর পুনরায় বিবাহ হউক, কিন্তু যেন ক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ হয় না। বালবিধবাগণেরই উহা হওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু এ বচন মনুর নিজের হইতে পারে না। কেননা তিনি ১৯১ শ্লোকে যখন সপুত্রা বিধবার পৌনর্ভব পুত্রেরও দায়বিভাগের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, তখন তিনি কেমন করিয়া ক্ষতযোনির বিবাহের প্রতিষেধ করিতে পারেন? অপিচ মনু দূরে থাকুন, ব্যাসকৃষ্ণাদির সময়েও কলিযুগের ৬৫৩ অব্দ অতীত হইয়া গেলেও এ দেশে বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়া ছিল না; সেই বৈদিকযুগ হইতে যৌবনবিবাহ চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং যৌবন বিবাহে বিবাহের রাত্রিতেই নারীগণের স্বামী সহবাসনিবন্ধন ক্ষতযোনি সংজ্ঞা হইত। সুতরাং মনু যে বিধবাগণের পুনর্বিবাহের বিধান করিয়া ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ষোল আনা ক্ষতযোনিই ছিলেন। তাঁহার ১৯১ শ্লোকেও সেই কথা দেদীপ্যমান। তথাহি—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদিক্ষেত
কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাৎ এতস্মাৎ
বিন্দেত সদৃশীং পতিং॥
অদীয়মানা ভর্ত্তারং
অধিগচ্ছেৎ যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদনা প্নোতি
ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥ ৯১—৯অ

অর্থাৎ কন্যা ঋতুমতী হইয়া ক্রমাগত তিন বৎসর অপেক্ষা করিবেন, তাঁহার পিতা মাতা ভ্রাতারা তাঁহার বিবাহ দেন কি না। যদি তাঁহারা বিবাহ না দেন, তবে উক্ত কন্যা এই তিন বৎসরের পর আপনার সদৃশ পতি নিজেই বরণ করিবেন। তাহাতে তাঁহার বা যাঁহার স্বামীর কোন অধর্ম্ম হইবে না।

অতএব যে মনুর সময়ে (প্রকৃত পক্ষে ভৃগুর সময়ে) বাল্যবিবাহ ছিল না, বিবাহ রাত্রিতেই নারীগণ ক্ষতযোনি সংজ্ঞাভাক্ হইতেন, তিনি এই ১৭৬ শ্লোকের প্রণেতা নহেন, ইহা ধ্রুবই। ঐরূপ "ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং॥ (৯৪—৯অ) এই শ্লোকের প্রণেতাও পরবর্ত্তী যুগের কেহ। কেন? না, এই সময়ে যৌবনবিবাহের দুই একটা গলদ (যেমন সত্যকামের মাতা জাবালীর) দেখা দিলে ঋষিরা ক্রমে বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাহারই ফলে অঙ্গিরাঃ ও পরাশর প্রভৃতির পবিত্র গ্রন্থে

অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী

এই সকল অতি আধুনিক শ্লোক ব্যাসাদির বহু পরবর্ত্তী যুগের কেহ প্রবেশিত করিয়া দেন। এবং মনুর নবমাধ্যায়ের ১৭৬ শ্লোকও ঐরূপ কেহ নিজের তাঁতে বুনিয়া মনুতে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে ১৯১ শ্লোকের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তবে ইনিও কতক উদারচেতাঃ ছিলেন, তাই ক্ষতযোনি

নারীগণকে বঞ্চিত করিয়া কেবল অক্ষতযোনি নারীগণের অনুকূলে ব্যবস্থা দান করেন। তৎপর উহার আবার বহুকাল পরে মানুষ যখন আরও সঙ্কীর্ণমনাঃ বা conservative হইয়া পড়েন, তখনকার কেহ, পঞ্চমাধ্যায় হইতে উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকসমূহ রচনা করিয়া রেলের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর ন্যায় মনুতে বলপূর্ব্বক ঢুকাইয়া দেন। নতুবা একই মনু বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে একই গ্রন্থে দুই বিরুদ্ধ মতের ব্যবস্থা দান করিবেন, ইহা কখনই হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে, সংকীর্ণচেতারা মনুর নবমাধ্যায়ে বিবৃত দেবরদ্বারা নিয়োগবিধিক্রমে সন্তানোৎপাদনের বিরুদ্ধেও শ্লোক রচনা করিয়া মনুতে ঢুকাইয়া দিয়া ইহার পবিত্রতা ও ভারতবর্ষের সত্য ও ধর্ম্মও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। মনু বলিতেছেন—

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি।
৫৬—৯অ।

অত্র কুল্লূকভট্ট :—অতঃ অনন্তরং স্ত্রীণাং সন্তানাভাবে যৎ কর্ত্তব্যং তৎ বক্ষ্যামি।

অর্থাৎ অতঃপর আমি নারীগণের আপৎকালের ধর্ম্ম বলিব। যদি নারীগণ সন্তান হওয়ার পূর্ব্বেই বিধবা হয়েন, তবে তাঁহাদের ইহাই কর্ত্তব্য যে—

দেবরাৎ বা সপিণ্ডাৎ বা
স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাহধিগন্তব্যা
সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ৫৯
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু
ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং
ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥ ৬০
বিধবায়াং নিয়োগার্থে
নিবৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ
বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥ ৬২-৯অ।

সন্তানের অভাব হইলে সধবা বা বিধবা নারী পতির অন্য গুরুজনদিগের দ্বারা গর্ভাধানকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপনার দেবর কিংবা কোন সপিণ্ড জ্ঞাতি হইতে সন্তান লাভ করিতে পারিবেন। বিধবাতে নিযুক্ত দেবর প্রভৃতি রাত্রিতে ঘৃতাক্তদেহে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক একটি মাত্র পুত্রের উৎপাদন করিবেন, কখন দুইবারে দুইটি নহে। এইরূপে গর্ভাধান হইলে দেবর আপনার বড় ভ্রাতৃবধূকে গুরুর ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পৃথক্ থাকিবেন, যেন আর সহবাস না হয়।

ইহা গেল মনু বা ভৃগুর নিজের কথা। এই বিধি, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল, নতুবা পাণ্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিচিত্রবীর্য্য প্রভৃতি ও পঞ্চপাণ্ডবের উৎপত্তি হইতে পারিত না। বর্ত্তমান মনুতে কিন্তু ইহার পরেই বলা হইতেছে যে—

নান্যস্মিন্ বিধবানারী
নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা
ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ ৬৪-৯অ।

কিন্তু কোন দ্বিজাতি আপনাদের বিধবাতে এরূপ নিয়োগদ্বারা সন্তান জন্মাইবেন না, তাহাতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট হইবে।

একালের একদল লোক যেমন সনাতন হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়া সকল সাধুকার্য্যেই বাধা দিয়া থাকেন, কোন ঋষিও তদ্রূপ সম্ভবতঃ পৌরাণিকযুগে উক্ত শ্লোক লিখিয়া

হালি মনুর ঘাড়ে গাড়ীতে বোঝাই করিয়া দেন। ভাল, যদি মনুই এই সকল বচনের প্রণেতা হইবেন, তাহা হইলে জগন্মান্য তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কি ব্যাসবশিষ্ঠাদি পাণ্ডুধৃতরাষ্ট্রাদির জন্মদান করিয়াছিলেন? ব্যাস, ভীষ্ম, পাণ্ডু ও পাণ্ডুধৃতরাষ্ট্রের মাতা ও কুন্তী কি দ্বিজাতি ছিলেন না? পরে বলা হইয়াছে যে—

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ
পশুধর্ম্মঃ বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তং
বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৬৬—৯অ

এই যে অন্যের সধবা বা বিধবা নারীতে অন্য পুরুষদ্বারা সন্তানোৎপাদন, ইহা পশুধর্ম্ম, বিশেষ। দ্বিজেরা ইহার নিন্দাই করিয়া থাকেন। বেণরাজার সময়েই ইহা ঘটিয়াছিল। কিন্তু ব্যাস, পাণ্ডু, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ইঁহারা কি বেণের সময়ের লোক? না, ব্যাস ও ভীষ্ম অবিদ্বান বা পশুবিশেষ ছিলেন? আরও বলা হইয়াছে যে—

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু
নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধৌ উক্তং
বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৬৫—৯অ

অর্থাৎ এই যে নিয়োগদ্বারা সন্তানোৎপাদন বা এই যে বিধবার পুনরায় বেদন বা বিবাহ হয় ত কিছুতেই হওয়া উচিত নহে। কেননা বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার মধ্যে ত নিয়োগ বা বিধবার বিবাহের কোন প্রসঙ্গই নাই।

কেন থাকিবে? যখন লোক ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই কি আমকাষ্ঠেরও যোগাড় করিয়া রাখে? মনু তাঁহার তৃতীয়াধ্যায়ে বিবাহের কথা বলিয়া নবমে নিয়োগ ও বিধবা বিবাহের কথা বলিয়াছেন। ইহাতে কি দোষ ঘটিয়াছে? মনু ত গৌরচন্দ্রিকা করিয়াই নিয়োগ ও বিধবা বিবাহের পালা ধরিয়াছেন যে, অতঃপর আমি নারীগণের আপৎকালের ধর্ম্মের কথা বলিব।

মানুষ মরিয়া স্বর্গে ঈশ্বরের কোন special ভবনে বা নরকে যায়, ইহা প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা। স্বর্গ ও নরক বলিয়া কোন পারলৌকিক আড্ডা ছিলনা ও নাই। সুতরাং বিচক্ষণ মনু যে নারীগণকে মিথ্যা স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বিধি দান করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। মনু যুক্তির রাজ্যের লোক ছিলেন, অন্ধভক্তি বা অন্ধবিশ্বাসের রাজ্যের লোক ছিলেন না। মানুষ বৈধ বিধিতে পবিত্র হৃদয়ে সন্তানোৎপাদন করিয়া জগতের সৃষ্টি ও ঈশ্বরের আদেশ পালন করিবে, ইহা পশুধর্ম্ম নহে। সীমা ছাড়াইয়া গেলেই তাহা পশুধর্ম্ম হইয়া থাকে।

সকলে এখানে এই মিথ্যা শ্লোক হইতে একটি মহাসত্যেরও সমুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। যদি মনু বিধবাবিবাহের কোন কথা তাঁহার গ্রন্থে নাই বলিবেন, তাহা হইলে ৬৫শ শ্লোকে উহার নিষেধের কথা থাকিবে কেন? পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা দেখিলেন যে, মনুর সংহিতা তাজা থাকিলে ত নিস্তার নাই, লোকে তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিয়োগ ও বিধবাবিবাহ চালাইবে, তাই তাঁহারা এই অধ্যায়ে এই সকল বিষবপন করিয়া রাখিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটিও সূচিত করে যে, ইহাতে (বর্ত্তমান মনুতে) মনু ও ভৃগু ছাড়া অন্যের হাতও লাগিয়াছিল।
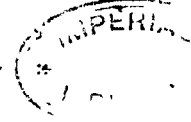
শ্রুত্বৈতান্ ঋষয়ো ধর্ম্মান্
স্নাতকস্য যথোদিতান্।
ইদমূচু র্মহাত্মানম্
অনলপ্রভবং ভৃগুম্॥ ১—৫অ।

ভৃগু নিজে আপনাকে মহাত্মা বলিয়াছেন, ইহা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভাবিতেও পারেন না। ফলতঃ আমরা প্রবন্ধান্তরে দেখাইব যে, মনুতে ক্রমান্বয়ে সাত আট জনের হাত কার্য্য করিয়াছে।

বলিবে, মনু যে বিধবাবিবাহের বিধি দান করিলেন, কই বেদাদিতে ত ইহার কোন প্রসঙ্গই দেখা যায় না। কে বলিল দেখা যায় না। বেদ পড়, অবশ্যই দেখিতে পাইবে। ঋক্‌বেদ বলিতেছেন যে—

উদীর্ষ নারি অভিজীব লোকং
গতাসু মেত মুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষো স্তবেদ
পত্যুর্জনিত্ব মভি সং বভূথ॥৮

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে নারি! মৃতস্য পত্নি! জীবলোকং জীবানাং পুত্রপৌত্রাদ্যানাং লোকং স্থানং গৃহং অভিলক্ষ্য উদীর্ষ অস্মাৎ স্থানাৎ উত্তিষ্ঠ। গতাসুং অপক্রান্তপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে তস্য সমীপে স্বাপিষি তস্মাৎ ত্বং এহি আগচ্ছ। যস্মাৎ ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহং কুর্ব্বতঃ দিধিষোঃ গর্ভস্য নিধাতুঃ তব অস্য পত্যুঃ সম্বন্ধাৎ আগতং ইদং জনিত্বং জায়াত্বং অভিলক্ষ্য সং বভূথ সংভূতা অসি অনুসরণনিশ্চয়ম্ অকার্ষীঃ তস্মাৎ আগচ্ছ।

দত্তজানুবাদ—হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। গাত্রোত্থান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস, যিনি তোমার পানিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে।

ইমা নারী রবিধবাঃ সুপত্নীঃ
আঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু।
অনশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্না
আরোহন্তু জনয়ো যোনি মগ্রে॥

৭—১৮স্—১০ম।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অবিধবা অধিগত পতিকাঃ জীবদ্ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নীঃ শোভন পতিকা ইমা নারী নার্য্যঃ আঞ্জনেন সর্ব্বতঃ অঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেন অক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু। তথা অনশ্রবঃ অশ্রুবর্জ্জিতাঃ অরুদত্যঃ অনমীবাঃ অমীবা রোগ স্তদ্রহিতা মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনস্থিতাঃ জনয়ঃ জনয়ন্তি অপত্য মিতি জনায়া ভার্য্যা স্তা অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমত এব যোনিং গৃহং আরোহন্তু আগচ্ছন্তু।

দত্তজানুবাদ—এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতিলাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহেতে আগমন করুন।

ঋগ্বেদের এই দুইটি মন্ত্রদ্বারা জানা গেল, পূর্ব্বে বৈদিকযুগেও এদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। অথর্ব্ববেদেও এই দুইটি মন্ত্র বর্ত্তমান। তবে যাঁহারা মন্বাদি পবিত্র গ্রন্থকে প্রক্ষেপবহুল করিয়া ভাগাড়ে বা ধাপায় পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদেরই অনন্তরবংশ্য কেহ শব্দকল্পদ্রুমে ঋগ্‌বেদের উক্ত সপ্তম মন্ত্রের "যোনি মগ্রে"কে "যোনি মগ্নেঃ" পাঠে বিপরিণত করিয়া বেদ

হইতে সহমরণের সমর্থন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, প্রসন্নবাবু পুনর্ভূর দোষ সংকীর্ত্তন করিয়া মনুর নবমাধ্যায়ের ১৭৫ শ্লোকটিকে বিধবা বিবাহের প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই, কিন্তু তিনি আজ জীবিত থাকিলে দেখিতে পাইতেন যে, পুনর্ভূকে যেমন একালের মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি অবগীত করেন নাই, তেমনই অথর্ব্ববেদও অবগীত করিয়া যান নাই, অথর্ব্ববেদও বিধবার বিবাহের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। যথা—

> যা পূর্ব্বং পতিং বিত্বা
> থান্যং বিন্দতে পতিং।
> পঞ্চৌদনং চ তৌ অজং
> দদাতো ন বি যোষতঃ॥ ২৭
> সমান লোকো ভবতি
> পুনর্ভূবা পরঃ পতিঃ।
> যোঽজং পঞ্চৌদনং
> দক্ষিণাজ্যোতিষং দদাতি॥ ২৮
> নবমকাণ্ড—১০৩ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ যে নারী পূর্ব্বে এক পতিকে বিবাহ করিয়া পরে অন্য পতিকে লাভ করেন, সেই পুনর্ভূ নারী ও তৎস্বামী, পঞ্চ ওদন ও একটি অজ দান করিলে তাঁহারা আর কোন দোষভাগী হয়েন না। যিনি বিধবা বিবাহ করেন, তিনি যদি একটি অজ ও পঞ্চ ওদন দক্ষিণা দান করেন, তবে তিনি তাঁহার পুনর্ভূ ভার্য্যার সহিত সমান লোকে গমন করিয়া থাকেন। কার সমান লোক? বিধবার? না, তাহা নহে, প্রথম পতির সমান লোক। অর্থাৎ বিধবা-বিবাহকারী বিধবা বিবাহ করিয়া তৎকালে প্রথম পতির ন্যায় সমভাবেই সমাজে গৃহীত হইতেন। মহর্ষি মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বিধবার বিবাহের বিধি দান করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি পরাশর নারীগণকে পাঁচটি অবস্থাতে পুনর্বিবাহের বিধিদান করিয়া গিয়াছেন।

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে
> ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং
> পতিরন্যো বিধীয়তে॥ ২৫-৪অ।

অর্থাৎ স্বামী অনুদ্দিষ্ট বা মরিলে, সন্ন্যাসাবলম্বী, ক্লীব ও পতিত হইলে নারীগণ যথাশাস্ত্র কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া পরে অন্য পতি বিবাহ করিতে পারিবেন।

এই জ্বলন্ত আলোকের দিনেও কোন কোন বিদ্যাসাগর পরাশরের প্রকৃত বাক্য কাটিয়া "পতিরন্যো ন বিদ্যতে" করিয়াছেন। কেন? মানব-দেবতা ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে পরাভূত করিবেন!!! কিন্তু এই ব্যক্তি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না যে, ইহাতে শ্লোকের অর্থ বা সার্থকতা কি থাকে?—কেহ কেহ এই পতিকে বাগ্দানের ভাবী পতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে সমুৎসুক। কিন্তু বাগ্দানের পাত্রকে লোকে পতি বলে, ইহা সাহিত্যজগৎ অনবগত।

যাহা হউক, কলিকালের ব্যাসের পিতা পরাশরের এই উক্তিদ্বারা ইহাই সমর্থিত হইল যে, মনু সত্যযুগে যে বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের সময়েও পূর্ণ দমে সমর্থিত হইয়া কলিকাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল। সুতরাং চারিযুগ ভরিয়াই বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহা একটি অব্যাহত নির্ব্যূঢ় সত্য। ফলতঃ তাহা না হইলে অর্জ্জুন একটা বড় রাজপুত্র হইয়াও

কি প্রকারে বিধবা নাগকন্যা উলূপীর পাণি-পীড়ন করিয়াছিলেন ?

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমান্
ইরাবান্ নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য
জাতঃ পার্থেন ধীমতা ॥
ঐরাবতেন সা দত্তা
হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন
কৃপণা দীনচেতনা ॥
ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ
পার্থঃ কাম বশানুগাম্।

পদ্মপুরাণেও এইরূপ বিধবাবিবাহের দৃষ্টান্ত বিরাজমান। তবে একালের বিবাহবৃত্তান্ত যেমন কোন গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না, পূর্ব্বকালের এই সকল বিবাহব্যাপারও কোন গ্রন্থে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই। তথাপি বুঝিতে হইবে যে, যখন শাস্ত্রে বিধি রহিয়াছে ও লোক সকল যৌবনে বিধবাও হইত, তখন বিধবা বিবাহ যে অবাধে চলিতে ছিল, তাহা ধ্রুবই। অতঃপর আমরা আর দুইটি জ্বলন্ত প্রমাণ সমুদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মহর্ষি শাতাতপ বলিতেছেন যে—

উদ্বাহিতা চ যা কন্যা
ন সংপ্রাপ্তা চ মৈথুনং।
ভর্ত্তারং পুনরভ্যেতি
যথা কন্যা তথৈব সা ॥ ৪৪
সমুদ্‌ গৃহ্য তু তাং কন্যাং
সাচেৎ অক্ষতযোনিকা।
কুলশীলবতে দদ্যাৎ
ইতি শাতাতপোঽব্রবীৎ ॥ ৪৫

লঘুশাতাতপস্মৃতিঃ।

অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ হইয়াছে, অথচ স্বামিসহবাস হয় নাই—সে বালবিধবাকে কুমারী কন্যা ভাবাই উচিত। তাহার আবার বিবাহ হইতে পারে। যদি সে অক্ষতযোনি হয়, তবে পিতামাতা তাহাকে কোন কুলশীল-বান্ পাত্রের সহিত পুনরায় বিবাহ দিবেন। মহর্ষি শাতাতপ ইহা বলিতেছেন। ইহার পরও কি কেহ বলিতে চাহেন যে, বিধবাবিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত নহে।

সুন্দর বন।

—★—

সমুদ্রের তীরে সুন্দরবন থাকায় শিকস্তি নিবারণ হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ সুন্দরবনে লাগিয়া ফিরে যাওয়ায় তীরে ভাঙ্গিয়া যায় না। এই কারণে সমুদ্রের তীরে সুন্দরবন যাহাতে কাটা না হয় সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে যত্ন লওয়া হয়। সুন্দরবনের ১৫।২০ মাইল অন্দাজ

দক্ষিণ পর্য্যন্ত ডুবাচর এবং বঙ্গোপসাগরের এই স্থানে ক্রমশঃ চর পড়িতেছে। ডুবাচরে ও সুন্দরবনের খালের ভিতর প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায়। খাল ও নদীর পারে কাঁকড়া প্রচুর আছে। জালিয়ারা ডুবাচরে বেড় পাতিয়া মাছ ধরে। ভাটার সময়ে চরের উপর অনেক জমি ঘিরিয়া বাঁশের ছোট ছোট খুঁটি পুতিয়া বেড় দেয়। জোয়ার আসিলে ঐ বেড়ের ভিতরে মাছ প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় ঐ মাছ জালিয়ারা ধরে। মাছ ধরিয়া কতক পরিমাণে বিক্রয়ের জন্য নিকটের হাটে চালান দেয়, কিন্তু অধিকাংশ কাটিয়া শুকায়। শুকান মাছ চট্টগ্রামে চালান দেয়। স্থানীয় মুসলমান ও মগেরা শুকান মাছ খায়। বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে সমুদ্রের মাছ ধরার জন্য একখানি ছোট জাহাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং ঐ জাহাজ সমুদ্রে গিয়া জাল দ্বারা মাছ ধরিয়া কলিকাতায় আনে। বাঙ্গালা দেশের জালিয়ারা বহুকাল হইতে ছোট ছোট নৌকা লইয়া সমুদ্রের ভিতরে দ্বীপ-চরে মাছ ধরে। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুণ পর্য্যন্ত তাহারা সমুদ্রে থাকে, পরে দেশে ফিরিয়া যায়। সমুদ্রের মাছ ধরিয়া তাহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করে। সুন্দরবনের কিনারায় যত মাছ পাওয়া যায় তদপেক্ষা সমুদ্রের ভিতর জনশূন্য দ্বীপচরে অধিক পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। এই সকল দ্বীপচরে পক্ষীও যথেষ্ট থাকে। মানুষ না থাকায় নির্ভয়ে তাহারা বিচরণ করে। চব্বিশ পরগনা, খুলনা ও বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমার বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্ত্তী জঙ্গল সুন্দরবন নামে বর্ত্তমানে খ্যাত। কারণ ঐ সকল স্থান লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একজন সুন্দরবনের কমিসনার ছিল। এখন কেহ নাই। বরিশাল জেলার দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমা ও নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সোন্দ্বীপ বঙ্গোসাগরের তীরে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমার ও হাতিয়া দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে নিবিড় জঙ্গল আছে। এবং ঐ দুই স্থানের মধ্যে দক্ষিণ সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলে কৃষ্ণপ্রসাদ চরেও ঐরূপ জঙ্গল আছে। ঐ সকল জঙ্গলে এবং সুন্দরবনের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে দ্বীপচরের জঙ্গলে বন্য মহিষ আছে। এই সকল স্থলে কতক কতক বহুপূর্ব্বে সুন্দরবনের সামিল ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে যদিও ইহারা সুন্দরবন বলিয়া খ্যাত নহে,তথাপি সুন্দরবনের সহিত ইহাদের প্রকৃতিগত কোনই বৈষম্য নাই। জালিয়ারা এই সকল স্থানেও মাছ ধরে। কৃষ্ণপ্রসাদ চরটি পূর্ব্বে নোয়াখালি জেলার সামিল ছিল—অধুনা বরিশাল জেলা-ভুক্ত। এই স্থানে একটি ৭২ হাত লম্বা তিমি মাছ বহুপূর্ব্বে লামছি চরে উঠিয়া আর নামিতে পারে না। ঐ মাছের হাড় বর্ত্তমানে বরিশাল পব্লিক্ লাইব্রারি ও কলিকাতা এশিয়াটিক্ মিউজিয়মে আছে। তখন কৃষ্ণপ্রসাদচর খুব নীচু ছিল ও মনুষ্যের বাসোপযোগী হয় নাই। ঐ মাছ সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রসাদচরের সংলগ্ন মনপুরা দ্বীপের লোক অদ্যাপি নিম্নলিখিত গান করে।

"সুনেন সুনেন মমিন ভাই, এক রঙ্গের ধুয়া গাইয়া যাই, সুন তার খবর, বত্রিশ হাত এক মাছ উঠেছে মনপুরা লামছির চর, লাচের থেকে উঠলরে মাছ পাইয়ে ডুলার চর, আট হাত পানির নীচে ঠেকলরে আসি মঙ্কেল, মাছ

মাম্বিবার সাধ্য নাই,মাছের ডাকে রাজা কাঁপে লোকে বলে একি ভাই বলুর চরে কিসের আওয়াচ দেখতে যাই, নজদিগেতে গিয়ে তার দেখে হইল চমৎকার, কতক বেহুসে রহিল বিধাতার এমনি খেলা তিন জন লোক মরে-ছিল, খবর পাইয়ে দারোগা সাহেব তদন্তে আইল,সত্তরমনে নায় করে লইল মাছ যায় করে, কতক সেই চরে রইল, মাছ নারে কি অজাগর কেউ চিনিতে না পাইল, গায়নারে তার আস ছিল, মাজেষ্ট্রেটের হুকুম মতে ও মাছ বরিশাল নিল, মাছের কথা কব কত কোম্পানির হুকুম-মত ও মাছ রাখল দৌলতখায়, মাছের কথা সুনে লোকে দৌড়াদৌড়ি দেখতে যায়, আন-দারা দেখিয়া মাছ বলে হায়রে হায় ও ভাই মফিজদ্দি বলে সবাই এমন তামাসা দেখি নাই, কি করল বিধাতায় ও তার মেরুদণ্ডের হাড়টী যেমন দস্তি আনমান মস্ত নয় ও তার গাল-চাপ্পরা সাড়েসাত হাত গড়েছে বিধাতায়, ও তার মুখের গরস নয় হাত হুকার যেমন তাল গাছের আম সুনেন তার খবর ও ভাই মফি-জদ্দি বলে সবাই এমন তামাসা দেখি নাই ও আমি ভাবিয়া রহিলাম একা আইলাম লাচে থেকে উঠলরে মাছ পাইয়া ডলার চর।"

সুন্দরবনে কাঁকড়া খুব বড় বড় পাওয়া যায় ও অতি সহজে ধরা যায়। নদী বা খালের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত্তে কাঁকড়া থাকে এবং প্রায়ই গর্ত্তের বাহিরে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে। সমুদ্রতটে ছোট ছোট লাল কাঁকড়া বহুল পরিমাণে বেড়ায়। সুন্দরবনের কিনারায় সমুদ্রতটে স্থানে স্থানে বালুর পাহাড় দৃষ্ট হয় ও তথায় হাঁটিলে পায়ে আঘাত লাগে না। সাপ খুব বড় বড়—জঙ্গলের ভিতর আছে। সাপে হরিণ ধরে, পা গিলিয়া ধরে। সেই সময় হরিণ ডাকিতে থাকে এবং মানুষ অগ্রসর হইলে হরিণ ছাড়িয়া সাপ পালায় ও মানুষে হরিণ আনিয়া ক্ষত পা ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করে, এরূপ দেখা গিয়াছে। সুন্দরবন ও পূর্ব্বোক্ত দ্বীপচরগুলিতে খুব বড় বড় ইন্দুর আছে। তাহারা ফসল করিতে দেয় না এবং মানুষের বাসের বিঘ্ন ঘটায়। বন্য শূকর খুব বেশী রকম আছে—তাহারা ও ফসলের এবং মানুষের বাসের ব্যাঘাত জন্মায়। সুন্দরবনে পক্ষী প্রচুর পরিমাণে ও খুব বড় বড দেখা যায়। সুন্দরবনের ডুবাচর উল্লেখযোগ্য। ভাটার সময়ে সেখানে মানুষ কিম্বা জানোয়ার হাঁটিলে সবেগে প্রোথিত হইয়া যায় এবং তাহাকে টানিয়া তুলিতে হয়। জোয়ার সময়ে সেখানে অনেক জল হয়। বাঙ্গালা ১২৮৩ সালে যে ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবাত হয় তাহাতে বরিশাল জেলার সুন্দরবনে অনেক লোক মারা গিয়াছিল—এবং অনেক স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। লবণ জলে পুষ্করিণীর জল নষ্ট করায়, ঝটিকার পশ্চাতে কলেরা আসিয়া যে কয়েকজন লোক ঝটিকার হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলকেই বিনষ্ট করে। গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া আহার্য্য পানীয় ঔষধ বস্ত্র বিতরণ করিয়া যে কয়েকজন লোক বাঁচিয়াছিল তাহাদের জীবন রক্ষা করা হয়। সুন্দরবনে জোয়ার দক্ষিণ দিক হইতে আইসে এবং বান ডাকে না। কিন্তু হাতিয়ায় দক্ষিণে ও পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ চরের পূর্ব্বে প্রথমে দক্ষিণ দিকের জোয়ার আসে এবং পরে

চাটগাঁয়ের জোয়ার বা হানা আসে। ঐ হানার চোট খুব বেশী এবং প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত উহা বানের আকার ধারণ করে অর্থাৎ ডুবা চরে আঘাত পাইলে ৩।৪ হাত উচ্চ হইয়া লাফাইয়া উঠে ও ভীষণ শব্দ করে। সুন্দরবন সমুদয় মায় তাহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মধ্যের চরগুলি সব গবর্ণমেন্টের খাস জমিদারী, তবে তালুক বন্দোবস্ত আছে। হাতিয়া ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরের দক্ষিণে সমুদ্রতীরের জঙ্গলও গবর্ণমেন্টের খাস জমিদারি—ঐরূপ পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ চর। পার্জিটার সাহেব কোনও সময়ে সুন্দরবনের কমিসনার ছিলেন। ইনি সুন্দরবনের একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন। পার্জিটার সাহেব পরে হাইকোর্টের জজ হন ; অধুনা তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে আছেন এবং সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেছেন। তাঁহার ইতিহাসে সুন্দরবনের মধ্যে যত মহাল আছে প্রত্যেকের বিবরণ জানা যায়। বহুপূর্ব্বে সমুদ্রেরতীরে সুন্দরবনে লবণ তৈয়ার করা হইত—তাহার চিহ্ন দেখা যায়। সুন্দরবনের মগ বসতিতে খুব বড় বড় বিলাতী কুমড়া জন্মে। সেগুলি দেখিবার জিনিষ। মগেরা পরিবার বস্ত্র নিজে বুনিয়া লয়। তাহারা একরূপ কোমরবাঁধা প্রস্তুত করে—সেগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। সুন্দরবনের জঙ্গলে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী জিনিষের মধ্যে কাঠ ও গোল্‌পাতা ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। গোল্‌পাতা বহুল পরিমাণে কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ঘর ছাউনির জন্য চালান করা হয়। সুন্দরবনের কুমীর যখন তীরে উঠিয়া নিদ্রা যায় তখন খুব নিকট দিয়া নৌকা বাহিয়া গেলেও তাহার নিদ্রা ভাঙ্গে না। সুন্দরবনের খালের ভিতর নৌকা বাহা খুব কঠিন। খালের ভিতর গাছের গোড়া থাকে এবং নৌকা তাহার উপর ঠেকিয়া অনেক সময়ে ফুটা হইয়া যায়। খালগুলি কুমীরে পরিপূর্ণ। সুন্দরবনে হাঙ্গর থাকার কথা শুনা যায় না। গোসাপ খুব বেশী। ইহারা জলে স্থলে উভয় স্থানে থাকে। সুন্দরবনের ভিতর কোনও উল্লেখযোগ্য রাস্তা নাই এবং নৌকা ভিন্ন সচরাচর যাতায়াত করা যায় না। খালে পরিপূর্ণ। খুলনার জঙ্গল আফিসে সেই এলাকার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কয়েকখানি ছোট ষ্টীমার আছে। কয়েকখানি বোটও আছে। সমুদ্রের তীর ভিন্ন সব জঙ্গলই অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়ার আকর। যাহারা জঙ্গলে কার্য্যোপলক্ষে অবস্থান করে তাহারা প্রত্যহ কুইনাইন্ ও চা সেবন করে। কিন্তু সমুদ্রতটে খোলা স্থানে বায়ু নির্ম্মল ও শরীর সুস্থ থাকে। ঐরূপ একস্থানে বরিশাল জেলায় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে ভদ্রলোকের বাসের জন্য ডাক্‌বাঙ্গলা করা হইয়াছে। ফ্রেজারগঞ্জের স্বাস্থ্যনিবাসের কথা অনেকেই অবগত আছেন। পাছে জঙ্গল সব আবাদ হইয়া গেলে কাঠের অনাটন জন্মে সেই জন্য সুন্দরবনের জঙ্গলবিভাগের সৃষ্টি। সুন্দরবনের বড় বড় বাঘ বৃহৎ নদী সাঁতার দিয়া এক পার হইতে অন্য পারে যায়। গরু মহিষ মারিয়া পিঠে করিয়া ছোট খাল লাফাইয়া পার হয়। বাঘের সহিত কুমীরের যুদ্ধের কথা শুনা যায় না। কলিকাতা হইতে বড় সাহেবরা প্রতি বৎসর শীকার করিতে সুন্দরবনে যায়। প্রথমে অনেকগুলি গরু নানা স্থানে বাঁধিয়া রাখা হয়। পরে যেখানে বাঘে গরুটি মারে সেইখানে

উঁচু মাচা করিয়া শীকারী বন্দুক লইয়া বসিয়া থাকে। বাঘের নিয়ম যেখানে গরু মারিয়া খায় সেইখানে আবার মরা গরুর মাংস খাইতে আসে। অনেক লোকে ঐ স্থানে বোমা পোড়াইয়া ও জঙ্গলে বাড়ি দিয়া বাঘ বাহির করিয়া দেয়। শীকারী তখন গুলি মারে। প্রতি বৎসর শীকারে অনেক টাকা ব্যয় হয়। ইতরলোকে কুকুর ও লেজা দিয়া হরিণ ও শূকর শীকার করে। সুন্দরবন হইতে বেদেরা সাপ ধরিয়া লইয়া কলিকাতায় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট বিক্রয় করে ও তাহাতে অনেক টাকা পায়। সমুদ্রতটে জাল পাতিয়া ব্যাধেরা পক্ষী ধরে। সুন্দরবন আবাদ করিতে হইলে আগুণ দিয়া জঙ্গল পোড়াইতে হয়। ২।৩ বার না পোড়াইলে কোন স্থান সম্পূর্ণরূপে আবাদের যোগ্য হয় না। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ চরের কোনও কোনও হিন্দু দাসেরা শূকরের মাংস খায় ও বিধবা বিবাহ করে। শোনদ্বীপ, হাতিয়া ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে ঐ শ্রেণীর দাস দেখা যায়। ইহাদের যাজক ব্রাহ্মণেও শূকরের মাংস খায়। ইহাদের সংখ্যা সুন্দরবনেও স্বল্প আছে। সমুদ্রের তীরে শীত কম, খুব শীতের সময়ও সুন্দরবনে গরম বোধ হয়। কোনও কারণে পানীয় জল দূষিত হইলেই কলেরা দেখা দেয়। গোল্লাতার গাছের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা হইতে তাড়ি প্রস্তুত হয়। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ উদ্ভিদ্‌ পরিদর্শন জন্য সুন্দরবনে যাতায়াত করেন। সম্প্রতি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে কৃষিকার্য্য শিখাইবার জন্য কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া একটি কোম্পানি গঠন করতঃ সুন্দরবনে কতক পরিমাণে জঙ্গল জমি আবাদ করা হইতেছে। জঙ্গল যদি দেখিবার ইচ্ছা হয় তবে সুন্দরবনে যাওয়াই সুবিধা। পাহাড়েও জঙ্গল আছে, কিন্তু তথায় গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা। সুন্দরবনে নৌকা বা ছোট ষ্টীমার করিয়া ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়ান যায়। দূর হইতে দেখিলে সুন্দরবনের জঙ্গলকে নদীতীরে একটি সুবিশাল প্রাসাদের প্রাচীর বলিয়া মনে হয়—যেন বনদেবী সেই প্রাসাদের মধ্যে বিরাজ করেন। অন্যদেশে জঙ্গলের ভিতর গাছে গাছে সংঘর্ষ পাইয়া দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া জঙ্গল পুড়িয়া যায়, কিন্তু সুন্দরবনে সেরূপ দাবাগ্নির কথা সবিশেষ শুনা যায় না। কারণ তথায় জলের অভাব নাই। সুন্দরবন হইতে কাঠাদি অন্যত্র লইতে হইলে নদী, খাল দিয়া ভাসাইয়া লইয়া যাওয়া খুব সহজ কিন্তু পাহাড় হইতে কাঠাদি অন্যত্র লওয়া বহুল ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। কলিকাতা অঞ্চলের জ্বালানি কাষ্ঠ সুন্দরবন হইতেই আইসে। পর্ব্বত ও সমুদ্র প্রকৃতির দুই চরম প্রান্ত। পর্ব্বত জঙ্গলে আবৃত থাকায় সুন্দর দেখায়। সমুদ্রতটে জঙ্গল সুন্দর দেখায়। প্রণিধান করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে সমুদ্রতটের জঙ্গলই বেশী সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনন্ত সমুদ্রের অসীম সৌন্দর্য্য—তাহার উপর দুর্ভেদ্য প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান বনরাজি। পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করে। পর্ব্বত ও সমুদ্র বার্দ্ধক্য ও শৈশবের সহিত তুলনা করা যায়। শৈশব প্রকৃতির এক প্রান্ত, বার্দ্ধক্য অপর প্রান্ত। ভগবানের সহিত মানবের মিলনের প্রকৃষ্ট সময় বার্দ্ধক্য ও শৈশব। শৈশবে ভগবানের অংশ মানবদেহে বিরাজমান থাকে, বার্দ্ধক্যে

মানব ভগবানে মিলে। শ্যাম দেশের ভাসমান উদ্যানের কথা অনেকে অবগত আছেন। দূর হইতে সুন্দরবনকে ভাসমান উদ্যান বলিয়া মনে হয়। সুন্দরবন প্রকৃতির জন্তুশালা ও উদ্ভিদ্-উদ্যান। সমুদ্রতটে নূতন বালুর চরে বৃক্ষের বীজ কি করিয়া আসে তাহা খুব চমৎকার। পক্ষীরা আসিয়া নূতন চরে বসে এবং তাহাদের বিষ্ঠাতে বৃক্ষের বীজ থাকে। ঐ বিষ্ঠা হইতে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির নিয়ম সবই চমৎকার। ইতরলোকে এবং অনেক ভদ্রলোকে অনুমান করে সুন্দরবনে বনদেবী আছেন। জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পূজা দেওয়া হয়। মুসলমানেরাও ঐরূপ পূজা দেয়। জালিয়ারা মাছ ধরিতে সমুদ্রের ভিতরজনশূন্য অথচ জঙ্গলময় দ্বীপ-চরে যায়। তাহারা অনেক সময়ে অপার্থিব শব্দ শুনিয়াছে বলে। সুন্দরবনের ভিতর জমির উর্ব্বরাশক্তি খুব বেশী। কারণ সমুদ্রের জল উঠিয়া পলি পড়ে ও বৃক্ষের পত্র গলিত হইয়া তাহার সহিত মিশে। লবণ জল বেশী মাত্রায় যাহাতে না উঠিতে পারে সে জন্য আবাদ করিতে হইলে ভেড়ী বাঁধিতে হয়। সুন্দরবনে ও সন্নিহিত দ্বীপচরেও গরু ও মহিষ বিভিন্ন সুদূর স্থান হইতে বর্ষাকালে চরিবার জন্য আনিয়া রাখা হয়—তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডিঙ্গি নৌকা করিয়া রাখাল থাকে। বর্ষাকালে চারিদিকে ধান থাকায় লোকালয়ে গরু মহিষ চরিবার স্থান থাকে না, কাজেই লোকালয় ছাড়িয়া বিজন প্রদেশে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে রাখা হয়। ধান কাটা হইলে আবার গরু মহিষ দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই কয়মাস চরিবার জন্য প্রত্যেক গরু ও মহিষের খাজনা দিতে হয় এবং তাহাতে সরকারের বা জঙ্গলের অধিকারীর অনেক টাকা উপার্জ্জন হয়। ঐ সকল গরু মহিষ নানা প্রকারে নষ্ট হয়—কুমীরে খায়, বাঘে ধরে, রোগে মরে, জলে ভাসিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে। কতক বনে যাইয়া বন্যমহিষ বা বন্যগরু হইয়া দাঁড়ায়। রাত্রিতে যেখানে গরু মহিষ থাকে তাহার চারিদিকে রাখালেরা বন্যজন্তুর ভয়ে আগুন জ্বালাইয়া রাখে। এবং তাহারা নিজে খুব উঁচু টোঙ্গ করিয়া তাহার ভিতর থাকে। যেখানে হিংস্র জন্তুর ভয় সেখানে মানুষমাত্রেই টোঙ্গ করিয়া থাকে, অর্থাৎ মাটির উপর খুঁটী পুতিয়া উচ্চে ঘর তুলে। পাহাড়েও এই নিয়ম। বন্যজন্তু আসিলে সুন্দরবনে লোকে মহিষের শিঙ্ বাজাইয়া শব্দ করে। ঐ শব্দ শুনিলেই বুঝা যায় যে বন্যজন্তু বাহির হইয়াছে। তখন আশপাশে সব লোকে সাবধান হয় ও চিৎকার করিতে থাকে। একপাল গরু বা মহিষ একত্র দলবদ্ধ থাকিলে তাহার উপর বাঘ পড়ে না। কোনও একটি দল ছাড়িয়া পৃথক থাকিলেই বাঘে ধরিয়া লয়। সে বিষয়ে বাঘ রাত্রি দিন ভেদ করে না, তবে স্বভাবতঃ রাত্রিতেই বাঘে বেশী অনিষ্ট করে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে কয়েকখানি নৌকা একত্রে মানুষসহ খালের ভিতর নোঙ্গর করিয়া আছে ও সন্নিকটে বাঘ ডাকিতেছে। মানুষে টীন পিটিয়া শব্দ করিলেও বাঘ নিঃশব্দ হয় না। কিন্তু বন্দুকের আওয়াজে সকল জন্তুই ডরায়। সুন্দরবনের বৃক্ষলতাদির কথা লিখিবার সময় কবির নিম্নলিখিত কথাগুলি স্বতঃই মনে উদিত হয়—"কোথাও মাধবীসহ জড়িত হইয়া,

সহকার নদী'পরে পড়েছে হেলিয়া, যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল দর্পণে, মুখ দেখে কান্তা কান্ত পুলকিত মনে।" সুন্দরবনের প্রায় প্রত্যেক গাছেই লতা উঠিয়াছে এবং খাল বা নদী পারে অনেক লতাবৃত গাছ জলের উপর হেলিয়া আছে।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বসন্তচিকিৎসা।

কয়েক বৎসর হইতে বসন্তকালে "প্লেগ" নামক অশ্রুতপূর্ব্ব সংহারকরোগ ভারতের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক প্লেগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতেছে। বসন্ত আসিলেই যেন লোকের মনে একটা ত্রাস আসিয়া উপস্থিত হয়, কখন্ কাহার জীবরজ্জু ছিন্ন হয়। অনেকের ধারনা প্লেগ নামক রোগটি অপ্রকাশিত মসূরিকা বা বসন্ত। আবার কেহ কেহ বলেন প্লেগ সান্নিপাতিক বিকার। প্লেগ যে সান্নিপাতিক বিকার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে উহার কারণের সমতা আছে কিনা তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা কঠিন। বসন্তকালে প্লেগের প্রকোপ হয় এজন্য প্লেগরোগটিকে বসন্তের সমজাতীয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের প্রযত্নে প্লেগপ্রকোপ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে।

এই বসন্তকালে একটি বিপদ দূরীভূত হইল, পুনরায় অপর একটি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্লেগ প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ, কিন্তু বসন্ত রোগ সংক্রামক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। প্লেগ হইলে লোকে যথাসাধ্য চিকিৎসা করায় কিন্তু বসন্ত হইলে লোকে দৈবকার্য্য অবলম্বন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। যদি কেহ অনিচ্ছাপূর্ব্বক চিকিৎসা করায়, তাহাও নিতান্ত অজ্ঞলোক দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের মনে সংস্কার "বসন্তের ঔষধ কোন শাস্ত্রে নাই।" এই ভ্রম কোথা হইতে আসিল, আমরা তাহার নির্ণয় করিতে পারি না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে মসূরিকাধিকার বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে, অথচ লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় কেন?

বসন্তরোগে প্রতিদিন শতাধিক লোক এক কলিকাতা সহরে মৃত্যু গ্রাসে পতিত, ইহা আমরা কখন শুনি নাই; ভারতে ইহা নূতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক, পূর্ব্বে উক্তরূপ বসন্তের প্রকোপ না থাকায় উহার চিকিৎসাবিষয়েও কেহ শিক্ষার জন্য যত্ন করিত না। ক্রমশঃ বসন্ত চিকিৎসা দিবাভীত অন্ধকারের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদগিরিগুহায় লুক্কায়িত

ছিল। এক্ষণে এই চিকিৎসার উপর যাহাতে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য ; এজন্য আমি আয়ুর্ব্বেদোক্ত বসন্ত চিকিৎসা সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ ও দেশের এই দুর্দ্দিন দূরীকরণ মানসে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মসূরিকা বা বসন্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই ঋষিবাক্য অবলম্বন করিয়া লিখিত ; একটিও কল্পনাপ্রসূত নহে। শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, এস্থলে বাঙ্গালা ভাষায় তাহাই অনূদিত হইল এবং সাধারণের বিশ্বাস জন্য ঋষিকৃত বচনগুলিও লিখিত হইল।

বসন্তরোগের প্রধান কারণ শরীরস্থিত পিত্ত ও রক্তের দুষ্টতা। যথা—

পিত্তং শোনিতসংসৃষ্টং
যদা দূষয়তি ত্বচম্।
তদা করোতি পিড়কাঃ
সর্ব্ব গাত্রেষু দেহিনাম্॥
মসূর মুদ্গমাষাণাং
তুল্যাঃ কালোপমাইতি।
মসূরিকাস্তুতা জ্ঞেয়া
রক্ত পিত্তাধিকা বুধৈঃ॥

শরীরস্থিত রক্ত, দুষ্ট পিত্তের সহিত যুক্ত সুতরাং দুষ্ট হইয়া শরীরের চর্ম্ম সমুদায়কে দূষিত করতঃ মসূর, মুগ, এবং মাষ কলায়ের ন্যায় পীড়কাকারে সর্ব্বাঙ্গে বহির্গত হয়, তাহাকে মসূরিকা বা বসন্ত রোগ বলিয়া থাকে। ইহা সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর। এই রোগে রক্তের ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বসন্তরোগোৎপত্তির পূর্ব্বে শরীরের যে অবস্থা হয় তাহা বর্ণনা করিতেছি—

তেষাং পূর্ব্বো জ্বরঃ কন্তু-
র্গাত্র ভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ।
ত্বচি শোথঃ সবৈর্বর্ণো
নেত্ররাগস্তথৈবচ॥

শরীরে বসন্ত বাহির হইবার পূর্ব্বে জ্বর ও গাত্রে চুলকানি হয় এবং সর্ব্বদা গাত্রভঙ্গ অর্থাৎ আড়ামোড়া খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। সর্ব্বাঙ্গ একটু ফুলা বোধ হয়। শরীরের স্বাভাবিক বর্ণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হয় এবং চক্ষু ঈষৎ লোহিতবর্ণ ধারণ করে, কোন কার্য্যে আসক্তি থাকে না। সর্ব্বদা ভ্রান্তি বোধ হয়।

শাস্ত্রে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি প্রধান। কতকগুলি অপ্রধান। বসন্তরোগের পূর্ব্বে যে সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাহার মধ্যে জ্বর প্রধান। জ্বর, সকল বসন্তের পূর্ব্বে হইয়া থাকে। জ্বর হয় নাই অথচ বসন্ত বাহির হইয়াছে, এরূপ দেখা যায় না। অপর লক্ষণগুলির মধ্যে স্থানবিশেষে ন্যূনাধিক্য হয়।

গ্রন্থান্তরে বসন্তের উৎপত্তি বিষয়ে যাহা লিখিত আছে তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

কট্বম্ল লবণক্ষার
বিরুদ্ধাধ্যমানার্শনৈঃ।
দুষ্ট নিষ্পাব শাকাদ্যৈঃ
প্রদুষ্ট পবনোদকৈঃ॥
ক্রুদ্ধগ্রহেক্ষণাচ্চাপি
দেহেদোষাঃ সমুদ্ধতাঃ।
জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্
দুষ্টরক্তেন সঙ্গতাঃ॥
মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ
পিড়কাঃস্যুর্মসূরিকাঃ।

অতিরিক্ত পরিমাণে কটু, (ঝাল) অম্ল, লবণ, ক্ষারবস্তু ভক্ষণ, বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, (দুগ্ধ মাংস একত্র ভক্ষণ, ঘৃত মধু সমান পরিমাণে ভক্ষণ ইত্যাদি), অধ্যশন (পূর্ব্বদিনের আহার সম্যক পরিপাক না হইতে তাহার উপর পুনরায় আহার করা), পচা দ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত শাকাদি ভক্ষণ, দূষিত জল বায়ু সেবন এবং দুষ্ট গ্রহাদির কুদৃষ্টি; এই সকল কারণে শরীরস্থিত বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া দুষ্টরক্তসহ মিলিত হইয়া শরীরে মসূরাকৃতি পিড়কা উৎপাদন করে। ইহাই মসূরিকা বা বসন্তরোগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শরীরের বায়ু, পিত্ত, কফ ও শোণিত, দুষ্ট হইয়া বসন্তরোগের উৎপত্তি করে ইহা পূর্ব্বে বলা হইল, কিন্তু সকল স্থানে সকল দোষের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। কোন স্থানে পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়, কোন স্থানে বায়ুর, কোন স্থানে কফের, কোন স্থানে রক্তের, কোন স্থানে বা ত্রিদোষের প্রকোপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে কোন্ দোষের প্রকোপে বসন্তের কিরূপ আকার ও শরীরে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা বলা যাইতেছে।

স্ফোটাঃশ্যাবারুণা রুক্ষা
স্তীব্রবেদনয়াম্বিতাঃ।
কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ
ভবত্যনিলসম্ভবাঃ॥
সন্ধ্যস্থি পর্ব্বণাং ভেদঃ
কাসঃ কম্পোঽরতির্ভ্রমঃ।
শোষস্তাল্বোষ্ঠ জিহ্বানাং
তৃষ্ণা’চারুচিসংযুতাঃ॥

বাতাধিক্য বসন্তের বর্ণ ঘোর বা অরুণবর্ণবিশিষ্ট, রুক্ষ, অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, কঠিন, বিলম্বে পাকিয়া থাকে। সে সময়ে সন্ধিস্থান ও পর্ব্ব সকল ভগ্ন হইবার মতন বোধ হয়, ফলে শরীর কম্পন কার্য্যে অনাসক্তি, ক্লান্তিমুখ, তালু জিহ্বাশোষ, তৃষ্ণা, অরুচি উপস্থিত হয়।

পিত্তাধিক্য ও রক্তাধিক্য বসন্তের লক্ষণ এবং আকৃতি বলা যাইতেছে।

রক্তাত্ পীতা সিতাঃ স্ফোটাঃ
সদাহাস্তীব্র বেদনাঃ।
ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ
পিত্তকোপসমুদ্ভবাঃ॥
বিড়্ ভেদাশ্চাঙ্গদাহশ্চ
তৃষ্ণারত্যরুচী তথা।
মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ
জ্বর স্তীব্রঃ সুদারুণঃ॥

পিড়কা সমুদায়ের আকৃতি রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, অত্যন্ত দাহ ও বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। পিড়কা সমুদায় অচিরকাল মধ্যে পক্কতা প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ পিড়কা হইলে মলভঙ্গ হয়। দাহ তৃষ্ণা অনুভূত হয়। কোন কার্য্যে আসক্তি থাকে না। অরুচি হয়, চক্ষের রক্তবর্ণতা এবং জ্বরের তীব্রতা অনুভূত হয়।

এক্ষণে শ্লেষ্মার আধিক্যে বসন্তে যে যে লক্ষণ হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে।

শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ
কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ।
মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ
চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
কফপ্রসেক স্তৈমিত্যং
শিরোরুক্ গাত্র গৌরবম্।

হৃল্লাসাশ্চারুচি র্নিদ্রা
তন্দ্রালস্য সমন্বিতাঃ

শ্লেষ্মজাত পিড়কা সমুদায় শ্বেতবর্ণ স্নিগ্ধ (তৈলাদি মাথার ন্যায় বোধ হয়), অত্যন্ত স্থূল, চুলকানিবিশিষ্ট, অল্প বেদনাযুক্ত হয়। ঐ বসন্ত একটু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। শ্লেষ্ম জন্য বসন্ত শরীরে উত্থিত হইলে শরীর আদ্রবস্ত্র দ্বারা বেষ্টনের ন্যায় বোধ হয়, মুখস্রাব, শিরোবেদনা, শরীরের গুরুত্ব বমনেচ্ছা, অরুচি, তন্দ্রা ও আলস্য বোধ হয়।

ইচ্ছা বসন্তের মধ্যে উক্ত কয়েকপ্রকার বসন্ত সুখসাধ্য। সামান্য ঔষধ প্রলেপে আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। কেবল বাতজন্য বসন্ত কষ্টসাধ্য; তাহা পরে বলা হইবে। এক্ষণে রোমান্তি বা হামের বিষয় বলা যাইতেছে।

লোমকূপোন্নতৈমমা
বাণিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।
কাসারোচকসংযুক্তা
রোমন্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥

নানাবর্ণ লোমকূপজাত অতি ক্ষুদ্র যে বসন্ত তাহাকে লোমান্তি বা হাম কহে। উহা কফপিত্ত জন্য হইয়া থাকে, হাম হইবার পূর্ব্বেও জ্বর হয়। জ্বরের পরে ক্রমশঃ হাম বাহির হইতে আরম্ভ হয়। হাম হইলে কাস অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলে হাম তত কষ্টসাধ্য নহে, তবে অজ্ঞ লোকের হাতে পড়িলে সুখসাধ্যও কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

পানি বা জলবসন্ত যথা—

তোয়বুদ্বুদ সঙ্কাশাস্ত-
কগতাস্ত মসূরিকাঃ।
স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে
ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ॥

ত্বকের উপরে জলবিম্বের ন্যায় যে সকল বসন্ত উৎপন্ন হয় তাহাকেই পানিবসন্ত বলে, ইহার সহিত সামান্য দোষের সংস্রব থাকে। ইহা বিদীর্ণ হইলে কেবল জল বাহির হয়; ইহাও সুখসাধ্য।

যে যে বসন্ত সুখসাধ্য তাহার প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

ত্বক্‌গতা রক্তজাশ্চৈব
পিত্তজাঃ শ্লেষ্মজস্তথা।
শ্লেষ্মপিত্তকৃতাশ্চৈব
সুখসাধ্যা মসূরিকাঃ॥
এতা বিনাপি ক্রিয়য়া
প্রশাম্যন্তি শরীরিণাম্

ত্বক্‌গত অর্থাৎ রসধাতুজাত, রক্তজাত, পিত্তজাত, শ্লেষ্মজাত, এবং পিত্তশ্লেষ্মজাত মসূরিকা সুখসাধ্য। বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়। রক্তধাতু যদি অত্যন্তদুষ্ট হয় তবে রক্তজ বসন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

কষ্টসাধ্য বসন্ত যথা—

বাতজা বাতপিত্তোত্থাঃ
শ্লেষ্মবাত কৃতাশ্চ যাঃ।
কৃচ্ছ্রসাধ্যা মাতাস্তস্মাৎ
যত্নাদেতা উপাচরেৎ॥

বায়ুজাত, বাতপিত্তজাত, বাতশ্লেষ্মজাত বসন্ত কষ্টসাধ্য, এজন্য অতি যত্নের সহিত ঐ সকল বসন্তের চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাতিক বসন্ত অসাধ্য। যথা—

অসাধ্যাঃ সান্নিপাতোত্থা-
স্তাসাম্ বক্ষ্যামি লক্ষণং।

প্রবালসদৃশাঃ কাশ্চিৎ
কাশ্চিজ্জম্বু ফলোপমাঃ॥
লৌহজাল সমাঃ কাশ্চি-
দতসী ফলসন্নিভাঃ।
আসাং বহুবিধা বর্ণা
জায়ন্তে দোষ ভেদতঃ॥
কাসো হিক্কা প্রমোহশ্চ
জরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ।
মুখেন প্রস্রবেদ্রক্তং
তথা ঘ্রাণেন চক্ষুসা॥
কণ্ঠে ঘুর্ঘুরকং কৃত্বা
শ্বসিত্যর্থ বেদনম্।
মসূরিকাভিভূতস্য
যস্যৈতানি ভিষগ্‌বরঃ॥
লক্ষণানি চ দৃশ্যন্তে
ন দদ্যাৎ তত্রভেষজং॥
মসূরিকাভিভূতো যো
ভৃশং ঘ্রাণেন নিশ্বসেৎ।
সভৃশং ত্যজতি প্রাণাং
স্তৃষ্ণার্ত্তো বায়ুদূষিতঃ॥
মসূরিকান্তে শোথঃ
স্যাৎকুর্পরে মণিবন্ধকে।
তথাংশ ফলকেচাপি
দুশ্চিকিৎস্যঃ সুদারুণ॥

সান্নিপাতিকক্ষেত্রে যে সকল বসন্ত হয় তাহার চিকিৎসা সাধ্যাতীত। তাহার আকার ও বর্ণ নানা প্রকার হইয়া থাকে। কোনটি প্রবালসদৃশ কোনটি পাকা জামের মত, কোনটি বা আতসী ফলের মত, এবং কোন কোনটী লৌহজালের ন্যায় বোধ হয়। বায়ু, পিত্ত কফের ন্যূনাধিক্যবশতঃ নানারূপ আকার ধারণ করে। উহার সহিত কাস হিক্কা প্রমোহ (জ্ঞানহীনতা) প্রবল জ্বর, প্রলাপ, কার্য্যে আসক্তিহীনতা, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শরীর ঘূর্ণন, মুখ নাক ও চক্ষু দিয়া রক্তস্রাব, কণ্ঠে ঘুর্‌ঘুর্ শব্দ, শ্বাস, ব্রণের অত্যর্থ বেদনা, এই সকল লক্ষণ যে রোগীর হয় তাহাকে ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। পুনশ্চ বসন্তাক্রান্ত যে ব্যক্তি নাসিকা দ্বারা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, অত্যন্ত পিপাসাতুর, তাহাও অসাধ্য; তাহাদিগকেও ঔষধ প্রদান করিবে না। মসূরিকা শান্তির পর কনুই স্কন্ধ ও কফোনিতে কিঞ্চিৎ শোথের সঞ্চার হয় তাহাও দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া গণ্য করিবে।

বায়ু, পিত্ত, কফ দুষ্ট হইয়া, রস বা রক্ত ধাতুকে আশ্রয় করতঃ দোষের প্রাধান্য রাখিলে যেরূপ যেরূপ বসন্ত হয় এবং তাহার মধ্যে যেগুলি অনায়াসসাধ্য ও যেগুলি কষ্টসাধ্য তাহা সংক্ষেপে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে বায়ু পিত্ত কফের সংমিশ্রণে মাংস মেদ প্রভৃতি ধাতু দুষ্ট হইয়া নিজ নিজ প্রাধান্য প্রকাশ করিলে যে যে বসন্ত হয় তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। আমরা যে সকল দ্রব্য ভক্ষণ করি তাহার কতক অংশ সার অর্থাৎ রসধাতু রূপে পরিণত হয় এবং কতক অংশ অসার অর্থাৎ মলরূপে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়। ঐ রসধাতু হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রসের ক্রমশঃ শুক্ররূপে পরিণত হইতে এক মাস সময় লাগে, সুতরাং পর পর ছয় দিনের দিনে এক ধাতু অন্য ধাতুতে পরিণত হয় অর্থাৎ রসধাতু ছয়দিনের দিনে রক্তরূপ ধারণ করে। এরূপে ক্রমে ক্রমে একমাসে

শুক্ররূপে পরিণত হয়। কেবল দুগ্ধ একদিনে শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া যত অন্তর্ধাতু-প্রবিষ্ট হয় রোগ ততই দুঃসাধ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ কুপিত বায়ু পিত্ত কফ, রসধাতু আক্রান্ত হইলে পীড়া অনায়াসসাধ্য হয়। রক্ত ধাতু আক্রান্ত হইলে অপেক্ষাকৃত দুঃসাধ্য হয়; মাংসধাতু আক্রান্ত হইলে উহা অপেক্ষা অধিক দুঃসাধ্য হইয়া থাকে। এইরূপে যত অন্তধাতু আক্রান্ত হইবে, পীড়া ততই দুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইবে।

পূর্ব্বোক্ত কারণে কুপিত বায়ু পিত্ত কফ মাংস প্রভৃতি ধাতুর দোষ উৎপাদন করিয়া যেরূপ যেরূপ বসন্তরোগ উৎপাদন করে তাহার বিষয় নিম্নে বলা যাইতেছে।

উল্লিখিত কারণে রক্তের অত্যন্ত দোষ জন্মিলে নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ
শীঘ্রপাকা স্তনুত্বচঃ।
সাধ্যানাত্যর্থদুষ্টাশ্চ
ভিন্নারক্তং স্রবন্তিচ॥

যে সকল বসন্ত লোহিতবর্ণ হয় শীঘ্র পাকিয়া যায়; বসন্তের আবরণ অত্যন্ত পাতলা হয়, কোনরূপে বসন্ত বিদীর্ণ হইলে রক্তস্রাব হয়। রক্তের দুষ্টির তারতম্যানুসারে বসন্তের সাধ্যাসাধ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ রক্ত, বায়ু, পিত্ত, কফ কর্তৃক অত্যন্ত দূষিত হইয়া কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হয়। দুষ্টির অল্পতা থাকিলে সুখসাধ্য হয়।

এক্ষণে মাংসদুষ্টি বসন্তের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধা-
শ্চিরপাকা ঘনত্বচঃ।
গাত্রশূলাবর্ত্তিকণ্ডু-
তৃষাজ্বর সমন্বিতাঃ॥

মাংস দুষ্ট হইয়া যে মসূরিকা হয় তাহা অত্যন্ত কঠিন, তৈল ম্রক্ষিতবৎ বোধ হয়। বিলম্বে পাকিয়া থাকে। মসূরিকার চর্ম্মের স্থূলতা জন্মিয়া থাকে। শরীরে বেদনা হয়, কোন কার্য্যে আসক্তি থাকে না, সর্ব্বশরীর চুলকায়, তৃষ্ণা ও জ্বর অনুভূত হয়। এরূপ বসন্ত অতি কষ্টসাধ্য।

এক্ষণে মেদগত বসন্তের কথা বলা যাইতেছে।

মেদজা মণ্ডলাকারা
মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
ঘোরজ্বর পরীতাশ্চ
স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ।
সংমোহারতি সন্তাপাঃ
কাশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ।

মেদগত মসূরিকার আকার গোল, অত্যন্ত কোমল কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া থাকে, ইহাও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তৈল ম্রক্ষণবৎ বোধ হয়। শরীরে অত্যন্ত বেদনা জন্মিয়া থাকে। এরূপ বসন্তে প্রবল জ্বর প্রকাশ পায় তজ্জন্য রোগী জ্ঞানহীনপ্রায় হইয়া যায়। কোন বিষয়ে আসক্তি থাকে না, শরীরের সন্তাপ বৃদ্ধি পায়। এরূপ বসন্ত হইলে কেহ কেহ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকেন। অধিকাংশই মানবলীলা সম্বরণ করে।

এক্ষণে অস্থি ও মজ্জাগত বসন্তের বিষয় বলিব। উভয়বিধ বসন্তের প্রভেদ প্রায় পরিলক্ষিত হয় না।

ক্ষুদ্রা গাত্র সমারক্ষা-
শ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ।
মজ্জোত্থা ভৃশসংমোহ-
বেদনারতি সংযুতাঃ॥
ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি
প্রাণানাশু হরন্তি চ।
ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি
কুর্ব্বন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ॥

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, তাহাদের বর্ণ শরীরের বর্ণের মতনই হইয়া থাকে। কোন কোনটি চিড়ার মত আকার ধারণ করে এবং একটু উন্নত হইয়া উঠে। অত্যন্ত জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কার্য্যে আসক্তি থাকে না। শরীরে বেদনাধিক্য বোধ করে। শরীরের মর্ম্মস্থান সকল যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এই রূপ বোধ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ অস্থিগত মসূরিকায় অস্থির মধ্যে ভ্রমর দংশনের ন্যায় যন্ত্রণা অনুভব করে। এ অবস্থায় রোগী অধিক্ষণ জীবিত থাকে না।

শুক্রজ বসন্তের লক্ষণ বলা যাইতেছে।

পক্কাভাঃ পীড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ
সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থ বেদনাঃ।
স্তৈমিত্যারতিসংমোহ
দাহোন্মাদ সমন্বিতাঃ॥
শুক্রজায়াং মসূর্য্যান্তু
লক্ষণানি ভবন্তিহি।

শুক্রজাত বসন্ত পক্ক বসন্তের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। বসন্ত গুলি তৈলম্রক্ষণবৎ বোধ হয়, শরীরে বেদনা বিলক্ষণ থাকে। শরীর সর্ব্বদাই যেন আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা বেষ্টিত বোধ হয়। কোন কার্য্যে আসক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটে। সর্ব্বদা গাত্রদাহ, রোগী যেন পাগলের মত হইয়া থাকে। এপ্রকার বসন্ত রোগে কেহই রক্ষা পায় না।

যে সপ্ত ধাতুগত বসন্তের কথা বলা হইল সেই সকল বসন্তে দোষের অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া বসন্তের স্বরূপ নিরূপণ ও চিকিৎসা করিতে হইবে।

যেমন সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সপ্ত স্বর ও উদারা, মুদারা, তারা, এই তিন স্বর সম্যক শিক্ষা না করিলে সঙ্গীত শাস্ত্রে সম্যক প্রবেশ করিতে পারা যায় না; সেইরূপ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত ধাতু ও বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন দোষ ইহাদের স্বরূপ না জানিলে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। এজন্য সপ্তধাতু ও তিন দোষের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

শরীরং দূষণাৎ দোষা
মলিনী করণাৎ মলাঃ।
ধারণাৎ ধাতবো জ্ঞেয়া
বাতপিত্ত কফাশ্রয়ঃ॥

শরীরকে দূষিত করে এজন্য বায়ু, পিত্ত কফকে দোষ বলে, মলিন করে বলিয়া মল বলে এবং ধারণ করে এজন্য ধাতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

যেমন জল প্রকৃতাবস্থায় শরীর রক্ষক হয়, কিন্তু কোন কারণে বিকৃত হইলেই শরীর নাশক হইয়া থাকে, বায়ু, পিত্ত, কফও সেই-রূপ প্রকৃত অবস্থায় শরীর রক্ষক এবং কোন

কারণে দুষ্ট হইলেই শরীর নাশক হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফ কোন কারণে দুষিত হইলেই শরীরস্থিত রস, রক্ত, মাংস প্রভৃতির বিকার করিয়া নানারূপ রোগ উৎপাদনকরতঃ শরীর নাশ করিবার উপক্রম করিয়া থাকে, এজন্য বায়ু পিত্ত কফকে দোষ এবং রস রক্ত প্রভৃতি ধাতুকে দূষ্য বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যেমন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের পরস্পর সংযোগে অসংখ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে সেইরূপ বায়ু, পিত্ত, কফ তিন দোষ এবং রস রক্ত মাংস প্রভৃতি সপ্ত ধাতুর সংযোগে অসংখ্য ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কতকগুলি রোগে দোষের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের প্রাধান্য। কতকগুলি রোগে রস রক্তাদি ধাতুর প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নবজ্বর শ্বাস কাস, শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে দোষের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কুষ্ঠ, বসন্ত শ্লীপদ শোথ গলগণ্ড প্রভৃতি রোগে দূষ্য অর্থাৎ রস রক্তাদির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে বায়ু পিত্ত কফ ও রস রক্ত মাংস প্রভৃতির উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার সময় একরূপ ফেনার ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ ফেনা মধুর রস হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ ফেনাকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা কফ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্দ্ধপরিপাকাবস্থায় যখন ভুক্ত দ্রব্য আমাশয় হইতে পক্কাশয়ে গমন করে তখন উহা হইতে একরূপ নির্ম্মল রস নির্গত হয়, উহা অম্লরস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঐ রসকে পিত্ত বলিয়া থাকেন। যখন ভুক্ত দ্রব্য পক্কাশয়ে গমনকরতঃ কোষ্ঠাগ্নিদ্বারা পিণ্ডাকার ধারণ করে তৎকালে উহা হইতে বায়ু উৎপন্ন হয়। ঐ বায়ু কটুরস হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অন্নস্য ভুক্তমাত্রস্য
ষড়্রসস্য প্রপাকতঃ।
মধুরাখ্যাৎ কফো ভাবাৎ
ফেনভাব উদীর্য্যতে॥
পরন্তু পচ্যমানস্য
বিদগ্ধস্যাম্লভাবতঃ।
আশয়াচ্চ্যবমানস্য
পিত্তমচ্ছমুদীর্য্যতে॥
পক্কাশয়ন্তু প্রাপ্তস্য
শোষ্যমানস্য বহ্নিনা।
পরিপিণ্ডিত পক্বস্য
বায়ুঃস্যাৎ কটুভাবতঃ॥

ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে সমুদায় দ্রব্যই অর্থাৎ মধুর, অম্ল, লবণ কটু তিক্ত ও কষায় এই ছয় প্রকার রসবিশিষ্ট দ্রব্যই তিন রসে পরিপাক পায়। মিষ্ট ও লবণ রস মধুর রসে, অম্ল অম্লরসে এবং কটু তিক্ত কষায় রস, কটু রসেই পরিপাক পায়। দ্রব্য গুণের সহিত বায়ু পিত্ত কফের নিকট সম্বন্ধ। সুতরাং তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক, এজন্য নিম্নে সংক্ষেপে কিছু বলা হইল, পরে বিশেষ করিয়া বলিব।

ত্রিধা বিপাকো দ্রব্যস্য
স্বাদ্বম্লকটুকাত্মকঃ।
কটু তিক্ত কষায়াণাম্
বিপাকঃ প্রায়শঃ কটুঃ॥

অম্লহেম্লঃ পচ্যতে
স্বাদুর্ম্মধুরং লবণস্তথা ;
জাঠরেণাগ্নিনা পক্কাৎ
যদুদেতিরসান্তরং ॥
রসাণাং পরিণামোহন্ত্যা
স বিপাক ইতিস্মৃতঃ।
রস বীর্য্য বিপাকানাম্
সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষ কর্ম্মণাঞ্চৈব
প্রভাব স্তত্র স স্মৃতঃ॥
কটুকঃ কটুকঃ পাকে
বীর্য্যোষ্ণশ্চিত্রকোমতঃ।
তদ্বৎ দণ্ডী প্রভাবাত্ত
বিরেচয়তি মানবং।
তদদ্রব্য মাত্মনা কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিৎবীর্য্যেন সেবিতং।
কিঞ্চিৎ রস বিপাকাভ্যাং
দোষং হন্তিকরোতি চ।

দ্রব্য সকল জঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাক পাইলে অন্য রসের উৎপত্তি হয়, তাহাকে বিপাক কহে। কেবল অম্ল ও কটুরসের পরিবর্ত্তন হয় না। রস, বীর্য্য বিপাকের সমনতা সত্ত্বে সে স্থানে নূতন কার্য্য হয় তাহাকে প্রভাব কহে। যেমন কটকী চিত্রক দণ্ডী সমানগুণবিশিষ্ট হইলেও দণ্ডী বিরেচনের কার্য্য করে। ঐ বিরেচন কার্য্য দণ্ডীর প্রভাবেই হইয়া থাকে। দ্রব্যের বীর্য্য দুই প্রকার, শীত বীর্য্য ও উষ্ণ বীর্য্য। দোষের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত কফের হ্রাস ও বৃদ্ধি, দ্রব্য সকল স্ব স্ব রসদ্বারা, কখন স্বীয় বীর্য্য দ্বারা কখন বা বিপাক এবং প্রভাব দ্বারা সংসিদ্ধ করে। রুক্ষ, শীত, লঘু, সূক্ষ্ম, চল, বিশদ ও খর বায়ুর গুণ। বায়ু এই সকল গুণবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল গুণবিশিষ্ট যে সকল পদার্থ তাহাই বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। যেমন রুক্ষ দ্রব্য, ভৃষ্ট তণ্ডুল বায়ুবর্দ্ধক হয়। অত্যন্ত শীতল বস্তু তুল্য গুণহেতু বায়ুবর্দ্ধক হয়। অতিশয় ভ্রমণ করিলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কারণ বায়ু চলগুণবিশিষ্ট সুতরাং চলিলে বায়ু বৃদ্ধি হয়। কষায় কটু ও তিক্ত রস বায়ুবর্দ্ধক হইয়া থাকে। কারণ কষায় রসে বায়ু ও পৃথিবীগুণ বাহুল্য, কষায় রসে বায়ুর ভাগ আছে বলিয়াই বায়ু বর্দ্ধক হইবে। কটু রস বায়ু ও তেজের যোগে উৎপন্ন হয়, সুতরাং বায়ু বর্দ্ধক। তিক্তরসে, বায়ু ও আকাশ পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া বায়ুবর্দ্ধক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে। যথা অত্যন্ত পরিশ্রম, উপবাস, ধাতু ক্ষয়, শরীরে কোন স্থান ভগ্ন হইলে, মল মূত্রাদির বেগধারণে, অত্যন্ত শীতল বস্তু সেবনে, সর্ব্বদা মনে ত্রাস ও ক্ষোভ হইলে বর্ষাকালে, দিবাশেষে এবং ভোজনান্তে বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শরীরে বায়ু বর্দ্ধিত ও বিগুণতা প্রাপ্ত হইলে সাধারণতঃ উদরাধ্মান, শরীরের উষ্ণতা ও রুক্ষতা, কম্পন, সূচিবেধনবৎ পীড়া, সর্ব্বদা মনে ক্ষোভ, শুষ্ক কাসি, শরীরের অবসন্নতা পরুষতা ইত্যাদি পীড়া জন্মিয়া থাকে।

স্বাদু অম্ললবণ রসবিশিষ্ট দ্রব্য, ঈষদুষ্ণ ভুক্তদ্রব্য, বস্তিপ্রয়োগ, তৃপ্তিপুর্ব্বক আহার ও অঙ্গমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়।

বায়ুর গুণ ও বৃদ্ধির কারণ এবং কি

প্রকারে বায়ুর শান্তি হয় তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। এক্ষণে পিত্তের প্রকোপ প্রশমাদির বিষয় বলিতেছি। যথা

পিত্ত স্নিগ্ধ, উষ্ণ, তীব্র, দ্রব, অম্ল ও কটু রস বিশিষ্ট। অম্ল লবণ কটু (ঝাল) রসে পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অম্লরস হইতে পিত্ত উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহা পিত্ত বর্দ্ধক ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লবণে ভূমি ও অগ্নিগুণের আধিক্য, সুতরাং লবণে উষ্ণগুণহেতু পিত্তকে বৃদ্ধি করিবে এবং কটুরসও অগ্নির আধিক্য বশতঃ পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি পিত্তবৃদ্ধির কারণ বলিতেছি। বিদাহি দ্রব্য (যাহা সম্যক পরিপাক হয় না, যেমন করীরাদি) উষ্ণদ্রব্য, তিল, মসিনা, দধি, কাঁজি প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে ও অত্যন্ত ক্রোধ, উপবাস, রৌদ্রের তাপসেবন, ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সময়ে, শরৎ ও গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে এবং অদ্ধরাত্রে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

শরীরে পিত্ত প্রবৃদ্ধ ও প্রকুপিত হইলে অম্ল উদ্গার, প্রলাপ, স্বেদনির্গম, মূর্চ্ছা, গাত্রে দুর্গন্ধতা, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকুপিত পিত্তের শান্তি করিতে হইলে তিক্ত, মধুর কষায়রস শীতল দ্রব্য, জ্যোৎস্নাসেবা, স্ত্রীগাত্র সংস্পর্শ, ঘৃত দুগ্ধ সেবন, শরীরে চন্দনাদি মর্দ্দন দ্বারা পিত্ত প্রশমিত হয়।

এক্ষণে শ্লেষ্মার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। মধুর অম্ললবণ রস শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকারক। মধুর রসে শ্লেষ্মা উৎপন্ন হয়, সুতরাং মধুর রস শ্লেষ্মাবর্দ্ধক; অম্লরস তোয়াধিক্যবশতঃ শ্লেষ্মাবর্দ্ধক হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি শ্লেষ্মাবর্দ্ধক বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। গুরু, স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুজাতদ্রব্য, দ্রবদ্রব্য, দধি, দিবানিদ্রা, শীতকাল, দিবসের পূর্ব্বভাগ প্রভৃতি শ্লেষ্মাপ্রকোপের কারণ।

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইলে সর্ব্বদাই যেন তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারের ন্যায় বোধ হয়। তন্দ্রা, শরীরের গুরুতা, শীততা, নিদ্রাধিক্য, দীর্ঘসূত্রতা, মুখস্রাব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এই শ্লেষ্মা প্রকোপ নিবারণে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রুক্ষ, ক্ষার কষায়, তিক্ত ও কটু দ্রব্য, অত্যন্ত পরিশ্রম, উক্ত দ্রব্য সেবন, উপবাস, রাত্রি জাগরণ, স্ত্রীসেবা প্রভৃতি দ্বারা শ্লেষ্মা প্রশমিত হয়।

উদাহরণ কথা।

—★—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের অনুবৃত্তি।)

১। "লাভঃ পরং গোবধঃ।"

এই উদাহরণের দুইটি শ্লোক দুই রকমের ও তদ্‌ঘটিত ক্ষুদ্র গল্পও দুই রকমের দুইটি আছে। তাহার একটি এই—

এক কিরাতরাজ কতকগুলি কুক্কুর পুষিয়াছিল। কিরাতরাজ ভাবিয়াছিলেন, কুক্কুরগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহাদেরই সাহায্যে সিংহ বধ করিবেন। কুক্কুরগুলিকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহই গোবধ করতঃ তন্মাংসে কুক্কুরগুলি পোষণ করিতে লাগিলেন। কুক্কুর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইলে তিনি একদিন সেগুলিকে লইয়া সিংহ ধরিবার আশায় অরণ্যমধ্যে গমন করিলেন। পরন্তু কুক্কুরেরা বনমধ্যে ছোট ছোট নেকড়ে বাঘ দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। সুতরাং রাজার কুক্কুরের সাহায্যে সিংহ ধরা হইল না, তিনি হতাশ্বাস হইয়া ম্লান মুখে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে কোন লোক তাঁহাকে নিম্নলিখিত শ্লোক বলিয়াছিল।

২। "পারীন্দ্রস্য পরাভবায়
সুরভীমাংসেন দুর্মেধসাঃ
পুষ্যন্তে কিল পীবরাঃ
কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
ন ত্বেতন্মদমত্তবারণ
চমূবিদ্রাবণঃ কেশরী
জেতব্যোভবতা কিরাত-
নৃপতে। লাভঃ পরং গোবধঃ॥"

হে কিরাতরাজ! তুমি সিংহ ধরিবার আশায় এই সকল কুক্কুর পোষণ করিয়াছ এবং ইহাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিবার জন্য প্রত্যহ গোমাংস ভক্ষণ করাইয়াছ। সেই সকল কুক্কুর এক্ষণে হস্তিযূথপরাভবকারী সিংহ পরাভবে সমর্থ হইল না। ইহাদিগের পোষণে তোমার আশা ত ফলবতী হইল না, কেবল লাভ হইল গোবধ।" অর্থাৎ গোবধজনিত মহাপাপ।

উক্ত উদাহরণকথার অন্যবিধ গল্প এইরূপ—

কোন রুগ্ন ব্যক্তি হরিহরনামা এক বিখ্যাত কবিরাজের নিকট রোগ দেখাইতে গিয়াছিলেন। হরিহর তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা দিলেন, শুণ্ঠী ও গোক্ষুর সমভাগে লইয়া তাহার পাচন প্রস্তুত করতঃ পান করিবে। রোগীটা মূর্খের চূড়ামণি, সে বাড়ী আসিয়া একটি গরু মারিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন প্রস্তুত করিল ও তাহা পান করিল। পরদিন হরিহর বৈদ্য তাহার রোগ কমিল কি না, জানিবার জন্য তাহার গৃহে আসিল এবং পাচনের ব্যাপার সমস্তই শুনিল। তৎশ্রবণে হরিহর অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করিল ও তৎক্ষণাৎ তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য
মনসা কল্কাশনং যন্ময়া
উক্তং তৎ বিপরীতকং
কৃতমহো গোক্ষুরকং যদ্দদৌ।
নার্থোমূর্খজনালয়েনচ সুখং
নোবা যশো লভ্যতে
সর্দ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ
হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

আমি মনে মনে বিচার করিয়া গোক্ষুর ও শুণ্ঠী এই দুই দ্রব্যের কল্ক সেবন করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু এই হস্তিমূর্খটা গোবধ করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়াছে। মূর্খের চিকিৎসা করিতে আমার অর্থলাভ, সুখ ও যশোলাভ. তিনের কিছু নাই, লাভের মধ্যে হইল গোহত্যার পাপ।

৩। "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ।"

কর্ম্মতৎপরতা ও বুদ্ধি দুই পৃথক্ পদার্থ। যে ব্যক্তি কর্ম্মতৎপর, বুদ্ধি তাহারই অনুগামিনী হয়। কিন্তু কর্ম্ম বুদ্ধির অনুগামী হয় না। ভাবার্থ এই যে, কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ত্তব্যবিষয়ে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি জন্মে পরন্তু কর্ম্মাভ্যাস ব্যতিরেকে বুদ্ধি থাকিলেও তাহার লোপ অবস্থা ঘটে। এতদ্বোধক শ্লোকটি এই—

কর্ম্মণাবাধ্যতে বুদ্ধির্ন-
বুদ্ধ্যা কর্ম্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো
হৈমং হরিণ মন্বগাৎ॥"

বুদ্ধি কর্ম্মের বাধ্য, কর্ম্ম বুদ্ধির বাধ্য নহে। দেখা যায়, রাম বুদ্ধিমান্ হইয়াও সোণার মৃগ মারিতে গিয়াছিলেন।

৪। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্যভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতোমনুষ্যাঃ।"

এক রাজনন্দিনী পিতার অধিকারস্থ এক ব্রাহ্মণের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিলেন। এবং রাজকন্যার অধ্যয়নাদির ভার নিজ পুত্রের প্রতি অর্পিত হইল। ব্রাহ্মণপুত্র পিতার আজ্ঞায় প্রত্যহই রাজকন্যাকে শিক্ষা দিতে গমন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি যথানিয়মে পড়াইয়া রাজপুত্রীকে লিখাইতেছেন, এমন সময়ে রাজনন্দিনীর লেখনী তদীয় হস্ত হইতে স্খলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল। গুরুনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহা ভূতল হইতে উঠাইয়া রাজকুমারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহাতে রাজপুত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়া গুরুনন্দন সকাশে কৃতজ্ঞতা ও উপকার স্বীকার করিলেন। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ যুবক বলিলেন, যদি আমার দ্বারা উপকার হইয়াছে এরূপ বিবেচনা হয় তাহা হইলে আমারও প্রত্যুপকার করা তোমার উচিত। রাজকুমারী ভাবিলেন, গুরুনন্দন ব্রাহ্মণ, ধনহীন, বোধ হয় আমার নিকট ইহাঁর কিঞ্চিৎ ধনপ্রার্থনা করিবার অভিলাষ হইয়াছে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আপনি যাহা চাহিবেন আমি তাহাই আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ যুবক উত্তম অবসর দেখিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তিনি কামাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, আমাকে বরমাল্য দাও, আমি অন্য কিছু চাহি না। যুবকের ঐ বাক্য শুনিয়া রাজপুত্রী কিয়ৎক্ষণ হতজ্ঞানের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে থাকিলেন, পরে বলিলেন, আপনাকে বরমাল্য দিলে আমাকে সধবা হইয়াও বিধবার

স্থায় থাকিতে হইবে। যাহাই হউক, আমি যখন প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিয়াছি, তখন তাহা অতিক্রম করিতে পারিব না। আপনি এক কার্য্য করিবেন। অদ্য রাত্রে গোপনে হরিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া অবস্থিতি করিবেন। আমি তথায় গিয়া আপনার গলে বরমালা প্রদান করিব। রাজপুত্রীর এই কথা শুনিয়া শুকনন্দনের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরে উভয়েই স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। যখন ইহাঁদিগের উভয়ের ঐরূপ কথোপকথন হয় অধ্যাপকের কার্ত্তিক নামক ভৃত্য অদূরে থাকিয়া ঐ সকল কথা শুনিয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয় সেই দিনই নিমন্ত্রণ হইতে বাটী আসিলেন। পরন্তু ব্যস্তসমস্ত হইয়া কার্ত্তিক আগে ঐ সকল কথা ও ঘটনা অধ্যাপকের কর্ণগোচর করাইলেন। অধ্যাপক ঘোর বিপদ উপস্থিত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। পরে কার্ত্তিকের সহিত পরামর্শ করিয়া আপন পুত্রকে একটি গৃহ মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে কার্ত্তিক শুকপুত্রের বেশ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট হরিমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্ধকারে বসিয়া রহিল। যথাসময়ে রাজনন্দিনী আসিয়া সম্বোধন করিলে কার্ত্তিক সেই অন্ধকার গৃহ-মধ্যে "হুঁ" মাত্র এইটুকু বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল। অতঃপর রাজপুত্রী শুকপুত্রজ্ঞানে তদীয় গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন। কার্ত্তিক এখন আপনার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল। এই ঘটনায় রাজপুত্রী শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, কি করিতে কি হইল। কিয়ৎ পরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

"গুরোশ্চপুত্রে বরমাল্য দানে
দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্ত্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ॥"

অর্থাৎ আমি গুরুপুত্রের গলে বরমালা দিতে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম; পরন্তু দুর্ভাগ্যের প্রেরণায় আমাকে কার্ত্তিককে বরণ করিতে হইল। অতএব, মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও নারীর চরিত্র ও পুরুষের ভাগ্য বুঝিতে পারেন না।

৫। "সঞ্চিতার্থোবিনশ্যতি।"

কোন এক রাজা অত্যন্ত অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন। ক্রমে তাঁহার ধনাগার ধনশূন্য হইল। অতঃপর তিনি আয় অনুসারে ব্যয় করিতে লাগিলেন পরন্তু সঞ্চয়ের চেষ্টা রহিল না। রাজার এতদ্রূপ ব্যবস্থায় রাজমন্ত্রী কিছু দুঃখিত হইয়া ভাবিলেন, বিপদকালে এই রাজা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন না। যদি এই ধনশূন্যতা শত্রুবর্গের গোচরিত হয়, তাহা হইলে রাজ্যরক্ষাও ইহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে, সন্দেহ নাই। কি করা যায়, ধন রক্ষার কথা স্পষ্টতঃ বলিতেও ভয় হয়। পরে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, প্রকাশ্যে না বলিয়া কৌশলে ধনরক্ষার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত করা যউক। অনন্তর তিনি, রাজার দৃষ্টি পড়ে এরূপ স্থানে গৃহভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন।

আপদর্থেধনংরক্ষেৎ।

দুই এক দিন পরে ঐ শ্লোকাংশে রাজার দৃষ্টি পড়িল। তিনি বুঝিলেন, মন্ত্রীই ইহা আমাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছে। পরে তিনি ঐ শ্লোকাংশের নীচে উহার প্রত্যুত্তর লিখিলেন—

শ্রীমতাং কথমাপদঃ ?

পরে মন্ত্রী তাহা পাঠ করিয়া তাহার নীচে লিখিলেন—

কদাচিচ্চলতে লক্ষ্মী

ইহা পাঠ করিয়া রাজা তন্নিম্নে লিখিলেন—

সঞ্চিতার্থো বিনশ্যতি।

ইহাতে একটি শ্লোক পাদচতুষ্টয়ে পূর্ণ হইল। শ্লোকটির অর্থ এই যে, আপদবিপদের জন্য ধন সঞ্চয় করা আবশ্যক। রাজার অভিপ্রায় তাহা অনাবশ্যক। কেননা, যাবৎ লক্ষ্মীর অনুগ্রহ তাবৎ আপদ সমাগম হয় না। মন্ত্রী-রাজের অর্থ—লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি বিচলিত হইলে আপদ সমাগম অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে রাজার সিদ্ধান্ত, লক্ষ্মী যখন ছাড়িয়া যাইবেন, তখন সঞ্চিত ধনও থাকিবে না, বিনষ্ট হইবে।

৬। "হিমালয়ে হরঃ শেতে
হরিঃ শেতে সদাম্বুধৌ।"

কোন ধার্ম্মিক ঋষি একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

"অসারে খলুসংসারে সারমেত চ্চতুষ্টয়ম্
কাশ্যাংবাসঃ সতাংসঙ্গঃ গঙ্গাম্ভঃ শম্ভুসেবনম্॥"

এই অসার সংসারে চারিটিমাত্র সার। কাশীবাস, সৎসঙ্গ, গঙ্গাজল ও শিবসেবা।

কোন রসিক কবি ঐ শ্লোকের পরিবর্ত্তে এই শ্লোক বলিয়াছিলেন।

অসারে খলু সংসারে সারঃ শ্বশুর মন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃশেতে হরিঃশেতে সদাম্বুধৌ॥

সংসার অসার হইলেও এতন্মধ্যে সার শ্বশুরবাড়ী। সারত্বের দৃষ্টান্ত—শিব হিমালয়ে ও বিষ্ণু সমুদ্রে সর্ব্বদা বাস করেন। সমুদ্র লক্ষ্মীর জন্মস্থান এবং হিমালয় পার্ব্বতীর জন্মস্থান।

৭। "হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা।"

কোন এক সিংহ কোন এক বনে রাজত্ব করিত। হঠাৎ একদিন একটা ছাগ সেই বনে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া এক ব্যাঘ্র তাহাকে কহিল, তুমি কোন সাহসে এই বনে পর্য্যটন করিতেছ? ব্যাঘ্রের কথা শুনিয়া ছাগের প্রথমতঃ অত্যন্ত ভয় হইল ও আপনার মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে হইল বটে; পরন্তু বিপদকালে ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন কর্ত্তব্য মনে করিয়া কহিল, হে ব্যাঘ্র! আমি এখানকার রাজার মাতুল। আমার নাম ডম্বলদাস। তৎশ্রবণে ব্যাঘ্র উগ্রতা ত্যাগ করিয়া বলিল, মহাশয়! আমি আপনাকে চিনিতাম না। তাই অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিবেন। ব্যাঘ্র এই বলিয়া রাজসভায় গিয়া সিংহকে কহিল, রাজন্! আপনার মাতুল ডম্বলদাস এই বনে আসিয়াছেন আমার সহিত আলাপ হইয়াছে। তৎ শ্রবণে সিংহ মাতুলকে আনয়ন করিবার জন্য সেই ব্যাঘ্রকেই মাতুল সকাশে প্রেরণ করিল। অাদিষ্ট ব্যাঘ্র পুনর্ব্বার ছাগ সকাশে গমন করিল এবং ছাগকে সিংহ সমীপে আনয়ন করিল। সিংহ মনে মনে অল্প একটু হাস্য করিল, পরে উদারচিত্তে ছাগকে মাতুলসম্বোধন করতঃ আপন পার্শ্বে উপবেশন করাইল এবং সকলকে বলিয়া দিল যে, ইনি আমার মাতুল, নাম ডম্বলদাস। অতঃপর ব্যাঘ্রাদি জন্তুনিবহ সকলেই ছাগকে মান্য করিতে লাগিল এবং ছাগও নিরাপদে পরমসুখে বাস করিতে লাগিল। তাই কোন কবি বলিয়াছিলেন—

হীনসেবা ন কর্ত্তব্যাঃ
কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।

অজঃ সিংহপ্রসাদেন
বনে চরতি নির্ভয়ম্॥

৮। পশ্চাৎ ঝন্‌ঝনায়তে।

কোন এক ব্রাহ্মণের একটি মাত্র পুত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে ঘটী বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। তাঁহার আশা—ছেলে মানুষ হইলে বার্দ্ধক্যে তাঁহার সুখ হইবে। পরন্তু ছেলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আশার মূল ছেদন করিতে লাগিল। সেই ব্রাহ্মণ একদা আশায় নৈরাশ ও দুঃখিত হইয়া প্রায় সর্ব্বদাই নিম্নশ্লোক উচ্চারণ করিতেন।

সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং
ফলে রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতোবৃক্ষঃ
পশ্চাৎ ঝনঝনায়তে॥

দেখিয়াছিলাম সোণার মত পুষ্প, সুতরাং ভাবিয়াছিলাম, ইহার ফলে রত্ন জন্মিবে। রত্নফলের আশায় বৃক্ষটির যৎপরোনাস্তি সেবা করিলাম কিন্তু তাহার অবশেষে কেবল ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিতে লাগিল।

(অতসী নামক ফুল দেখিতে অতি সুন্দর। পরন্তু তাহার ফল মধ্যে কেবল ১০।৫টা সর্ষপাকার বীজ থাকে, সেগুলা বায়ুর আন্দোলনে ঝন্ ঝন্ শব্দ করিতে থাকে)

৯। স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোপি সিংহঃ।

কোন এক সময়ে গরুড় শিবসকাশে গমন করিয়াছিলেন। গরুড়কে দেখিয়া শিবকণ্ঠস্থ সর্প ঘোরতর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গরুড় ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন—

জানামি সর্পো তব প্রভাবম্
কণ্ঠেস্থিতো গর্জ্জসি শঙ্করস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানম্
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোপি সিংহ।

ভো সর্প! তোমার প্রভাব ও ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি আজ শঙ্করের কণ্ঠে থাকিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছ। আমি বেশ্ জানি, বল অপেক্ষা যে স্থানের মহিমা অধিক। যে অত্যন্ত কাপুরুষ, সেও স্থানে থাকিলে সিংহের মত পরাক্রম দেখায়।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

বাণপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবার সময় কেহ কেহ পত্নীকে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, কেহ কেহ বা একাকীই পরিব্রজ্যা করিতেন। স্ত্রী যখন সহধর্ম্মিণী, তথন বাণপ্রস্থাশ্রমেই বা ধর্ম্ম কার্য্যে সহকারিণী না হইবেন কেন? বনে গেলেও তাঁহাদিগকে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে হয়, মোক্ষধর্ম্মশিক্ষার্থী শিষ্যদিগকে অন্নদান দ্বারা পতিপালন করিতে হয়, সুতরাং বাসাহারের নিয়ম সংবিধানার্থে কেহ কেহ সংযমশীলা ভার্য্যাকে ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তার জন্য সঙ্গে লইতেন। আমরা উপনিষদ্, পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থের অনেক স্থলে বনবাসী মুনির সহিত মুনিপত্নীর অবস্থান-বিবরণ প্রাপ্ত হই। উপনিষদে স্ত্রীর সহিত অথবা একাকী উভয় প্রকারেই বাণপ্রস্থাশ্রমে গমনের নিয়ম আছে :—

লোকাদ্ভার্য্যয়া সহিতোবনং
গচ্ছতি সংযতঃ।

(সন্ন্যাসোপনিষৎ।)

অনুবাদ। বাণপ্রস্থগমনেচ্ছু ব্যক্তি সংযত হইলেই লোক হইতে অর্থাৎ লোকালয় গ্রামাদি হইতে ভার্য্যার সহিত বন গমন করেন। অতএব ইহা জানা যায় যে, তাঁহারা ভার্য্যার সহিত বন গমন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন।

কাহারও কাহারও ইহার বিপরীত ফল হইত। বাণপ্রস্থাশ্রমে গিয়াও কাহারও কাহারও পুত্র জন্মিত। বোধ হয় এই সকল বিষয় অনুশীলন করিয়াই উপনিষদ শাস্ত্র সন্ন্যাসীর স্ত্রী গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন ;—

ইতি সন্নস্যাগ্নিমপুনরাবর্ত্তনং মণ্যুর্জায়া মাবহেদিতি।

(সন্ন্যাসোপনিষৎ।)

ভাষ্যানুযায়ী অনুবাদ। অগ্নি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবে না। যেহেতু সন্ন্যাসে স্ত্রী গ্রহণ নিষেধ আছে। তাহার কারণ এই যে সন্ন্যাসীরা স্ত্রী গ্রহণ করিলে মণ্যু নামক রুদ্রগণ তাহা হরণ করিয়া থাকে। কারণ সন্ন্যাসীদের ভার্য্যায় রুদ্রগণের অধিকার। অতএব জানা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস গ্রহণ ব্যাপার ত্যাগরূপ ধর্ম্ম, দীক্ষারূপ ধর্ম্ম নহে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যেমন আচার্য্য উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে বেদাধ্যয়নার্থে স্বভবনে লইয়া গিয়া রাখেন, গৃহস্থাশ্রম হইতে বাণপ্রস্থাশ্রমে যাইবার সময়ও তেমনি গুরু আসিয়া শিষ্যকে কতিপয় মন্ত্র পাঠ করান ও সঙ্গে লইয়া যান। গুরুর সহিত বনপ্রয়াণবিষয়ে পাঠ্য অনেক মন্ত্র আছে। সেই গুলি পাঠ করিলে বন গমন করিয়া কি বিশেষ ধর্ম্ম আশ্রয় করা হইবে, তাহা জানা যায়। নিম্নে আদর্শ স্বরূপ দুই একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ গুরু এই মন্ত্র পাঠ করেন ;

ত্যক্ত্বা কামান্ মন্ত্রেস্তে-
তিভয়ং কিমনুতিষ্ঠতি।

কিম্বা দুঃখং সমুদ্দিশ্য
ভোগাংস্ত্যজতি সুস্থিতান্॥
(সন্ন্যাসোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যে গৃহস্থ বিষয়-সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করে, সে কি ভয় প্রদর্শন করে অথবা কি দুঃখের উদ্দেশ্যে ত্যাগ নিশ্চয় করিয়া সুস্থিত ভোগ পরিত্যাগ করে? ভাবার্থ এই যে, গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়াও ত ধর্ম্ম কার্য্য হইতে পারে। বিশেষতঃ গৃহস্থাশ্রমে অনেকানেক ভোগ্য পদার্থ আছে। তবে লোকে কি ভয়ে ও কি দুঃখে এমন সুখের গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে। তখন শিষ্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করেন।

গর্ভবাস ভয়াদ্ভীতঃ
শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈবচ।
গুহাং প্রবিষ্ট মিচ্ছামি
পরং পদ মনাময়ম্॥
(সন্ন্যাসোপনিষৎ।)

অনুবাদ। পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হইলে গর্ভবাসাদি অনেক দুঃখ হয়, আমি সেই ভয়ে ভীত হইয়াছি। শীতোষ্ণ-সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব প্রবৃত্তিও অসুখের কারণ, অতএব ঐ দ্বন্দ্বভাব হইতে ও ভীত হইতেছি। যেখানে কোন উপদ্রব নাই, আমি এইরূপ পর্ব্বত গহ্বরাদি স্থানে প্রবেশ করিয়া (তপস্যাদ্বারা) অনাময় পরম পদ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। ভাবার্থ এই যে, সংসারে থাকিয়াও পুণ্য কর্ম্ম করা যায়, এবং সেই পুণ্যফলে স্বর্গাদি স্থানও লাভ হয়। কিন্তু সেই পুণ্যফল নষ্ট হইলে আবার সংসারে আসিতে হয়, সুতরাং গর্ভবাস মানবের অপরিহার্য্য। বাণপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হইলে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না। এই জন্য আমি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতেছি।

অতঃপর শিষ্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দণ্ড গ্রহণ করেন;—

সখাসি যা গোপায়, ওজসখাসি, ইন্দ্রস্য বজ্র ইতি।
(আরুণেয়োপনিষৎ।)

অনুবাদ। হে দণ্ড! তুমি আমার সখা। আমাকে গোসর্পাদি হইতে রক্ষা কর। তুমি শরীর শক্তিরূপ সখা। ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় শত্রুর ভয় বিনাশ কর। তুমি আমার পাপ সকল নষ্ট কর।

এই মন্ত্র পাঠান্তে দণ্ডগ্রহণ করিয়া যিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেন, তখন তাঁহার পুত্র গণ তাঁহার জন্য ক্রন্দন করিবে না, এবং অধিক দূর পর্য্যন্ত অনুগমনও করিবে না।

অনুব্রজন্নশ্রু মা পাতয়েৎ। যদশ্রুমাপাতয়েৎ প্রজাং বিদ্যাং ছিন্দ্যাৎ। প্রদক্ষিণমাবৃত্য এতচ্ছাণ্য বেক্ষ্যমানঃ প্রত্যায়ন্তি স স্বর্গো ভবতি স স্বর্গ্যোভবতি।
(কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ।)

অনুবাদ। পিতা যখন সন্ন্যাসী হইয়া প্রস্থান করিবে তখন পুত্র বহুদূর তাহার অনু-গমন করিবে না। পিতার জন্য অশ্রুপাত করিবে না। পিতার প্রব্রজ্যাকালে যদি পুত্র তাহার জন্য শোক করে, তবে তাহার সন্তান ও বিদ্যানষ্ট হয়। অতএব (জলসমীপ পর্য্যন্ত বা চৈত্য বৃক্ষ পর্য্যন্ত গমন করিয়া) প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পিতাকে নমস্কার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবে। পরে বৃক্ষ, আরাম ও তড়াগাদি অব-

লোকন করিয়া গমন করিবে। যাঁহার গমন কালে পুত্রাদিরা শোক পরিত্যাগ করে, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

পুত্র পরিজনাদি কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে তখন সন্ন্যাসী গৃহ পুত্রাদির জন্য কোনরূপ ব্যাকুল না হইয়া তপোবনে গমন করেন। অহো! তখন তিনি তপোবনের সৌন্দর্য্য ও তাপসদিগের অলৌকিক প্রভাবত্ব দেখিয়া মনে করেন যেন এক অভিনব রাজ্যে আসিয়া পূর্ব্বে অননুভূত অনির্ব্বচনীয় কোন সুখের পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছেন। তপোবন ক্ষেত্র দেখিয়া তাঁহার মনে হয় লোকমাতা ধরিত্রীদেবী যেন সংসারতপ্ত মানবদিগকে শান্ত করিবার জন্য এই তপোবন রূপ ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তপোবনে ফলভারাবনত মহীরূহ সকল দেখিয়া মনে হয় ইহারা বিনয় নম্র সাধুদিগের নিকট হইতেই বা অবনতভাব শিক্ষা করিতেছে। তরুশিখরস্থিত বিহঙ্গমগণের শ্রুতি মধুর কলরব শুনিয়া মনে হয় তত্রস্থ সাধুগণ যে সংকথাদ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করে ইহারা তাহারই অনুকরণ করিতেছে। সরোবরগুলি যেন তত্রস্থ সাধুদিগের নির্ম্মল মনের অনুকরণ করিয়াই নির্ম্মল সলিল ধারণ করিয়াছে। এখানে প্রকৃতিদেবী তাপসদিগের সেবার্থ কোন পদার্থেরই অপ্রতুল রাখেন নাই। তরুগণ ফলমূল বল্কলাদি প্রদান পূর্ব্বক সাধুদিগের গ্রাসাচ্ছাদন বিধান করে, স্বচ্ছ নির্ঝর, তাঁহাদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সুশীতল বারি প্রদান করে, শ্যামল শাদ্বল সকল তাহাদের বসিবার জন্য আসন প্রদান করে, নিকুঞ্জ সকল আশ্রয় প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণ করে মনুষ্য গার্হস্থ্যাশ্রমে উপবনে থাকিয়া যে কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইত, বাণপ্রস্থাশ্রমে আসিয়া তপোবনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া পূর্ব্বের সে মুগ্ধতা বোধকে (মনোহরত্ব বোধ অথচ মোহজনকত্ব বোধ) প্রকৃতই মুগ্ধতা বোধ মূর্খতা বোধ করে। না হইবে কেন? উপবন মোহের রাজ্য তপোবন জ্ঞানের রাজ্য। উপবনে প্রবৃত্তি বণিতা কৃত্রিম সাজে সাজিয়া লোকের মনোরঞ্জন করে, তপোবনে নিবৃত্তি বণিতা অকৃত্রিম সাজে থাকিয়া অন্তের সৌন্দর্য্যে লোকচিত্তকে আকর্ষণ করে। উপবনে লোভ মনিবের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তপোবনে ত্যাগ লোককে শাসন করে। উপবনে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হয়, তপোবনে পরমার্থ উপচিত হয়। উপবনে ইন্দ্রিয়ার্থের আদর হয়, তপোবনে অতিন্দ্রিয়ার্থের পরিচর্য্যা হয়। উপবনের কুসুমগন্ধ লোকদিগের মনঃপ্রাণ ব্যাকুল করিয়া মদন মদ বৰ্দ্ধন করে, আর তপোবনের কুসুম সৌরভ মনঃপ্রাণ সুস্থির করিয়া তত্ত্বজ্ঞানমদ বৃদ্ধি করে। উপবনের সমীরণ বিষয়রাগ হুতাশনকে প্রজ্জ্বলনের সহায়তা করে, আর তপোবণের সমীরণ তত্ত্বজ্ঞানালোকে উদ্দীপ্ত করে। উপবনে অনাত্মজ্ঞানবিষয় বন্ধনকে দৃঢ় করে, তপোবনে আত্মজ্ঞানবিষয় বন্ধনকে শিথিল করে। উপবনে শরীরের বলশুক্র পুষ্টি বর্দ্ধনোদ্দেশে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট হয় আর তপোবনে শরীরমাত্র ধারণার্থে খাদ্য গৃহীত হয়। এইজন্য শাস্ত্রে তপোবনে জীবন ধারণার্থে ভিক্ষাদিদ্বারা অল্প পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণের নিয়ম আছে।

সহযাত্রী।

রাঙ্গা সাদা মেঘ গুলি নীলাকাশ তলে
পাখা মেলি' ধীরে ধীরে উড়ে উড়ে যায়।
আমার হৃদয়খানি ডেকে ডেকে বলে,—
"কোথা যাও, সাথে করি' লও না আমায়।"
তারা গুলি ফুটে উঠে আঁধারের গায়ে,
তারে সাথে ফুটাইতে করে অনুরোধ,
বায়ু বহে সারা বিশ্বে সৌরভ বিলা'য়ে,
আপনা বিলা'তে সাথে চাহিছে অবোধ।
নদী ছুটে হুহু করি' সাগর সকাশে,
ঢেউ সাথে সেও চায় করি' সন্তরণ
পলে পলে ডুব দিয়ে আকুল উচ্ছ্বাসে,
লভিতে সমুদ্রতলে অনন্ত মরণ।
কেঁদে কেঁদে বলিছে সে—ওগো যাত্রিগণ!
তোমরা যে গাও গান তা' যদি না জানি
সবারি সুরের সাথে করিয়া মিলন
অর্থ হীন সুর টুকু দিতে পারি আনি'।
তোমরা যে আলো আন, আমি তা' না পারি,
ছায়া হ'য়ে ম্লান-মুখে র'ব পায় পায়,
তোমাদের সাথে সাথে উড়িবারে নারি,
দুর্ব্বল মেঘের মত গলে যা'ব হায়!
আমার বেদনা অশ্রু আমিই বহিব,
তোমাদের কাছে তাহা জানাব না আর,
ভাঙ্গিয়া টুটিয়া যাই, কভু না ফিরিব,
অজ্ঞাত পড়িয়া র'ব পিছনে সবার।
তোমরা সমুদ্র সম করে যাবে গান,
এ ঢেউ পাষাণ তটে যা'বে আছাড়িয়া,
মরা-শাখা সম বুক্ষে করে দিও স্থান,
বায়ু আসে, সব আগে পড়িব ভাঙ্গিয়া।
তবু মোরে ফেলে যা'বে, লইবে না সাথে?
একেলা চাহিয়া র'ব এ বিজন পুরে
সতৃষ্ণ নয়নে উর্দ্ধে, সুন্দর প্রভাতে
পদ্ম যথা চায় রবি, রহি' অত দূরে।
প্রকৃতির সুবিশাল মন্দির মহান্,
ক্ষুদ্র হিয়াটির হেথা হ'বে না কি স্থান?

গ্রন্থ-সমালোচনা।

চিত্রালী।—'অর্চনার' সহকারী সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র সম্পাদিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

এই পুস্তকে পনরটি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে তেরটিই 'অর্চনা' নামক মাসিক পত্রে, এবং আর দুইটি অন্য মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই গল্পসংগ্রহ মোটের উপর ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। কয়েকটি গল্প বেশ্ সুকল্পিত, সুবিন্যস্ত এবং সুলিখিত। তবে, সকল গল্পই যে গ্রহণীয় হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পারিতেছি না। 'খালি বাড়া' শীর্ষক ভূতের গল্প এই সংগ্রহে স্থান না পাইলেই ভাল হইত। গল্পটি যে পড়িতে মন্দ হইয়াছে এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু ভূতের গল্পের স্বতন্ত্র পুস্তক হইলেই ভাল হয়—মানুষের গল্পের মধ্যে ভূতের গল্প ভাল সাজে না। 'সুধা' গল্পটির মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। লেখক, দেব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি করিতে গিয়াছেন, করুণরসের অবতারণা, হইয়া পড়িয়াছে বীভৎসরসের অতিতাড়না। তিনি দিতে গিয়াছেন, একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র; কিন্তু দিয়াছেন, উন্মত্তের নিষ্ঠুরতাতিশয্যের চিত্র। মনে করিয়াছিলেন, প্রেমিক গড়িতেছি, গড়িয়া তুলিয়াছেন—একটি প্রকাণ্ড পাষণ্ড। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর শ্রীমান্ শশিশেখর, মাতার অনুরোধে, আবার বিবাহ করিয়াছেন। উত্তম; কিন্তু সেই মাতার মুখ চাহিয়া এই দ্বিতীয়া পত্নীকে একটু যত্ন আদরও করিতে পারিলেন না কেন? ভালবাসা ইচ্ছাধীন না হইতে পারে, কিন্তু যত্ন আদর করা ত সকলেরই ইচ্ছায়ত্ত। অথচ এই নিদারুণ প্রেমিক মৃত্যুকালে চিরউপেক্ষিতা দ্বিতীয়া পত্নীকে বলিতেছেন—"সুধা তুমি কাঁদিতেছ—কাঁদিও না, তোমার তপ্ত অশ্রুতে আমার হৃদয় উত্তপ্ত করিও না। * * * এ জীবনে তোমার হইতে পারিলাম না, যদি মৃত্যুর পর জীবন থাকে তবে আবার আমরা মিলিত হইব," ইত্যাদি। এরূপ ধৃষ্টতা কেবল বাঙ্গালা সাহিত্যেই সম্ভব! তার পর, 'ক্ষমা' শীর্ষক অপাঠ্য গল্পের স্থান এই সংগ্রহে হইল কেন? ইহার রুচি অতিমাত্র নিন্দার্হ ত বটেই; তদ্ব্যতীত, না আছে ঘটনাসন্নিবেশে নৈপুণ্য, না আছে রচনায় কুশলতা। কৃষ্ণদাস বাবুকে নির্ব্বাচনকুশল বলিয়াই বোধ হয়; তিনি এমন আবর্জ্জনা নির্ব্বাচন করিলেন কেন?

উপাসনা।

কর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচার।

(৫)

যোগ ও সগুণোপাসনাতত্ত্ব।

(দ্বিতীয় অংশ)

বেদবাদ (৩)।

৪৪। গীতার ২য় অধ্যায়ে আছে।

যামিমাং পুষ্পিতাংবাচং
প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
"বেদবাদ"রতাঃ পার্থ-
নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥৪২
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা-
জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং
ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং
তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ
সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা-
নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বোনিত্যসত্ত্বস্থো-
নির্যোগক্ষেমআত্মবান্ ॥৪৫

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশূন্য মূঢ়গণ এইসব পুষ্পিতবচন কহে। হে পার্থ! বেদবাদ অর্থাৎ বেদেতে অর্থবাদ নামক যত প্রশংসাপর ফল-শ্রুতিবাণি আছে তৎসমস্তকে সর্ব্বেসর্ব্বা মানিয়া তাহারা তাহতেই রত। তদন্য, অন্তের উপায় স্বরূপ তাহাদের মোক্ষ বা ঈশ্বরতত্ত্বে আস্তিক্য-বুদ্ধি নাই ॥৪২

কামেতে আকুলচিত্ত সেই মূঢ়গণ ভোগৈশ্বর্য্য গতির প্রতি স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্ম ফলসাধক বহুতর রুচিকর ক্রিয়াবিশেষ উপদেশ করিয়া থাকে ॥৪৩

তাহারা সুভোগ সম্পদে আসক্ত হওত সেই সব ফলশ্রুতিবাদে অপহৃতচিত্ত হইয়া মুখ্যকল্পে (সাংখ্যে) বা বিকল্পে (যোগে) ঈশ্বর-চরণে সমাধিসাধনে ব্যবসাবুদ্ধি লাভ করিতে পারে না ॥৪৪

কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ সমস্ত, ত্রিগুণসাধক

অর্থাৎ সকাম অধিকারিদিগের নিমিত্তেই কর্ম্ম-ফল সম্বন্ধপ্রতিপাদক হয়েন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃথ দুঃখাদি দ্বন্দসহ সদা নিত্য সত্বগুদ্ধি অবলম্বন কর। অর্জন, পালনরূপ যোগক্ষেম ত্যাগ কর এবং আত্মসাবধান হইয়া স্বধর্ম্মে থাকিয়া মুমুক্ষুত্ব উপার্জ্জন কর॥৪৫

এখানে যে "বেদবাদরতাঃ" বাক্যটি আছে শঙ্করাচার্য্য তাহার এই অর্থ লেখেন "বেদবাদ-রতাঃ বহ্বর্থবাদ ফলসাধন প্রকাশকেষু বেদ-বাক্যেষুরতা হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গ পশ্বাদি ফল-সাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ অস্তি ইতি এবং বাদিনঃ বদনশীলাঃ।" বহু অর্থবাদযুক্ত অর্থাৎ রুচিকর প্রশংসাপর ফলসাধনপ্রকাশক বেদবাক্যেতে রত যাহারা তাহারাই 'বেদবাদরত।' হে পার্থ! অতএব, স্বর্গ ও পশ্বাদিরূপ ফলসাধন ক্রিয়া হইতে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই তাহারা এইরূপ বলে। "অতএব (স্বামী) অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ।" ইহার অতি-রিক্ত অন্য (কিনা ঈশ্বরতত্ব) প্রাপ্তব্য নাই এইরূপ কহিয়া থাকে। অতঃপর এস্থানে যে, এই শ্লোকার্দ্ধ আছে "ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি সমাধৌ ন বিধীয়তে।" ইহার এই অর্থ শঙ্করা-চার্য্য করেন। "ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং * * তয়া ক্রিয়াবিশেষ বহুলয়া বাচা অপহৃত-চেতসাং আচ্ছাদিত বিবেক প্রজ্ঞানাং ব্যবসায়া-ত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা যাবুদ্ধি সমাধৌ সমা-ধীয়তেস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধি-রন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে নস্থিতির্ভবতি ইত্যর্থ।" ভোগৈশ্বর্য্যে যাহারা প্রসক্ত তাহারা বহুল ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য শ্রবণে অপহৃতচিত্ত হয়। তাহাদের দেহ ও আত্মাসম্বন্ধীয় বিবেক ও সাত্তিকীবুদ্ধি আচ্ছা-দিত হয়। তাহাদের ক্রিয়ারূপ যে বুদ্ধি তাহাতে তাহাদের সমুদয় কর্ত্তৃত্বের প্রয়োগ হয়। তাহাতে 'সাংখ্যে' আত্মজ্ঞানে-ব্রহ্ম-জ্ঞানে তাহা-দের সমাধিরূপ ব্যবসায়িত্মিকা কিনা নিশ্চয়া-ত্মিকা বুদ্ধির স্থিতি হয় না; 'যোগেত্ত' অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনারূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ডেও তাহাদের অন্তঃকরণ সমাধিস্থ হয়না। সর্ব্বশেষে "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা" এই বচনে শঙ্করাচার্য্য কহেন। "যে এবং বিবেক বুদ্ধিরহিতাঃ তেষাং কামত্মনাং যৎফলং তদাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারোবিষয়ঃ প্রকাশ-য়িব্যো যেষাং তে-বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ। ত্বং তু নিস্ত্রৈগুণ্যোভব নিষ্কামো ভব ইত্যর্থঃ।" যাহারা এই প্রকার বিবেকবুদ্ধি রহিত, সেই সকল কামাত্মাদিগের নিমিত্তেই বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধ প্রতিপাদক হয়েন। বেদ সকল তাহা-দের অধিকারে ত্রিগুণময় সংসারবিষয়ক সাধন প্রকাশ করেন। কিন্তু তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম হও। আনন্দগিরি কহেন "বেদশব্দেন অত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে।" এখানে বেদ শব্দে কর্ম্মকাণ্ড মাত্র গৃহীত হইয়াছে।

৪৫। এই সকল বচনের মধ্যে তিনটি বুঝিবার যোগ্য কথা আছে। যাঁহারা সরলভাবে হিন্দুধর্ম্মের সেবা করেন তাঁহারা কৃপা করিয়া তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। সেই তিনটি কথা এই। প্রথমতঃ "বেদবাদ"। দ্বিতীয়তঃ "নান্য-দস্তীতিবাদিনঃ" অর্থাৎ বেদবাদ হইতে অন্য (কিনা ঈশ্বরতত্ব) প্রাপ্তব্য নাই এইরূপ বাদ। তৃতীয়তঃ "ত্রৈগুণ্যাবিষয়াবেদা" বেদ সকল ত্রিগুণসাধক। কেহ কেহ প্রথম দুইটি বাক্য হইতে এইরূপ বুঝিতে ও বুঝাইতে চান যে,

"বেদবাদ" শব্দে অনীশ্বরবাদ অর্থাৎ বেদ যেন ঈশ্বরাস্তিত্ব মানেন না। অতএব "ঈশ্বরবাদ"টি যেন গীতারই প্রতিপাদ্য। অতঃপর "বেদ ত্রিগুণবিষয়ক"। সুতরাং স্থূলপ্রতিপাদক। কেহবা এই স্থানে মুণ্ডকোপনিষদের 'অপরা-ঋগ্বেদো' ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বনপূর্ব্বক চারি বেদকে নিকৃষ্ট বিদ্যা বলেন। অতএব তাঁহাদের বিবেচনায় অনীশ্বরবাদ, ত্রিগুণপ্রকাশক, এবং অপরা বিদ্যা বিধায় বেদ মারা গিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে গীতার ঈশ্বরবাদ এবং সহজজ্ঞানসিদ্ধ ব্রহ্মবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে।

৪৬। যদিও পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যদিগের ভাষ্য ও টীকা বিচারপূর্ব্বক পাঠ করিলে সর্ব্বসংশয় ভঞ্জন হইতে পারে তথাপি ঐ সকল অনুবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা উচিত বোধ হইতেছে। "বেদবাদ" শব্দে "বেদের অনীশ্বরবাদ" নহে। কিন্তু ফলশ্রুতিজ্ঞাপক "অর্থবাদ"। অর্থবাদ শব্দ কর্ম্মফলের প্রশংসা জ্ঞাপক। বেদবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠানার্থ মনোরঞ্জন বাক্য। ফলকামী যজমান তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রিয়াসাধন করেন। কিন্তু মূলকথা এই যে, ঈশ্বরই মন্ত্র,অর্থবাদ ও যজ্ঞীয় দেবতারূপে সর্ব্বদেবময়। অতএব বেদ নিরীশ্বর নহে। কামাত্মতাই নিরীশ্বর। সকামী যজমান সর্ব্ববেদময় সেই যজ্ঞেশ্বরকে দেখে না, কেবল ফলেরই অভিনন্দন করে। সুতরাং তাহার দৃষ্টিই অনীশ্বর। উক্ত বচনে সেই দৃষ্টির নিন্দা করিয়াছেন। নতুবা বেদনিন্দা করেন নাই। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া-বেদা" ইহার ভাবার্থও ঐ দৃষ্টির অন্তর্ভাব। সুতরাং গীতার ঈশ্বরবাদ বেদবহির্ভূত কোন নববিধান নহে।

৪৭। গীতা, উপযুক্ত অধিকারীকে ক্রমে ক্রিয়াযোগে, সমাধিযোগে ও আত্মজ্ঞানে প্রবোধিত করিতেছেন। এ তিনটি ধর্ম্মই বেদ, স্মৃতি, আগম ও পুরাণবিহিত। ইহার কোনটিই নিরীশ্বর নহে এবং সব কটিই বেদমূলক। ক্রিয়াযোগ আর কিছুই নহে, উহা কেবল নিষ্কামভাবে ব্রহ্মার্পণন্যায়ে বেদ, স্মৃতি, আগমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান। বিধিপালনার্থ বা ফলার্থ যে সমস্ত ক্রিয়া যে যে পদ্ধতি অনুসারে আচরিত হয় সেই সমস্ত ক্রিয়া, তৎ তৎ পদ্ধতি অবলম্বনেই ঈশ্বরার্থ আচরিত হইবে ইহাই ক্রিয়াযোগের উদ্দেশ্য। সুতরাং সকামী যজমানের কামাত্মতামাত্র নিন্দনীয় হইয়াছে। তৎসঙ্গে বেদনিন্দা উদ্দেশ্য নহে। কেননা ক্রিয়াযোগে সমস্ত বেদ, তাহার ক্রিয়াসমবায়ী মন্ত্র ও দেবতার নামোচ্চারণ যথাবৎ বিদ্যমান থাকে। অতএব যে বেদকে বিধি বা ফলাধিকারে কেহ কেহ নিরীশ্বর বলিয়া সন্দেহ করেন, তাহা ক্রিয়াযোগাধিকারে সেশ্বর হইয়া দাঁড়াইতেছে। অতঃপর সমাধিযোগ। ইহা ঈশ্বরধ্যানাদি অভ্যাস স্বরূপ ক্রিয়াযোগেরই অঙ্গ এবং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যরূপ অন্তিম পরিণাম। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই ক্রিয়াযোগ ও সমাধিযোগে চিত্তশুদ্ধি হইয়া চরমে আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে। প্রকৃতিতে বা দেহেতে আত্মভ্রমরূপ অজ্ঞান বিগত হইয়া ব্রহ্মেতে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার নাম আত্মজ্ঞান। ইহাও বেদবিহিত। এই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানতত্ত্ব, সর্ব্বপ্রকার রূপ নাম ও ক্রিয়ার অতীত। অতএব যে বেদকে বিধি বা ফলাধিকারে নিরীশ্বর বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, যাঁহাকে যোগাধিকারে সেশ্বর বলিয়া বুঝিয়াছিলে, তিনি এই আত্মজ্ঞানাধিকারে মোক্ষপর হইতেছেন। এ অধি-

কার বিধি ও কাম্যক্রিয়ার অতীত হইলেও, সর্ব্বপ্রকার রূপ নাম ও বিশেষণরহিত হইলেও; এবং এমত কি, ক্রিয়াযোগের ও সমাধিযোগের অতিক্রান্ত হইলেও, এ অধিকারে অবস্থিত জ্ঞানীর, লোক সংগ্রহার্থ নির্লিপ্তভাবে বেদাদিশাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া, শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অবলম্বনে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বশাস্ত্রেই তাহার উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ আছে।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো
যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্ত-
শ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহং॥

গীতা। ৩। ২৫।

"তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্মকার্য্যমেব। কর্ম্মণিসক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথা অজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি, আসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাৎ লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ।" স্বামী।

অতএব আত্মজ্ঞানীরও লোকসংগ্রহার্থ লোকের প্রতি কৃপা করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে ভারত, অজ্ঞলোকেরা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানহীন ক্রিয়ানিষ্ঠেরা যেমন কর্ম্মফলে আসক্ত অর্থাৎ অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ম্মাচরণ করে, বিদ্বান ব্যক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানীও লোকসংগ্রহ ইচ্ছা করিয়া আসক্তি রহিত হইয়া ঠিক সেইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন। শঙ্করাচার্য্য কহেন "লোকস্য উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণং লোকসংগ্রহঃ"। লোকের উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণের নাম লোকসংগ্রহ। লোককে সম্পূর্ণরূপে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত রাখা লোকসংগ্রহ। (লোকশিক্ষা।)

অতএব শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারেও উপরিউক্ত নিয়মে ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। একজন ফলকামী বিধিসেবী ক্রিয়ানিষ্ঠ পুরুষ, যে প্রকার মনোযোগ, উৎসাহ, সংযমাদি নিরত হইয়া ক্রিয়া করেন, ব্রহ্মজ্ঞানিরও ঠিক সেই প্রকারে দেবার্চ্চনাদি করা কর্ত্তব্য। কেবল তিনি নির্লিপ্তভাবে হিন্দুসমাজের ব্রহ্মমূলক সনাতনধর্ম্ম, বিধিভাগে ও যোগভাগে, সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিবেন। ইহাই উদ্দেশ্য। এই আত্মজ্ঞানের অধিকারেও, উপরিউক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষেত্রে ক্রিয়াসাধনের সমস্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক পদ্ধতি যথাবৎ বিদ্যমান রহিল। বেদের নিরীশ্বরত্ব ও ত্রৈগুণ্যত্বরূপ যে অপবাদ মনে হইয়াছিল, তাহা এখন কোথায় গেল? ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করেন এবং তিনি গুণাতীত অথবা নিত্যসত্ত্বস্থ। ঐ বৈদিকক্রিয়াই তাঁহার হাতে পড়িয়া সেশ্বর ও নিস্ত্রৈগুণ্য হইয়া গেল।

"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য
জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম
সমগ্রং প্রবিলীয়তে"॥

গীতা। ৪। ২৩।

যে ব্যক্তি নিষ্কাম, ক্রোধাদি হইতে মুক্ত, পরব্রহ্মে স্থিতচিত্ত, এবং পরমেশ্বরারাধনার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করে, অথবা লোকশিক্ষার্থে বা যজ্ঞরক্ষার্থে ক্রিয়া করে, তাহার কর্ম্ম সকল ফল সহিত বিনাশ পায়। অর্থাৎ কোন বন্ধন জন্মায় না। সমস্ত বৈদিকক্রিয়া যে মূলতঃ ব্রহ্মেতে উদ্দিষ্ট এ কথা বেদেই আছে। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রমাণ। যাঁহারা গীতার "বেদবাদরতাঃ পার্থ", "নান্যদস্তীতিবাদিনঃ" এবং "ত্রৈগুণ্য-

বিষয়াবেদা" ইত্যাদি বচন পড়িয়া মনে করেন যে, বেদ অনীশ্বর কর্ম্ম এবং ত্রিগুণ প্রতিপাদক শাস্ত্রমাত্র, এবং গীতাই যেন ঈশ্বর-বাদের আবিষ্কারক বা প্রবর্ত্তক,তাঁহাদের মনোযোগের সহিত গীতার ভাষ্য ও টীকা অথবা মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী পাঠ করা কর্ত্তব্য। উক্ত মহাত্মার গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় যথা—

"(ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদানি-
নিস্ত্রৈগুণ্যোভবার্জ্জুন।) স্বামী—

বেদ সকল কামনাবিশিষ্টকে সংসারে মুগ্ধ করেন, তুমি নিষ্কাম হইলে সেই সকল বেদের বিষয় হইবে না। তথাচ ভগবদগীতা—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং
প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ
নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥"

স্বামী—যে মূঢ় ব্যক্তিরা বিষলতার ন্যায় আপততরমণীয় যে সকল ফলশ্রুতিবাক্য তাহাকে পরমার্থসাধন কহে এবং চাতুর্ম্মাস্য যাগ করিলে অক্ষয় ফল হয় ইত্যাদি ফল প্রদর্শক বেদ-বাক্যে রত হয়,আর ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরতত্ব প্রাপ্য নয় ইহা কহে, তাহাদের তত্বজ্ঞান হয় না। এই মোক্ষধর্ম্মোপদেশে স্বর্গাদি ফলপ্রতিপাদক বেদকে পুষ্পিত বাক্য অর্থাৎ বিষলতার ন্যায় আপাততরমণীয় পশ্চাৎ দুঃখদায়ক ইহা কথনের দ্বারা ঐ কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদের অপ্রমাণ্য হয় এমত নহে, কিন্তু কেবল মুমুক্ষুর তাহাতে (অর্থাৎ তদুক্ত ফলাভিসন্ধিতে) প্রয়োজনাভাব ইহা জানাইয়াছেন"। পথ্যপ্রদানে। গ্রন্থাবলী ৩৫১পৃ। ১৭৯৫ শক।

৪৮। ক্রিয়াযোগ, সমাধিযোগ এবং আত্মজ্ঞান, এগুলি উত্তরোত্তর কঠিন তত্ব। এই সমস্তের মধ্য দিয়া যদি ঈশ্বরারাধনারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান, হয়, উত্তম। নচেৎ ক্রিয়াহীন মনুষ্য অপেক্ষা বিধিসেবী ফলকামী শ্রেষ্ঠ এ কথা ইত্যগ্রে বলিয়াছি। এইরূপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে ক্রিয়াহীন লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম্মকাণ্ডকে সমূলে বিনাশ না করে। যদিও গীতা প্রভৃতি মোক্ষ-শাস্ত্রে স্বর্গ, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি ফলোদ্দিষ্ট ক্রিয়ার নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু একটু ধীর হইয়া বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, স্বর্গকামনা, শুভজন্মকামনা এবং বিহিতকর্ম্মের শুভফলকামনা এ সমস্ত তো উচ্চকামনা। এ সমস্ত, যোগ ও আত্মজ্ঞানের তুলনায় অধম বলিয়া পরিগণিত হইলেও বরং শ্রেয়ঃ। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া নাই অথচ হৃদয়ে অপার বাসনা—সম্পত্তি, খ্যাতি, বিলাস, বহুব্যাপার লিপ্ততা ইত্যাদি কামনা কি উহা অপেক্ষা অত্যাধম নহে? এই কারণে বলিতে হইতেছে যে, বিধিবিহিত অথবা কাম্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান মহামঙ্গলকর, এবং তাহা যদি ঈশ্বরার্থে করিতে পার তো আরো উৎকৃষ্ট।

৪৯। কিন্তু নিত্য দেব সেবা ও বার্ষিক দেবোৎসব সমস্ত যে ঈশ্বরেরই অর্চ্চনা তাহা এখন আবালবৃদ্ধবনিতার ধারণা। তাঁহাদের এরূপ ধারণা নহে যে, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, মহাদেব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা, এবং ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তর্যামি; অথবা তাঁহারা ঐ সকল দেবতাকে জড় মূর্ত্তি ভাবিয়া তাঁহাদের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধির আরোপও করেন না; অথবা গীতা এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছে বলিয়া

এবং তদনুরোধে তাঁহারা যে ঐ সকল দেবার্চ্চনাকর্ম্ম ব্রহ্মার্পণন্যায়ে অনুষ্ঠান করেন এমনও নহে। কিন্তু তাঁহারা তদপেক্ষাও বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে, ঐ সকল দেবতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরী বলিয়া গ্রহণ করেন। এই দৃষ্টিই ক্রিয়াযোগের বিশুদ্ধ।ও উন্নতভাব।

(৪) অন্য দেবতা

৫০। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর গীতার নিম্নলিখিত বচন সমূহে যে অন্য দেবতার উল্লেখ আছে তাহার কিরূপ তাৎপর্য্য হইবে। সেজন্য কিঞ্চিৎ বলিতেছি।

(১) যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ
শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্যতস্যাচলাং শ্রদ্ধাং
তামেব বিদধাম্যহং ॥ ৭।২১ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্ত-
স্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্
ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ৭।২২ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং
তদ্ভবত্যল্পমেধসাং।
দেবান্ দেবযজোযান্তি
মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ৭।২৩॥

(২) যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা-
যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয়
যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥ ৯।২৩ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং
ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি
তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ৯। ২৪ ॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্
পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা
যান্তিমদ্যাজিনোঽপি মাং ॥ ২৫ ॥

(১) যে যে ভক্ত আমার মূর্ত্তিবিশেষ কোন দেবতাকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সকল ভক্তের শ্রদ্ধাকে আমি অন্তর্যামিরূপে দৃঢ় করিয়া দেই। তাহাতে তাদৃশ ভক্তেরা দৃঢ়তর শ্রদ্ধাদ্বারা সেই সকল দেবমূর্ত্তির আরাধনা করেন। তদ্দ্বারা অভিলষিত যে সমস্ত ফল লাভ করেন সে সমস্ত ফল আমা কর্ত্তৃকই বিহিত। কেননা সে সকল দেবতা মৎস্বরূপ মাত্র। কিন্তু সেই অল্পমেধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সেই ফল অন্তবিশিষ্ট। কেননা সেই দেবার্চ্চকেরা দেবলোকে গমন করেন। কিন্তু তাহা অন্তবিশিষ্ট। কিন্তু আমার ভক্তগণ আমাতে গমন করেন। অর্থাৎ জন্মবিনাশরহিত পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।৭।২১-২৩।*

* "It is true", says General Stuart, a Bengal officer in his Vindication of the Hindus, London 1808, "that in general, they (the Hindus) worship the deity through the medium of images ; and we satisfactorily learn from the Geeta, that it is not the mere image, but the invisible spirit that they thus worship." "Krishna thus says to Arjun" "Whatever image any supplicant is desirous of worshiping in faith, it is I alone, who inspire him with that steady faith ; with which being endowed, he endeavoureth to render that image propitious, and at length, he obtaineth the object of his wishes, as it is appointed by me : but the reward of such short-sighted men is finite ; those who

(৪) যদি বল যে বাস্তবিক তোমা ব্যতীত দেবতান্তরের অভাব হেতু ইন্দ্রাদির উপাসকেরাও বস্তুত তোমারি ভক্ত, তবে তাহারা কেন গমনাগমন লাভ করিবে? তজ্জন্য কহিতেছেন যে, শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা ইন্দ্রাদিরূপ অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা আমারি আরাধনা করে সত্য, কিন্তু তাহারা অবিধিপূর্ব্বক, অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ বিধির অন্যথায় (কেবল ফলার্থে) অর্চ্চনা করিয়া থাকে। এ কারণ পুনঃ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়॥ ৯। ২৩॥

(৫) একমাত্র আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। যাহারা সেই পরম তত্ত্ব জানে না তাহারাই পুনরায় সংসারে জন্মগ্রহণ করে। (৯।২৪) কিন্তু "যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামেবান্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তে তু নাবর্ত্তন্তে"। (ঐ স্বামী) যে ব্যক্তি সর্ব্বদেবতাতে একমাত্র আমাকে অন্তর্যামিস্বরূপ দৃষ্টিপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার পুনরাবৃত্তি হয় না। ৯। ২৪॥

(৬) দেবব্রতীগণ দেবলোকে গমন করেন। পিতৃব্রতীরা পিতৃলোকে যান। ভূত পূজকেরা ভূত সকলকে প্রাপ্ত হয়। মদ্যাজিরা আমাতে গমন করেন। ৯। ২৫॥ স্বামী কহেন দেব শব্দে ইন্দ্রাদি, শঙ্কর কহেন পিতৃ পদে অগ্নিষ্বাত্তাদি।

অর্থের সহিত এই ৬টি শ্লোক পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন কোন্ তাৎপর্য্যে "অন্যদেবতা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবান্ কহিয়াছেন "যে ভক্ত আমার মূর্ত্তিবিশেষ কোন দেবতাকে অর্চ্চনা করেন, আমি অন্তর্যামিরূপে তাঁহার শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করি"। অতএব সকল মূর্ত্তিউপলক্ষিত দেবতাই তিনি হইলেন কি না? পুনশ্চ "যাহারা ইন্দ্রাদিরূপ অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহারা আমারি পূজা করে" অতএব তিনিই ইন্দ্রাদি দেবতা হইলেন কিনা? কিন্তু ভাবের ব্যতিক্রম আছে। "তাহারা কামনা চায়, তাহারা অল্পমেধাবিশিষ্ট, তাহাদের ফল তজ্জন্য অন্তবিশিষ্ট তাহারা আমার পূজা করে বটে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ মোক্ষপ্রদবিধির অন্যথায় অর্চ্চনা করে এজন্য পুনঃ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়।" অতএব একদিকে কর্ম্মফল, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব, দেবাদিলোকভ্রমণ ও পুনঃ পুনঃ সংসারগতিভূত জন্মজরামরণস্রোত, আর অন্য দিকে মোক্ষ। এই পরস্পরবিরোধী ব্যতিক্রম। যাহারা সকামী, অল্পমেধাবিশিষ্ট তাহাদের ফলদাতা ভগবানই। কিন্তু তিনি, বৈদিক ধর্ম্মের যে নিয়ম তাহার ব্যত্যয় করেন না। কেননা, ফলাধিকারে তিনি মন্ত্রাধিপতি যজ্ঞীয় দেবতারূপেই অন্তবিশিষ্ট ফল দেন, আর সগুণ ও নির্গুণ মোক্ষাধিকারে গৌণ বা সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্বরূপ ফল দেন। ওটিতে তিনি দেবতারূপে লব্ধ, এটিতে তিনি পরমাত্মারূপে লব্ধ। ওটিতে দেবাদি লোকে যাতায়াত, এটিতে মোক্ষ। ওটি মোক্ষস্বরূপ আত্মদেবতা হইতে অন্য, এটি পরব্রহ্ম পরমাত্মা। এই কারণে ভগবান

worship the Devatas go unto them; and those who worship me alone, go unto me. The ignorant being unacquainted with my Supreme nature, which is superior to all things, and exempt from decay, believe me who am invisible, to exist in the visible form under which they see me,"

ও-অধিকারে আপনার রূপবিশেষ দেবগণকে "অন্যদেবতা" এবং এ-অধিকারে আপনাকে "আমাকে" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থানে "আমাকে" শব্দ "আত্মভাব"। এই ভাবটি পাকা ফল। এইরূপ উল্লেখ যদি না করিতেন তবে সর্ব্বপ্রকার কাঁচা পাকা ফল অর্থাৎ স্বর্গাদি আর মোক্ষ একত্রে ঘণ্ট হইয়া থাকিত। এস্থানে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, শ্রীমদ্‌ভগবতীগীতাতে চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৩ প্রভৃতি শ্লোকে এবং শিবগীতাতে দ্বাদশোঽধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে অবিকল ঐতাৎপর্য্যে "অন্যদেবতা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেখানে মোক্ষাধিকারে ভগবতী মহাশক্তি দেবী এবং মহাদেব গীতার শ্রীকৃষ্ণের স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। একই কথা।

৫১। এই ভারতবর্ষে নানা দেবতার অর্চ্চনা প্রচলিত। তাহাতে ভক্তসকল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। পূর্ব্বকালে শত শত বৈদিক শাখা ছিল। বর্ত্তমান সময়েও সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় সকল আছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা স্ব স্ব ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান কারেন এবং তাঁহাকে ফলদাতা জানিয়াও, তাঁহার নিকট মোক্ষমাত্র প্রার্থনা করেন। কিন্তু অন্যেরা স্ব স্ব ইষ্টদেবতার সন্নিধানে অন্যান্য ফল ভিক্ষা করিয়া থাকেন। তথাপি তাঁহারা জানেন যে, ঐ সকল দেবতা মোক্ষদাতাও বটেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও তাঁহারা পার্থিব ও স্বর্গীয় ফললাভার্থ অতিমাত্র আসক্তচিত্তবিধায়, মোক্ষ ত্যজিয়া, কেবল ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক তাঁহাদের পূজা করেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। কিন্তু ফলের নানাত্বহেতু, শাস্ত্রীয় ব্যবহারানুসারে, যে ফল যে দেবতার অধিকার, তন্নিমিত্ত সেই সেই দেবতার উদ্দেশেও যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন। মনে কর একজন কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত পরম বৈষ্ণব, অথবা একজন দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত শাক্ত, মুক্তির নিমিত্তে, বা সন্ধ্যাবন্দনা ও জপাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে, স্ব স্ব ইষ্টদেবতার ভক্ত আছেন। সাংসারিক আপদুদ্ধরণ বা ইষ্টফল লাভার্থ যতদূর সম্ভব তাঁহাদের চরণে তুলসী বা বিল্বপত্র নিবেদন করিলেন এবং অন্যপ্রকারেও তাঁহাদের পূজাও দিলেন; কিন্তু যদি গ্রহশান্তির প্রয়োজন হয়, যদি পুত্রকামনা উপস্থিত হয়, যদি চাতুর্ম্মাস্য, সাবিত্রী, চান্দ্রায়নাদি ব্রতাচরণ প্রয়োজন হয়, তবে কি বৈষ্ণব কি শাক্ত, উভয়কেই স্ব স্ব ইষ্টদেবতার অতিরিক্ত বেদবিহিত মন্ত্রদ্বারা সেই সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন নৈমিত্তিকাদি অন্য কতক্রিয়া আছে তাহা সর্ব্বসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয়। তাহাতে তাঁহারা কেবল নিজ নিজ ইষ্টদেবতাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। এই ব্যবহার কেবল শিষ্টাচার নহে, কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ। শাক্তের ভবনেও দোল, জন্মাষ্টমি প্রভৃতি ক্রিয়া হইতেছে; বৈষ্ণবের গৃহেও দুর্গোৎসব হইতেছে। ইহাতে মনে দ্বৈধ নাই। নিষ্কামাধিকারে, সকল দেবারাধনাই একমাত্র ভগবানে সমন্বিত সঙ্কলিত ও অর্পিত। কিন্তু মোক্ষ ত্যজিয়া সাংসারিক ফলের অভিনন্দন অবৈধ উপাসনা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই অবৈধ উপাসনার প্রবাহ মধ্যে, দেবতা বাচক, ভগবানের যত নাম ও মূর্ত্তি অবগত হইয়াছেন তৎসমস্তই "অন্যদেবতা" শব্দে উক্ত হইয়াছেন। কেননা, তাঁহারা অন্য ফল দেন। তাহাতে যজমানের গতাগতি হয়। কিন্তু

নিষ্কামাধিকারে একই ভাগবতী মতি। তাহার ন্যূনকল্প ঈশ্বরার্থ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। তাহাই ক্রমমুক্তিজনক যোগবুদ্ধি। আর উচ্চকল্প সাক্ষাৎ মোক্ষরূপ আত্মজ্ঞান। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান ও সাংখ্যজ্ঞান। এই উচ্চকল্পবিহিত ক্রিয়া, লোকশিক্ষার্থ। অথবা যদি সাধকের ইচ্ছা হয়, তবে যোগদৃষ্টিতেও সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

গীতিকাব্যে রবীন্দ্রনাথ।

(৪)

রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহার Mysticism সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। Mysticism বা ভাবের প্রচ্ছন্নতা, ইহা একটি গুণ কি দোষ সে সম্বন্ধে মনীষিগণের মধ্যে মত-ভেদ আছে। তবে দুর্ব্বোধ্যতা যে একটি দোষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র নাথের অনেক কবিতা এই প্রচ্ছন্নতা দ্বারা আক্রান্ত হইলেও তাহার সকল গুলিই দুর্ব্বোধ্যতা দোষে দুষ্ট নহে। অধিকাংশ কবি-তাই পাঠকের মনোযোগ ও ধৈর্য্যের অভাবে এবং কবির- চিন্তা প্রণালীর সহিত পাঠকের অপরিচয়ের জন্য দুর্ব্বোধ আখ্যা ও অপবাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। মনের সকল ভাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা এবং উপ-যুক্ত ভাষা এখনও মানব প্রাপ্ত হয় নাই। কত শত ভাববৈচিত্র্য মানব মনে বিচরণ করে, সাধারণ লোকের ক্ষমতাও নাই সে গুলি সম্যক্ প্রকাশ করে। কবি সেগুলি প্রকাশ করিতে প্রয়াস পায়, সম্পূর্ণ পারে না, আধ আধ ভাসা ভাসা প্রকাশ করে। ইহা তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, ইহা অক্ষমতার জন্য। কবি ত আর দেবতা নহে যে সমস্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিবে, তবে কবি প্রয়াস পায় এই তাহার অপরাধ। যে ব্যক্তি সাধারণের মনোরঞ্জনের অথবা সান্ত্বনা ও সহানুভূতি পাইবার জন্য পরকে প্রাণের কথা বলিতে চাহিবে সে কেন তাহা ইচ্ছা করিয়া তাহাদের দুর্ব্বোধ করিয়া প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বলিতে যাইবে? তাহার যদি প্রকাশ করিতে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা অস্ফুটতা দেখা যায় তাহা হইলে তাহাকে প্রকাশ করিতে অক্ষম অথবা মনোবেগে পূর্ণহৃদয় ও রুদ্ধকণ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে।

লেখকের ত সবই অপরাধ, পাঠকের কি কোনও অপরাধ নাই? লেখকেরত সবই

কর্ত্তব্য, পাঠকের কি কোনও কর্ত্তব্য নাই? লেখক পশারা ভরিয়া কত ফল ফুল লইয়া তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া, তুমি কি অগ্রসর হইয়া তাহাকে শুধু আবাহন করিয়া আনিবে না? তুমি যদি তাহা না কর—তাহা হইলে তাহার গৌরব বাড়ে বটে, কিন্তু তোমার গৌরব তোমাকে একেবারেই ত্যাগ করে। কবির কথায় যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তাহার নীরব ব্যাকুলতা ভাঙ্গিয়া দিবার সাগ্রহ প্রয়াস যদি না থাকে, প্রাণ যদি তাহাকে আবাহন করিয়া না আনে, এবং কল্পনা যদি হৃদয়রঙ্গমঞ্চে অভাবগুলি পূরণ করিয়া না লয়, তাহা হইলে যত বড় কাব্যই হউক না কেন, তাহা অর্থহীন বাতুলতা ভিন্ন কিছুই নহে। তাই "গানভঙ্গে" বরজলালের গান সভাস্থ লোকের ভাল লাগে নাই—কিন্তু প্রতাপ রায়ের স্থায় প্রাণ তাহার আদর করিতে ভুলে নাই। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

"একাকী গায়কের নহে ত গান—
মিলিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা—
আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ—
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বন সভা শিহরি কাঁপে—
তবে সে মর্ম্মর ফুটে॥

ভাব যখন 'কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল' হইয়া উঠে, শিরায় শিরায় আবেগ যখন উদ্দীপ্ত হইয়া মন প্রাণকে রোমাঞ্চপূর্ণ করে, তখন অনির্ব্বচনীয়তায় ও সর্ব্বেন্দ্রিয়গ্রাসী আবেশে সকল দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়। 'ভাব তখন রূপের মাঝারে অঙ্গ পায় না।'

ভাব তখন আপনার আত্মীয়গুলিকে সুখের সংসারে একত্র পাইয়া আনন্দোৎসব করিতে থাকে, অভ্যাগত ভাষার সহিত সম্পূর্ণ আলাপ করিবার অবসর যেন তাহার হইয়া উঠে না। কবি ভাবাবেশে তখন আত্মানন্দে বিমল—চিত্তযোগী। সে যোগীর দান যাহা পাওয়া যায় তাঁহাই যথেষ্ট বরণীয়। সেই ভাবগৌরবান্বিত হৃদয়ের সহিত ভাষার সামান্য একটি শৃঙ্খলে কোন সজাতীয় ও সমানধর্ম্মী হৃদয়ের সহিত মিলাইয়া দিলেই তাড়িত প্রবাহে তাহাঁ আনন্দ ও কল্যাণালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন ভাষা স্ফুট কি অস্ফুট, ভাবের সহিত ভাষার মিল হইতেছে কি না, হইতেছে বা তাহাতে শৃঙ্খলা পর্য্যাপ্তি বিকাশে পূর্ণাঙ্গ কি না দেখিবার অবসর থাকে না। তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে সৌন্দর্য্য উৎসের মত উচ্ছ্বলিত হইতে থাকে। তাহারই উপভোগে প্রাণ তৃপ্ত হইয়া যায়। মুগ্ধ উপভোগে প্রাণে এত তৃপ্তি আসে, যে প্রবুদ্ধ উপভোগের অবসর থাকে না। প্রাচীন অলঙ্কারিকেরা ঠিকই বলিয়াছেন—

"অবিদিতগুণাপি সৎকবিভনিতিঃ
কর্ণেসু বর্ষতি মধুধারাং।"

সহকার বৃক্ষের ফলটাই সর্ব্বস্ব নহে,—তাহার ছায়ায় বসিয়া, পাখীর গান শুনিয়া, তাহার মুকুলিত শোভা দেখিয়া, প্রাণে এতটা তৃপ্তি আসে, যেন তাহার ফল ভোগটাকে বেশীর ভাগ কিছু মনে হয়। ফলভোগের কথা মনে থাকেনা। ফলভোগ এখন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ফল ত আর বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকেনা, যিনি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন, যিনি উদ্যানপালক, তাহা-

কেও আমাদের মত ফলের অনুসন্ধান করিয়া পাতায় পাতায় বেড়াইতে হয়, আমাদের ত কথাই নাই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির কষ্টবোধ্যতার দুইটি কারণ। কতকগুলি কবিতা রূপকালঙ্কারের অন্তঃস্থলে একটি প্রচ্ছন্ন ভাব রক্ষা করিয়াছে, এবং কতকগুলি শুধু ভাবগত কবিতা সূক্ষ্ম চিন্তাতেই তাহার গঠন। প্রথমতঃ দেখা যাউক রূপকালঙ্কারাদির কি প্রয়োজন? সাধারণ কথাকে মনের মতন করিয়া বলিলে, এবং পরিচিতকে এমন করিয়া আনিতে হইবে যেন সে পরিচিত নহে, তবে তাহাকে সকলে আদর করে। নিত্য-দৃষ্ট সোজা সিদ্ধান্তকে বিশেষত্বদানে অভিনব করিয়া বা অপরের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া আনিলে তবে তাহাকে শ্রদ্ধা করে। সামান্য রামা শ্যামাও যদি উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া হস্ত-পদ পরিষ্কৃত করিয়া সভায় আসে, তাহা হইলে কত জন আসুন আসুন করিয়া আহ্বান করিতে থাকে। আর কাচের নলের মধ্যে দিয়া যে জল যায় তাহা শীঘ্রই বাহির হইয়া যায় এবং নলের মধ্যে কিছুই থাকে না। কিন্তু সচ্ছিদ্র মৃত্তিকার নলের মধ্য দিয়া তাহাকে প্রেরণ করিলে জল নির্গমণের একটু বিলম্ব হইবে বটে, কিন্তু কিছু জল সেই নলের অন্তর-গুলিতে থাকিয়া যাইবে। যাহা একটু তলা-ইয়া বুঝিতে হয় তাহাই সব চেয়ে ভাল বুঝা যায় এবং নিজস্ব হইয়া যায়; তাই অধিকতর মর্ম্ম-স্পর্শী এবং দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করাই রূপকের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিরাভরণ ভাষা ও নগ্ন ভাবটি সুবেশমণ্ডিত করা ইহার গৌণ উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা এই রূপকালঙ্কারে ভূষিত। প্রত্যেকটি যে এমন কিছু উদ্দেশ্য লইয়া জন্মিয়াছে তাহা নহে; তাহাদের প্রায় অনেকেই হেতুহীন প্রাণের কথা। তাহারা মুক্তি সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা নহে, তাহা চিত্র মাত্র; সত্য তাহাদেরও ভিত্তি। তবে, যে সত্য মস্তিষ্ক গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বাহির করে তাহা নহে; যে সত্য হৃদয় প্রতি-নিয়ত সুখ দুঃখ শোকস্নেহে প্রেমের মধ্যে অনু-ভব করে সেই সত্যকে আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। যে ব্যক্তি কবিতার সেই সহজ সত্যকে অবহেলা করিয়া নবতথ্যের আশায় বসিয়া থাকিবেন তাঁহাকে নিরাশ হইয়া দুর্ব্বোধ্য বা কষ্টবোধ্য আখ্যা দিতে হইবে সন্দেহ কি? কবিতার ক্ষীণ ক্ষুদ্র লতা পাণ্ডিত্যের মহাতরু বক্ষে উঠিতে পারিবে কেন?

প্রত্যেক কবিতা মহাসত্য প্রসব করে না বটে কিন্তু তাহারা এক একটি আনন্দের প্রস্রবণ। প্রচ্ছন্ন রহস্যটি সেই আনন্দকে রক্ষা করিতে থাকে; সে রহস্য ভেদ হইয়া গেলেই আনন্দদ্বার রুদ্ধ হইল। এক একটি কবিতা এক একটি কল্পলতার ন্যায় নানা মণিরত্ন ও নানা সম্পদ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমরা তলে বসিয়া নিত্য নব অর্থ ও ভাবের ধনরাশি লাভ করিয়া কল্পনাভাণ্ডার পূর্ণ করি। যত চাই তত পাই, ভাবি আরও আছে; রহস্যময়ীর রহস্য ভেদ করিতে পারি না, অবাক হইয়া চাহিয়া রই।

বিশ্বজগৎইত মহা রহস্যে মহা সমস্যায় আমার নয়নে ইন্দ্রজাল ফেলিয়া রহিয়াছে, তাহাতে বিশ্বের কি কিছু উপভোগ করিবার নাই? আমি বলি এই রহস্য আছে বলিয়াই

মানব বিশ্বে সুখে বাস করিতে পারিয়াছে। দক্ষিণ পবন হু হু করিয়া আসিয়া পুষ্পসৌরভ ছড়াইয়া হু হু করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। চন্দ্রতারকা জ্যোতিঃ ছড়াইয়া আকাশে ফুটিয়া উঠিল, আবার দেখিতে দেখিতে কোথায় মিলাইয়া গেল, কেজানে! আমরা অর্থহীন সমস্যায় রহিয়া গেলাম। কিন্তু তাহারা উপ-ভোগ্য হইতে বাকী রহিল না। ততক্ষণ Meteorology বা Astronomy বাহির করিতে ব্যস্ত থাকিলে সে উপভোগ কোথায় থাকিত? রামধনু দেখিয়া তাহাকে "বর্হেনৈব স্ফুরিত রুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ (মেঘদূত) বলিয়া যে আনন্দ, যে সুখ, তাহার Spectrum Analysis অথবা সূর্য্যরশ্মির Refraction ও Dispersion এর সংবাদ জানিয়া রাখিলে সে সুখ সে আনন্দ আর পাওয়া যায় না।

গোটা কবিতাটির হয়ত সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ হয় নাই, শুধু Dim Intimation হইয়াছে মাত্র। প্রাণ কিন্তু, এমন অবস্থা সময়ে সময়ে আসে যখন সেই রহস্যময়ী কবিতাটি হইতেই আপনার ভিতরের কথা বাহির করিতে চায়। লেখক ও পাঠক উভয়েই সেই রহস্যবিজড়িত ভাবের সহিত সম্যক পরিচিত নহেন, কিন্তু ভাব দুইটি পরস্পর পরস্পরকে সমানধর্ম্মী ও সজাতীয় দেখিয়া মিশিয়া পড়ে,—তাই প্রাণ আপনা হইতেই বলিতে চাহে—

ফুলের বার নাইক যার ফসল যার ফল্‌লো না,
চোখের জল ফেল্‌তে হাসি পায়।
দিনের আলো যার ফুরালো সাঁজের আলো জল্‌লো না।
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।

অথবা— (খেয়া)

"ভাঙা অতিথশালা।
ফাটাভিতে অশত্থবটে মেলেছে ডাল পালা।" ইত্যাদি (খেয়া)

অথচ কবিতাটির প্রবুদ্ধ উপভোগ কিছু হয় নাই—অথবা ঘাট কি, ফুল কি, অতিথশালাই বা কি, অশত্থবটই বা কি, তাহা কে জানে।

আর একটি কারণে রবীন্দ্রনাথের কতক-গুলি কবিতা সাধারণের কষ্টবোধ্য হইয়াছে; তাহা তাঁহার বিশ্বজনীন ভাবে রচনা ও নিরব-লম্ব ভাবের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ না রাখা। কবি, প্রাণের যে প্রসার এবং উদারতার সহিত, যে বিশ্বপ্রেম ও হৃদয়ের প্রশান্ততার সহিত যাহা রচনা করিয়াছেন, আমরা সঙ্কীর্ণ ও অনুদারহৃদয় পাঠকেরা তাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিব কিরূপে? সেজন্য দেশীয় উপাদান এবং সম্প্রদায়, জাতি ও সমাজ-বিশেষের ব্যবহার প্রথা রীতিকে অবলম্বন করিয়া ভাব প্রকাশিত না হইলে তৎতৎ জাতি ও সমাজের লোকের তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

মেঘদূত অবশ্য—

"মেঘমন্দ্রশ্লোক,
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক,
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার স্তরে,
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে'।

কিন্তু তাহা অলকা, যক্ষ, হিমগিরি, কৈলাস, অবন্তী, সিপ্রা, কনখল, সিদ্ধাঙ্গনা, কল্পবৃক্ষ এবং দেশের অন্যান্য উপাদানে জড়িত, ভূষিত ও গঠিত বলিয়াই দেশের লোকের প্রাণে এত আদর লাভ করিয়াছে, তাই এত সুন্দর বলিয়া গণ্য হইয়াছে। শুধু বিরহকাব

বিরহের দীর্ঘশ্বাস এবং অশ্রু হইলে কি অমর হইতে পারিত ?

যে কবিতার রঙ্গমঞ্চে সব অভিনেতাগুলি মনোময় ভাবময় এবং অবাস্তব, আমরা বাস্তব-জগতের ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব লোক,—সে কবিতার সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলি কিরূপে বুঝিবে ? আমাদের স্থূল মস্তিকে সেই সূক্ষ্ম বস্তুর ধ্যান করিতে পারি না বলিয়াই ভাবকে রূপের মাঝারে অঙ্গ দিয়া থাকি, তবে তাহা উপভোগ্য হয়। অধিক কি, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যানযোগে আনিতে পারি না বলিয়াই প্রথমতঃ সাকার চিত্র ও পুত্তলিকার পূজা করিয়া তাঁহার সাধনা করি। ভাবকে বাস্তব জগতের প্রকৃতির মাঝে অঙ্গ দিলে তবে অনেক বুঝিবার সুবিধা হয়। তাই রূপকে অনেক জিনিস বুঝা যায়। তখনও ভাব প্রকৃতির কাল্পনিক গৃহে বাস করিতে থাকিল, তখনও তাহা সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী নহে— কিন্তু যখন তাহা অঙ্গ ধরিয়া মানবের নিত্যনব কার্য্যকলাপের মধ্যে মানবের ব্যবহারে সংসারের পরমাত্মীয়দের মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন আরও কাছে আসে—তখন আর বুঝিতে বাকী থাকে না। তাই শুধু ভাবময় অবস্তুসংযুক্ত কবিতা অপেক্ষা রূপককে লোকে ভালবাসে। তাই Browningএর কবিতা অপেক্ষা Paradise Lost বুঝা সহজ; তাহা অপেক্ষাও Scottএর কাব্য আরও সোজা। তাই "দিকে দিগন্তে যত আনন্দ" ইত্যাদি অপেক্ষা "ক্ষ্যাপা ঘুরে ঘুরে ফিরে পরশপাথর।" এবং তাহা অপেক্ষাও "কেষ্টা বেটাই চোর" ইত্যাদি কবিতা আরও ভাল লাগে। প্রথমবিধ কবিতা ঘৃতের ন্যায়, দ্বিতীয়বিধ নবনীর ন্যায় এবং তৃতীয়বিধ দুগ্ধের ন্যায়। ঘৃত যখন দুগ্ধের সার—তখন ঘৃত যে দুগ্ধ অপেক্ষা মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং ঘৃত যে জীর্ণ করিতে পারে তাহার আর দুগ্ধের কি প্রয়োজন ? দুগ্ধের স্নেহাংশ ব্যতীত অপরাংশে কার্য্যকারিতা আছে বলিয়াই দুগ্ধের আদর, কিন্তু দুগ্ধের যেন প্রধান ব্রত ঘৃতে পরিণত হওয়া। রূপ, যেন কর্ম্মবীর; ভাব, জ্ঞানবীর। রূপ সংসারে অনেক কাজ করে, কিন্তু ভাবের মাঝারে মুক্ত হইতেই তাহার বিশেষ আগ্রহ। তাই Tennysonএর Idylls of the King বুঝিতে গেলে তাহার (Spiritual Significance) আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির না হইলে বুঝা সম্পূর্ণ হয় না।

তাই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠে ভাবকে আনন্দের মধ্যে রূপদান করিয়া অনেক উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইলেন—কিন্তু ভাবের মাঝারেই ছাড়া দিলেন। মহাপুরুষ যখন সত্যানন্দকে হস্তে ধরিয়া লইয়া গেলেন, তখন লেখক বলিতেছেন "জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে, ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে অথবা বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেলেন।" ভাবকে রূপে না আনিলে যেমন বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর হয় না,—তেমনি রূপকে ভাবে না আনিলে অন্তরিন্দ্রিয়গোচর হয় না।

আর একটি কথা বলিয়া এ বিষয়ের সমাপ্তি করিব, অনাবশ্যক দীর্ঘতার জন্য সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কবি যাহা বলিতে চাহেন তাহাই যদি আমার কবিতাপাঠের শ্রমের ফল হইত, তাহা হইলে কখনও যথেষ্ট মনে করিতাম না। কিন্তু তাহা আমার প্রাণে অনেক কথা মনে জাগাইয়া দেয়, আমার হৃদয়ের সুপ্ত ভাবগুলিকে অন্ধকার হৃদগহ্বর হইতে

আলোক দেখাইয়া বাহিরে আনে, আমার যাহা আছে, তাহাকেই পরশ মণির পরশ দিয়া সোণা করিয়া দেয়,গুপ্ত এবং সুপ্ত ভাবগুলিকে প্রবোধ দান করিয়া আমার সম্পৎ বাড়াইয়া দেয়। "যাহা আছে চির পুরাতন, তারে পাই যেন হারা ধন।" এবং কবিতার যাহা উদ্দেশ্য তাহা অনেক সিদ্ধ হইয়া যায়—সাহিত্যদর্পণকার যাহাকে প্রসাদ বলিয়াছেন—

"চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ।
সঃ প্রসাদ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু।"

সেই প্রসাদগুণে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়, তাহার আনন্দ কল্যাণকে আবাহন করে—জগতের নিত্যসুন্দর অনির্ব্বচনীয় পদার্থসমূহের সমতুল সৌন্দর্য্য হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন শ্রাবণ মাসে ধান কাটে কি আশ্বিন মাসে ধান কাটে, অথবা পাল দিয়া নৌকা চালাইলে দাঁড় চলে কি না—এ সকল দেখিবার বিদ্বেষী-সুলভ অবসরও থাকে না। বিজ্ঞানের Laboratoryতে কবিতাকে বিশ্লেষণ করিতে পাঠাইলে,অথবা যে Wrangler Paradise Lost-এর নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহা কি এ পুস্তকে কি তাহা প্রমাণিত হইতেছে? তাহার করকমলে পড়িলে কবিতাকে যে প্রতিপদভগ্না হইতে হইবে এবং চীৎকার করিয়া বিধাতাকে "শিরসি মা লিখ মা লিখ" করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

মূলকথা—সাহিত্যক্ষেত্রে যে যতটা নিজস্ব লইয়া নামিবে, সে ততটা উপভোগ করিবে। শস্যোৎপাদন বিষয়ে সংক্ষেত্রেরই কর্ত্তব্য বেশী। মুদ্রারাক্ষসে আছে—

"চীয়তে বালি শস্যাপি
সংক্ষেত্র পতিতা কৃষিঃ
ন শালেঃ স্তম্ব করিতা
বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে।"

শালি ধান্যের স্তম্বকরিতা বপ্তার গুণবিশেষ অপেক্ষা করে না, সৎক্ষেত্রেরই গুণ অপেক্ষা করিয়া থাকে। শুধু কূপের গভীরতার দোষ দিলে চলিবে কেন, আমার যে কূপরজ্জু নাই। দ্রাক্ষা উচ্চে থাকিলেই অম্লরসে পরিপূর্ণ, তাহাও নহে। দয়াময়ের দান আমরা দুঃখের মূল্য দিয়া গ্রহণ করি বলিয়াই আমাদের একটু সম্ভ্রম ও গৌরব এবং দাবি আছে। বিনা আয়াসে পাইলে বিধাতার গৌরব বাড়ে বটে, কিন্তু আমাদের গৌরব কিছুই থাকে না। আমাদের নিজস্ব কিছু খরচ করিয়া পরের যাহা আপনার করিতে হয়—তাহাতে আমাদের স্বত্ব সুদৃঢ় হয় এবং সে অধিকার বড় নিরাপদ এবং গৌরবজনক। পরের জিনিস সম্পূর্ণ নিজায়ত্তে আনিবার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার ভার লইয়াছিলাম, কিন্তু কোথায় রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যসাগর, আর কোথায় তাহার সৈকতভূমিতে দণ্ডায়মান আমি সামান্য দর্শক। উড়ুপের দ্বারা কি এই দুস্তর সাগর পার হওয়া যায়? এযে "The desire of a moth for the star."

রবীন্দ্রনাথের ছন্দের গঠন, সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্য, ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য, ঝঙ্কার, মিল, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অর্থান্তরন্যাস, উপমা ইত্যাদি সংস্কৃত জাতীয় অলঙ্কার এবং Abstract for concrete, Transferred epithet, Pathetic fallacy, Synecdoche ইত্যাদি ইংরেজী প্রকারের অলঙ্কারের

যথাস্থানে সন্নিবেশ ইত্যাদির কথা বলিবার স্থল প্রবন্ধে পাইলাম না। নির্দ্দোষ ও বিদ্বেষবিহীন ব্যঙ্গ কৌতুক, প্রেমের অকৃত্রিমতা, বর্ণনার স্বাভাবিকতা, আদর্শের উচ্চতা, বিনয় করুণ ভাব, মানব হৃদয়ের গুহ্যতম বৃত্তিগুলির বিকাশ, গার্হস্থ্যভাব, দেশীয় সরলতা ইত্যাদি সহস্র সৌন্দর্য্য যথাস্থানে সন্নিবেশিত আছে। তবে অনেক স্থলে আবার ইচ্ছাকৃত অবহেলাও (Happy negligence) লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু সেগুলি Byron এর কথায়—"Those are faults of negligence, and not of labour." কিন্তু শিল্পিবর র‍্যাফেলের অযত্ন ও বিরক্তিক্ষিপ্ত তুলিকা প্লেটের উপর সমুদ্রের তরঙ্গ অঙ্কিত করিয়া যেমন প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল—সেইরূপ এই সকল অবহেলাও অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। অনেক সময় আবার এইরূপ অবহেলাই কোন কোন কবিতাকে অসুন্দর করিয়াছে—তাই কোনও একটি কবিতা ধরিয়া তাহাকে নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করিয়া সৌন্দর্য্য বাহির করিতে গেলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়—Swinburne যাহা Byron সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—তাহা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও খাটে—"He, who rarely wrote anything either worthless or faultless, can only be judged and appreciated in the mass." সৌন্দর্য্য বিশ্লিষ্টভাবে চক্ষু নাসিকা কপোল বা ললাটে বাস করে না—তাহাদিগকে একত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট ভাবে দেখিলে তবে একখানি সুন্দর মুখ দেখা যায়।

আর কবির সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট রচনার দ্বারা যদি কবির মূল্য নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে মহাকবি কালিদাস বা শেক্সপীয়ারের ন্যায় কবিরও কোন মর্য্যাদা থাকে না,—কেননা তাঁহাদেরও সকল রচনাই অমৃতসম নহে, তাঁহাদেরও অকিঞ্চিৎকর অংশ কিছু না কিছু আছে, রবীন্দ্রনাথের ত কা কথা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন সমালোচক নামধারী ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় রচনাগুলির প্রতি অন্ধ হইয়া, দু'একটি সামান্য ত্রুটিযুক্ত রচনা গ্রহণ করিয়া, নানা ব্যঙ্গ কৌতুক করিয়া জনসাধারণের মনে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কুসংস্কার জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা করেন এবং তদ্দ্বারা সমাজের, দেশের ও সাহিত্যের হিতকারী বলিয়া পরিচয় দেন। পরের ত্রুটী বাহির করিবার নির্দ্দোষজনোচিত অধিকার নিজের কতকটা আছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না। বস্তুতঃ তাঁহারা হিত না করিয়া অনেক স্থলে অহিত করেন। প্রথমতঃ কবির এবং তাঁহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণের মনে কষ্ট দেন, (তাহা তাঁহারা তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন, সে পৃথক্ কথা)। দ্বিতীয়তঃ—সাধারণ লোকের মনে, (ঘৃণা ও বিদ্রূপস্বরে আলোচনা করিয়া) কুসংস্কার জন্মাইয়া দেন। লোকে তাঁহার রচনা অন্য কিছু না পড়িয়াই, তাঁহার সহিত কটূক্তিতে যোগদান করে। সাহিত্যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের রক্ষা এবং সমাদর বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইলে এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের বহিষ্করণ করিতে হইলে অন্যপ্রকারে, ধীরভাবেও সমালোচনা চলিতে পারে,তবে ব্যঙ্গ ইত্যাদি করিয়া মনঃপীড়া দেওয়ার কি প্রয়োজন? তবে কি সমালোচক মহাশয় মনে করেন,তাঁহার ভ্রূকুটী দেখিয়া কবি লেখনী ফেলিয়া দিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকিবেন?

সমালোচকের দায়িত্ব অনেক বেশী—তিনি অপক্ষপাত হইবেন, বিদ্বেষ, পঙ্কিলতা, হীনতা বর্জ্জিত হইবেন—তাঁহার পক্ষে চিন্তাশীলতা, চিত্তস্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও বিচক্ষণতা বিশেষ প্রয়োজন, এবং ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে উক্ত ভাবগুলি প্রকাশিত হওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার নিকট দেশের লোক ও লেখক স্বয়ং ধীরচিত্তে নিস্তব্ধ ও উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। তিনি যদি হাসি তামাসা রঙ্গভঙ্গ লইয়া মত্ত থাকেন তাহা হইলে লোকে তাহার মধ্যে বিচক্ষণতা,দূরদৃষ্টি ও মনীষিজনোচিত গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ পাইবে কিরূপে? লোকে শ্রদ্ধাই বা করিবে কেন? সমালোচকের আসনটির মর্য্যাদা যে অনেক বেশী—দেশের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষিত ব্যক্তির জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট।

মানুষ সাধারণতঃ বড় উপহাসপ্রিয়, উপহাসের অবসর বা সুবিধা পাইলে প্রিয়জন এমনকি গুরুজনকেও উপহাস করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না, বা কেহ কাহাকেও ব্যঙ্গ করিতেছে দেখিলে তাহাতে যোগ না দিয়া থাকিতে পারে না—অন্ততঃ সাগ্রহে তাহা শুনিতে ছাড়ে না। পক্ষান্তরে যাহাকে উপহাস করা হইতেছে সে প্রকৃততঃ উপহাস্য কি না তাহাও জানিবার অবসর রাখে না—সে সময় তাহাকে সপ্রতিভ করা দূরে থাকুক, হাসির হর্‌রার উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে, তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়—শেষে অনুসন্ধান করিয়া অপরাধের লঘুতা দেখিয়া প্রায় সকলকেই একটু লজ্জিত হইতে হয়। কিন্তু সাধারণতঃ উপহাসাদিকে সুপক্ব মুক্তত্বচ কদলীর ন্যায় উপভোগ্য দেখিয়া কঠিনত্বচের আবরণে নারিকেলের মধ্যে কি আছে—তাহা দেখিবার ধীরজনোচিত সহিষ্ণুতা কাহারও থাকে না। তাই বলি—ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ক্রূর হাসি যথার্থ সমালোচনা নহে, তাহা অহিতকর। তাই বলি—

"মানবের মন এমনি কোমল
এমনি পরের বশ,
নিঠুর বাণে সে প্রাণ ব্যথিতে
কিছুই নাহিক যশ।"

যাহা টিকিবার, তাহার বিরুদ্ধে সহস্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দংষ্ট্রা বাহির করিলেও তাহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া টিকিবে—যাহা লোপ পাইবার, তাহাকে সহস্র অন্ধবন্দনাও ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাহার জন্য ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন—ব্যক্তি বিশেষ বৃথা চীৎকার করে মাত্র। গোমায়ু কখন কেশরীকে ফিরাইতে পারে না,মেঘগর্জ্জন হইলে কেশরী প্রতিগর্জ্জন করে। মহাকবি মাঘ তাই বলিয়াছেন।

"অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং
গোমায়ুরুতানি ন কেশরী।"

কবির সম্বন্ধে আমরা আর একটি ভুল করিয়া থাকি—তাহা কবিকে তাহার জীবনচরিতে খুঁজিয়া। প্রকৃতির প্রাণের সহিত মানবপ্রাণের যোগ হইলে তবে তাহাকে কবিত্ব বলে—সেই মাহেন্দ্রক্ষণগুলি একত্র করিলে পূর্ণ কবিজীবন পাওয়া যায়। কবির জীবনে দুইটি স্বরূপ; একটি সাধারণ মানবরূপে—যে অবস্থায়,—

"ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে।"

সেই এক স্বরূপ—আর একটি স্বরূপ,—যাহাতে শুধু বিশ্বপ্রকৃতির গন্ধে দৃষ্টে মোহমন্ত্র

গানে অন্তর বাহিরের ব্যাকুলিত মিলন, প্রেম-গদ্গদ ভাবাবেশ আর যোগীর ন্যায় যোগে অরোহণ ইত্যাদি পাইয়া থাকি। প্রথমোক্ত স্বরূপটিকে জানিলে কবির কিছুই জানা যায় না। সন্ধিবিগ্রহ শাসনতন্ত্র পৌরযুদ্ধের হিসাব জানিয়া রাখা একরূপ ইতিহাস জানা,—ইতিহাসের অন্তরস্থ সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবনের উত্থান পতন ও পরিবর্ত্তনাদির কথা জানা অন্যরূপ ইতিহাস জানা; এবং তাহাই যথার্থ ইতিহাসপাঠ।

আর যাঁহাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ শুধু ললিত প্রেমগাথা রচনা করেন—শুধু বীণাযন্ত্রে ঝঙ্কার দেন, ভেরীর ভৈরবগর্জ্জন করিতে পারেন না—তাঁহারা বৈশাখ, বর্ষশেষ, প্রাচীন-ভারত, শিবাজী ইত্যাদি কবিতা পাঠ করিবেন। ভৈরবকে, রুদ্রকে, ভীষণকে সানন্দে বরণ করিতে কবি সঙ্কুচিত নহেন। তাহা 'মরণ' প্রসঙ্গে বলিয়াছি। নববর্ষ আবাহনে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারার্থ এই—

হে নববর্ষ! তুমি নিষ্ফল আনন্দবারতা বহন করিয়া, মোহন মাদকতা বর্ষণ করিয়া, আমাদের জন্য নিঃস্পন্দ নিশ্চিন্ততা লইয়া আসিও না, তাহাতে আমরা নিশ্চেষ্ট অবসাদে বিনাশ পাইব। তুমি এবার রুদ্রভাবে এস, বিভীষিকার মধ্যে বরাভয় আনিও, মহাকালীর ন্যায় ভৈরব প্রচণ্ডতার মধ্যে শোণিতপিচ্ছিল পথে তাণ্ডবনৃত্য করিতে করিতে খড়্গ খর্পর মুণ্ডমালার সঙ্গে বরাভয় আনিও। যাহাতে আমরা উদ্দীপ্ত রজোগুণমত্ত জীবন পাইয়া তাহার উপযুক্ত হইতে পারি। নিঃস্পন্দ নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা ধ্বংস লাভ করিয়া নবজীবনলাভ শ্রেয়স্কর। পদদলিত ঘৃণিত তমোগুণাক্রান্ত জড়জীবন ধারণ অপেক্ষা দুর্ব্বল আত্মশক্তির উত্তেজনায় বিদীর্ণ হইয়া বিনাশ পাওয়াও প্রশংসনীয়। কবি, রজোদীপ্ত জীবনের প্রবৃত্তির চরম পরিতোষ বৈরাগ্য ঝঞ্ঝায় সমগ্র মায়া, মোহ, তাপ, পরিতাপ, ভোগ বাসনার ধ্বংস সাধনের পর নিবৃত্তির সত্ত্ববিমল যোগীমূর্ত্তির আবির্ভাবে মুক্তি শান্তিময় জীবনের ভরসা রাখেন, তাই তমঃকে নিন্দা করেন এবং রজকে বরণ করেন।

রবীন্দ্রনাথের দোষ।—রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রধান দোষ দুর্ব্বোধ্যতা। এমন অনেক কবিতা আছে যাহার অর্থ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়, বুঝিতে গেলে অতি বড় ভক্তেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আমাদের দেশের পুরা-কবিগণের রচনার ন্যায় সরলতা ও প্রাঞ্জলতা সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ ভাবে, ভাষায়, ছন্দে, চিন্তাপ্রণালী ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ের প্রথাজনিত নিয়মাবলীর লৌহ-নিগড় ভগ্ন করিয়া সহসা দেশের সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর মত জাগিয়া উঠিয়াছেন—তাই দেশের লোক ভয়ে বিস্ময়ে অলক্ষণ অলক্ষণ অলক্ষণ বলিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজ ভাবোচ্ছ্বাসের উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য বড় দেখা যায় না—ভাব কবির বশীভূত নহে, কবিই যেন নিজভাবের বশীভূত। তাঁহারি কথায় তিনি—

"জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি;
আমি নিজ বেগ সামালিতে নারি
চলেছি দিক্‌স্ যামী।"

ভাবের স্রোতে কবি ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছেন—কূল কিনারা নাই। এই ভাবকে

বশীভূত করিতে না পারায় বোধ হয় কবি মহাকাব্য রচনায় হাত দেন নাই। অত্যধিক আধ্যাত্মিকতায় ভারতবর্ষ জড়তা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, ঐহিকতা ভিন্নও জগৎ চলে না; শুধু চিত্ত নহে, বস্তুও চাই। ভারতের এই সার্ব্ববিষয়িক অধঃপতনের দিনে কবিশক্তিতে শুধু চৈতন্য বা বুদ্ধের পদরজকণা নহে, শিবাজী প্রতাপের শোণিতকণা চাই; শুধু কেশব কৃষ্ণপ্রসন্ন ও রবীন্দ্রের ভাবসৌরভ নহে, বিবেকানন্দ অশ্বিনীকুমার ও অরবিন্দের কর্ম্ম-গৌরব প্রার্থনা করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেন আমাদিগকে ভাবরাজ্যের দিকে টানিতে থাকে, স্বপ্নবাসনাময় জগতে লইয়া গিয়া যেন কর্ম্মস্পৃহা নষ্ট করিয়া দেয়। নীরবে অন্তরে প্রবেশ করিয়া, নিঃশব্দে হৃদয়দ্বারগুলি খুলিয়া দিয়া হৃদয়কে মুক্ত ও প্রশান্ত করিতে থাকে বটে এবং ধীরে ধীরে হৃদয়ে মহান্ ভাব ও প্রেমরাজ্য গঠন করিয়া তুলিতে থাকে বটে, কিন্তু উদ্দীপনায় ও উন্মাদিনী শক্তিতে তৎ-ক্ষণাৎ শিরা উপশিরায় রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া উৎসাহে ও উদ্যমে কর্ম্মভূমির সিংহদ্বার পানে লইয়া যাইতে পারে না। ধ্যান ধারণায় ও রূপে ভাবাবেশ করায়, কিন্তু মহাসংকীর্ত্তনে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া জগাই মাধাইকে নাচাইতে শিখায় না। তপ জপ জ্ঞানযোগ ও সাত্বিকতায় শুধু ব্রাহ্মণশক্তির উদ্বোধন করে—শাসন, পালন, সাম, দান, ভেদ-দণ্ডগত রাজসিকতায় ক্ষত্রিয় শক্তির বিকাশ কচিৎ পাই। প্রেম-বিরহ নিরাশা দীর্ঘশ্বাস বিনয় কৃতাঞ্জলী প্রার্থনা এবং নিজাবস্থায় সন্তোষ লইয়া কবিতাগুলি যেন জগতের চরণে লুটিতে থাকে—উদ্দীপনা, উদ্যম, দৃঢ়তা, আত্মগৌরব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অধঃপতন হইতে উত্থানপ্রয়াসে হৃদয়ে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ লইয়া বিঘ্নবাধাকে চরণে দলিত করিবার তেজস্বী ক্ষমতা তাহাদের নাই। রঙ্গলালের—"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে,"—অথবা হেমচন্দ্রের "বাজরে সিঙ্গা বাজ এই রবে" ইত্যাদি কবিতার রোমাঞ্চকর, প্রাণোন্মাদক সুপ্তশক্তির উদ্বোধক মেঘমন্দ্র-ধ্বনি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কচিৎ পাই।

পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের অসি ঝন্ ঝন্—কুরুক্ষেত্র কাব্যের রক্তসিন্ধুকল্লোল কল কল নাদ রবীন্দ্রের কাব্যে পাওয়া যায় না। উৎসের উচ্ছল জলরাশির ন্যায় রবীন্দ্রের কবিতা ভাবের উচ্ছ্বাসে ছুটিতেছে—কিন্তু মেঘনাদ বধ বা বৃত্রসংহারের ন্যায় নদের মত গদ্গদনাদে তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অনাহত স্রোতে কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ গাথায় ত্যাগী ও বীরহৃদয় মহান্ চরিত্রের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমাদিগকে দেখাই-য়াছেন, কিন্তু পূর্ণ মহাপুরুষের সুখ দুঃখ উত্থান পতন পরীক্ষা দায়িত্বগুণাগুণসম্বলিত আদর্শ চরিত্রের অনির্ব্বাপ্য বর্ত্তিকার আলো-ককে আমাদের অন্ধকার জীবনের চিরসহচর করিয়া দেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি দোষ, তাঁহার আত্মশক্তিতে অচঞ্চল বিশ্বাস। কবি যখন যোগে আরূঢ় হন তখন তাঁহার ভাবাবেশ হইতে যে কবিতার উদ্ভব হয় তাহা অতি মনোজ্ঞ সন্দেহ নাই—কিন্তু কবির সকল অবস্থার কবিতাই সুন্দর হয় না। রবীন্দ্রনাথ, যখন যে ভাব তাঁহার মনে জাগিয়াছে, তাহাই ছন্দের বন্ধনে বাঁধিয়াছেন—দেশের রুচির ভরসা রাখেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ক্লান্ত ও

অবসন্ন আত্মপ্রকাশে দেশের লোক সর্ব্বত্র নিজের প্রাণের কথা খুঁজিয়া পায় না বলিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে না। নির্বিচারে নির্বিকারচিত্তে, যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই ছন্দে আকার দান করিয়াছেন—সেই জন্যও অনেক কবিতা এবং অনেক ছন্দ দেশের কর্ণে ভাল লাগেনা। এক জনের সকল আত্মকথাই কি কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিতে পারে? এতদ্ব্যতীত রবিবাবুর অনেক কবিতার প্রেম বিরহ পূর্ব্বরাগ অত্যধিক মৃদুতা, কমনীয়তা, ভোগস্পৃহা নৈরাশ্য ও কর্ম্মক্লান্তি যেন জাতীয়জীবনে অবসাদ ও কর্ম্মহীনতা আনিতে চাহে—অন্য ভাবের উদ্দীপনা ও সাধনাপরায়ণতার কবিতাও অনেক তাঁহার আছে বলিয়াই জাতীয় জীবনের কোন ক্ষতি হয় নাই। দেশের কবিতার সহিত জাতীয় জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেশের কবিতা জাতীয় জীবনকে আংশিক পরিবর্ত্তন দান করে, আবার কবিতাও জাতীয় জীবনের ভাষাময়ী প্রতিমা। আমার বিশ্বাস—ভট্ট-নারায়ণের বেণীসংহার নাটকের সহিত সেন রাজবংশের সিংহাসন প্রতিষ্ঠার এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের সহিত সেন রাজবংশের পতন ও লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।

তবেরবীন্দ্রনাথের ন্যায় এমন সার্ব্বভৌমী প্রতিভা লইয়া অতি অল্প কবিই জন্মিয়াছেন। একখণ্ড মেঘ যেমন তপনের অখণ্ড প্রখরোজ্জ্বল রশ্মিপুঞ্জকে বহুধা বিভক্ত করিয়া গগনকে চিত্রিত করে, অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসই সেইরূপ রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভাকে বহুধা বিভক্ত করিয়া সর্ব্বতোভিমুখী করিয়াছে। কলিকার স্ফুটনব্যগ্রতা বহু দল পরাগে কুসুমাকারে বিকসিত হইয়াছে—কন্দরের অভ্যন্তরের রুদ্ধ সলিলশক্তি যেন প্রস্রবণের শতধারা রূপে ঊর্দ্ধপানে ছুটিয়াছে। সাহিত্যে এমন কোন বিষয় নাই যাহা তিনি স্পর্শ করেন নাই এবং তাঁহার স্পৃষ্ট এমন কোনও বিষয় নাই যাহা তিনি ভূষিত করেন নাই। রবীন্দ্র বিশ্বজনীন কবি, ইনি দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের প্রতিনিধি কবি নহেন। সাহিত্যের জীবনস্রোতে ইহার জন্ম নহে, ইনি সাহিত্যের জীবনস্রোত পরিবর্ত্তিত করিতে আসিয়াছেন। হেমচন্দ্র ছিলেন—বঙ্গের জাতীয় জীবনের প্রতিনিধি কবি। হেমচন্দ্র বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য সংকীর্ত্তনে মূল গায়ক ও পরিচালক। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সাহিত্যসংকীর্ত্তনে একজন গায়ক মাত্র। রবীন্দ্রনাথের যুগ আসিতেছে। তাঁহারই যুগ-প্রভাত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তিনিই শুকতারা রূপে অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। এখনও দিক নির্ম্মল হয় নাই, এখনও আঁধার আছে। তাই বায়স পেচককুল চারিদিকে চীৎকার করিতেছে। আগত প্রভাতের আলোকে সব দূরে যাইবে—কোকিল,পাপীয়া, বুলবুল নব প্রভাতের আবাহন করিবে।

(সমাপ্ত)

জগতের আদি সভ্যজাতি কে?

—★—

জগতের আদি সভ্যজাতি কে বা কাহারা, ইহা লইয়াও আজি জগৎ বিবদমান। জেঠা বড় কি ভাইপো বড়? ঠাকুর দাদা বড় কি নাতি বড়? ব্রাহ্মণ বড় কি শূদ্র বড়? এখন কালমাহাত্ম্যে যখন এ বিষয়েরও প্রশ্ন উঠিতেছে ও তাহার আবার যখন মীমাংসাও হইতেছে, তখন নবসম্পৎপ্রমুগ্ধ পাশ্চাত্যগণের মনে "কোন্ জাতি জগতের আদি সভ্য"—এ পরিজ্ঞাত ও স্বীকৃত সত্যের সম্বন্ধেও নূতন প্রশ্ন উঠিবে না কেন? সে দিন কোন সভাতে এম্ এ উপাধিধারী একজন নবীন যুবক, একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জগৎকে বলিতেছিলেন যে—

"আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া ও কোন কোন প্রবন্ধেও পাঠ করিয়া আসিতেছি যে—জগতের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান ও ভারতবাসিগণই জগতের মধ্যে আদি সভ্যজাতি। কিন্তু ইহার মূলে কোন ভিত্তি বা সত্য বিনিহিত নাই। ভারতবর্ষও একটি প্রাচীনতম সভ্য জনপদ বটে, কিন্তু মিশর, এষিরীয়া, গ্রীশ, রোম ও চীন মহাদেশ, ভারত হইতে বহু প্রাচীনতম স্থান। এবং ভারত বহু বিষয়ে ঐ সকল জনপদের নিকট ঋণী। এমন কি, ভারতবাসীরা দেবর্চ্চনাকালে যে ঘণ্টা বাজাইয়া থাকেন, উহাও চীনদেশ হইতে সমাগত। জ্যোতিষ খগোল ভূগোলের ত কথাই নাই" !!!

আমরা উক্ত যুবকের এহেন বক্তৃতাশ্রবণে কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মিত বা বিচলিত হই নাই। কেননা যুবকেরা যখন জন্মিয়াই দেখিতেছে যে আমরা বিদেশীয়গণের প্রজা ও পদবিদলিত এবং আমরা সর্ব্ববিষয়েই শিক্ষা-দীক্ষা লাভের জন্য কেহ জাপান, কেহ জর্ম্মানী, কেহ ফ্রান্স, কেহ আমেরিকা ও কেহ কেহ ভূলোকস্বর্গ ইংলণ্ডে গমন করিতেছি, তাঁহাদের নিকট উপদিষ্ট হইতেছি, তাঁহাদের হাব ভাব, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি অনুকরণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছি, আত্মায় প্রসাদ পাইতেছি, তখন ডিম্ব হইতে সদ্যঃবিনিঃসৃত নবীনেরা কেন ঐ রূপ ভাবিতে সমভ্যস্ত হইবে না? পাশ্চাত্য দাঁড়াইলে দাঁড়াই, হাসিলে হাসি, কাঁদিলে কাঁদি, গলিলে দ্রব হইয়া গলিয়া উবিয়া যাই, তখন যুবকেরা এহেন পাশ্চাত্যগণের মহিমায় প্রমুগ্ধ কেন না হইবে? পাশ্চাত্যের রেল, পাশ্চাত্যের গাড়ী, পাশ্চাত্যের তাড়িতবার্ত্তাবহ, পাশ্চাত্যের বাষ্পীয় পোত ও যথা এবং সর্ব্বস্ব, সুতরাং নবীনেরা কেন ভাবিবে না যে ইহাদিগের নিকট নক্তন্দিব "দেহি পদপল্লবমুদারম্ মম শিরসি মণ্ডনং"বাদী ভিখারী ভারত কোথায় লাগে? ইহা গেল নবীনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তৎপর নবীন দেখিলেন যে, পাশ্চাত্য ঋষিরা বলিতেছেন যে, তাঁহাদের বাইবেলই জগতের আদি গ্রন্থ ও আদি মহাকাব্য। তাঁহাদের

পীরামিড আদি শিল্পকলা, তাঁহাদের গ্রীশ আদি জ্যোতিষী, তাঁহাদের রোম আদি ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং তাঁহাদের আরারাট পর্ব্বতই জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শিখরী, তাঁহাদের জর্দ্দন নদীই পতিতপাবনী আদি ভাগীরথী, তখন এই আপ্তবাক্যে—অনাস্থা প্রদর্শন করিতে জগতে কে পারে ? মহর্ষি কপিল, অনুমান ও উপমিতিকে ত প্রমাণ মধ্যেই গণ্য করেন নাই, সুতরাং নবীনেরা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবেন যে যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ও যাহা আপ্তজননিগদিত তাহা প্রমাদসঙ্কুল ? কেবল ইহাও নহে ; যখন আমাদিগের দেশের কোন ব্যক্তিই বেদবেদান্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন না, প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র মন্বাদি অবহেলিত হইয়া রঘুনন্দনের ঝুটাকে জহর ভাবিয়া তাহারই পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছি, শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, উহাতে কোন ঐতিহ্যরূপ মহারত্ন নিহিত আছে কি না তাহা না দেখিয়া "সংস্কৃত পড়িলে লোক মূর্খ ও বেকুব হয়, ইহা যত্র তত্র বক্তৃতায় বলিতেছি, অপিচ যখন কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পবিত্র বেদী হইতে ধ্যানস্তিমিতনেত্র আচার্য্যগণ পর্য্যন্ত জলদগম্ভীরস্বরে বলিতে থাকেন—

"ঈশা ইহা বলিলেন,
মূষা ইহা বলিলেন,
মহম্মদ ইহা বলিলেন,
ইমারসন ইহা বলিলেন,"

তখন আমাদের বালক-বালিকা, যুবক যুবতী ও বস্ত্রসর্ব্বস্ব গৃহী গৃহিণীরা কেন সমস্বরে বলিবেন না ও ভাবিবেন না যে আমরাই বস্তুতই জগতে চিরভিখারী, আমরাই জগতে অসভ্য বর্ব্বর ও অগণ্য নগণ্য অবরজ জাতি। আবার কেবল ইহাও নহে, যখন সে দিন দুই জন প্রাচ্যপ্রতীচ্যভাষায় প্রকৃত কৃতশ্রম প্রখ্যাতনামা যুবক, বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষার পত্রিকায় লিখিলেন যে, আমরা সেমেতিকগণের নিকট হইতে অক্ষর ও লিখনপ্রণালী ধার করিয়া লইয়াছি, আমরা ককেশশ পর্ব্বতের প্রত্যন্ত ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তখন চশমা ও বচনসর্ব্বস্ব নবীন যুবকেরা কেন বলিবেন না ও ভাবিবেন না যে আমরা যথার্থই জগতে এক অভিনব জাতি ও আমরা সভ্য জগতের নিকট নিত্য ভিখারী !!

জগতে কোন্ ব্যক্তি কাহারও নিকট কোন না কোন বিষয়ে ভিখারী বা অধমর্ণ নহে ? আমাদের "মা" এবং "অম্বা" শব্দ আমরা ছাগ, মেষ ও গোবৎস হইতে ঋণ করিয়া লইয়াছি। আমাদের স, ঋ, গ, ম, প, ধ ও নি, সপ্ত স্বর বা ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীও পশু পক্ষী হইতে সমাগত। এ কালের পাশ্চাত্য হইতেও যে আমরা বহু বিষয় ধার করিয়া লইয়াছি ও লইতেছি, ইহাও জীবন্ত সত্য। কিন্তু তথাপি ইহা প্রকৃত সত্য কথা যে, জগতের আদিমযুগে সভ্যতার প্রথম স্ফুরণের বেলায় আমরা চীন জাপান বা পাশ্চাত্য কোন জাতির নিকট কোন বিষয়ে অধমর্ণ হই নাই। বয়সেও আমরা এ সকল জাতি হইতে বর্ষীয়ান্ ও জ্যেষ্ঠতাতপ্রতিম। এবং একদিন আমরাই উহাদের শিক্ষাবিধাতা ছিলাম। উক্ত বক্তা কি কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা আপনার উক্তির কোন সমর্থন করিয়াছিলেন ? না; কখনই নহে। তিনি পাশ্চাত্যের গ্রন্থে যাহা পাঠ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার নিকট "বেদ-

বাদ" বা "আপ্তবাক্য", সুতরাং সিদ্ধ সত্যের আবার সত্যতাস্থাপনের জন্য কি বলিবেন অথবা কি বলিতে হইবে?

কি কি উপায়ে কোন জনপদের প্রাচীনত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে? যে প্রকার বয়সদ্বারা মানুষের প্রাচীনত্ব নির্ণীত হয়, তদ্রূপ দেশ মহাদেশের প্রাচীনত্বও বয়সদ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে। কোন অভিনব জাতি বা কোন অভিনব দেশ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, বাণিজ্য ও শৌর্য্যবীর্য্যাদি দ্বারা প্রাচীন অপ্রাচীন বহু জনপদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট লোকে নানা বিষয়ে উপকৃত বা শিক্ষাপ্রাপ্তও না হইয়া থাকেন, এরূপ নহে; কিন্তু তাহাতে সেই সকল দেশকে প্রাচীন দেশ ও তদ্দেশবাসিগণকে প্রাচীনতম সভ্যজাতি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না। ইউরোপ এইরূপ একটি অভিনব মহাদেশ এবং ইহার অধিবাসিগণও এইরূপ একটি অভিনব অভ্যুত্থিত সভ্যজাতি। ইঁহারা কোন প্রকারে জগতের আদি সভ্যজাতি বলিয়া গণনীয় হইতে পারেন না।

কেন? ইউরোপীয়গণই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ইউরোপের আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা মধ্য এশিয়া বা এশিয়ামাইনর প্রভৃতি কোন স্থান হইতে ইউরোপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের ভূতপূর্ব্ব নিবাসভূমিসমূহ যে নবাধ্যুষিত ইউরোপ হইতে প্রাচীনতর ভূমি, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। তবে সে কোন্ দেশ? গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মাণ ও শাকসন প্রভৃতি জাতি যে মধ্য এশিয়ার কোন স্থান হইতে ইউরোপে গমন করিয়াছেন—ইহা পাশ্চাত্যগণ কেবল একমাত্র অনুমানবলেই বলিয়া থাকেন বটে, কেননা এ বিষয়ে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই ও করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। অনুমানই এ বিষয়ে তাঁহাদের একমাত্র নিয়ামক।

"I think so"—"He thought so"
—"Perhaps it may be so"

পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের প্রমাণ প্রায় ইহাই। কিন্তু আমরা "যবনের পদার্থনির্ণয়" ও "ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" এবং "সংস্কৃত ভাষাই সমুদায় আর্য্য ভাষার আদি জননী," এই সকল প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে সমগ্র ইউরোপীয়গণের ভূতপূর্ব্ব আসন্ন আবাসভূমি, আমাদের এই ভারতবর্ষ, পরন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মধ্য এশিয়া নহে। আমরা দেবগণ মধ্য এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী মানবের আদি জন্মভূমি আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া আর্য্যনামে পরিচিত হইবার বহুকাল পরে আমাদের নেদিষ্ঠ দায়াদ অসুরগণ এই Aryanam Vaejo (আর্য্যাণাং বর্ত্তঃ) হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্যদেশের উত্তরভাগে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তজ্জন্য আর্য্যগণের আবাস স্থান সেই উত্তর পারস্য, "আর্য্যায়ণ" নামে পরিচিত হইয়া ভাষার বিকারে প্রথমে "আইয়াণ" ও পরে "ঈরাণ" বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করে। এবং উক্ত অসুরগণের একভাগ সদ্যঃপ্রসূত তুরুষ্কে যাইয়া বসবাস করিলে তাঁহাদিগের অধ্যুষিত প্রদেশ আসুরীয় বা Assyria (বর্ত্তমান কুর্দ্দীস্থান) ও বেদোদিত পণিনামক অসুরগণের নিবাসস্থান Phoenisia নামে প্রথিত হয়। এদিকে যবনগণের আদি বীজী মহারাজ তুর্ব্বসু

ভারত হইতে ব্রহ্মদেশে (পূর্ব্ব যবনদেশ বা পূর্ব্ব ইউনানী প্রদেশ) ও তৎসন্তুতি যবনগণ ব্রহ্মদেশ হইতে পারস্ত দেশের দক্ষিণভাগে আসিয়া কিয়ৎকাল বসবাসের পর মহারাজ সগরকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া উক্ত অভিনব জনপদ তুরুস্কে আসিয়া সর্ব্বাদৌ যে পল্লী সংস্থাপন করেন, তাহাই পল্লীস্থান বা পেলেষ্টাইন নামের বিষয়ীভূত। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এই যবনগণ এখানে আসিয়াও সেই হিন্দুই ছিলেন, কল্যাণ রাও ও গোবিন্দ রাও নামে দুই কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহাদের উপাস্য দেবতা ছিল। অন্যান্য হিন্দুদেবদেবীও তাঁহাদিগকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইত। এবং তাঁহারা তখনও ব্রাহ্মণ্যলাভের মহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে ছিলেন। তাই ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া গিয়াছেন—

হৈহয়ৈস্তালজঙ্ঘৈশ্চ
তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপোষিতমিহণত্রৈব
ব্রাহ্মণত্বমভীপ্সুভিঃ॥ ৫৫—১৬অ
ব্রাহ্মপর্ব্ব।

অর্থাৎ চন্দ্রবংশপ্রভব হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও তুরুস্কবাসী যবনগণ এবং সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় শকগণ (Scythian) ব্রাহ্মণ্য লাভের ইচ্ছাতে কঠোর উপবাসব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এবং এই যবনগণই কালে তুরুস্কে ভাষার বিকারে জু জাতিতে পরিণত হয়েন। উক্ত জু শব্দ, সংস্কৃত যবনের অপভ্রংশ 'জোন' শব্দ হইতে সমাগত। মেদিনীও এই জুগণকে যবন বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন—

"জুরাকাশে সরস্বত্যাং
পিশাচে যবনেঽপি চ"।

এই জু জাতিই সর্ব্বত্র হিব্রুজাতি নামে পরিচিত। ইঁহারাই আপনাদিগের পৈতৃক ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি ও পুরাণের সত্য ও ভ্রান্তি এবং আংশিক ঐতিহ্য তত্ত্ব লইয়া পুরাতন বাইবেল গ্রন্থের দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এই জু বা যবন জাতিরই এক শাখা আরব, এক শাখা মিশর ও অন্য এক শাখা গ্রীশদেশে প্রবেশ করিয়া আরবীয়, মৈশর ও গ্রীক্ সভ্যতার ভিত্তি পত্তন করেন। আরব, তুরস্ক, মিশর ও গ্রীশদেশের লোকেরা যে সর্ব্বাদৌ আমাদের নর-দেবদেবী ও প্রতিমার পূজা করিতেন, তাহা বাইবেলে, কোরাণে ও গ্রীক্-গণের ইতিহাসে বর্ত্তমান। অতএব যে জু গ্রীক্, মৈশর ও আরবগণ ভূতপূর্ব্ব হিন্দুসন্তান, তাঁহাদের নবাধ্যুষিত দেশ গ্রীশ, মিশর, আরব ও তুরুস্ক প্রাচীনতম জনপদ, না তাঁহাদের বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ বাপদাদার মুলুক ভারতবর্ষ প্রাচীনতম সভ্য জনপদ, ও তাঁহারা প্রাচীনতম সভ্যজাতি, না ভারতবাসীরা প্রাচীনতম সভ্যজাতি, তাহা প্রবীণেরা বিচার করিয়া বলুন। মিশরদেশবাসীরা যে মনুর সন্তান, তাহা কি তাঁহারা ইতিহাসে বলেন নাই ? মিঃ পোকক সাহেবও কি তাঁহার India in Greece নামক গ্রন্থে মৈশরগণকে সগরসন্তাড়িত ভারতসন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই ?

গ্রীশদেশ ইউরোপের মধ্যে আদি সভ্য জনপদ এবং গ্রীকজাতি আদি সভ্য। রোম উহার পরবর্ত্তী। এই গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতাদ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র ইউরোপ আজি জগতে একটা জীবন্ত জাতি বলিয়া পরিচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য ঋষিগণই বলিতেছেন যে,তাঁহাদিগের বর্ষীয়সী গ্রীকজাতির বয়ঃক্রম গণা সাতাইশ শত বৎসর, আর রোমের বয়ঃক্রম কিঞ্চি-

দুই হাজার বৎসর মাত্র। গ্রীক্ ও রোম কি ইউরোপের ভূঁইফোড় জাতি? না, কথনই নহে। গ্রীক্, লাটিন, জর্ম্মাণ, শাকসন, কেল্ট ও শ্লাভনিক ভিন্ন (ইঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে ইউরোপে গত, তাই ইঁহারা আমাদের দেববংশীয় হইলেও আর্য্যনামের বহির্ভূত বস্তু) অন্যান্য ইউরোপীয়গণ ভারত হইতে ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন, আমরা অন্য প্রবন্ধে তাহা প্রমাণ করিয়াছি। বাইবেলও বলিয়াছেন যে জনস্রোতঃ ও জ্ঞানস্রোতঃ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গিয়াছিল, ভারতের যবন বংশদ্বারা গ্রীক্‌জাতি গঠিত, আর ভারতের শাসনাধীন রোমকপত্তনবাসী কম্বোজগণদ্বারা লাটিন জাতি বিরচিত। কম্বোজগণই কেতুমালবর্ষের রোমকপত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় রোমকপত্তনের প্রতিষ্ঠা করেন। তুরুস্কের তৃতীয় রোমকপত্তন বা রুম সহর উক্ত টাইবর রোমকপত্তনেরই আসন্ন অনুকৃতি। এবং ভারতের শর্ম্মা বা জরমাণ, শকস্থনু ও কিরাত প্রভৃতি জাতিই ইউরোপের জর্ম্মাণ, শর্ম্মন্ (পোলাণ্ড), শাকসন্ ও কেল্ট প্রভৃতি জাতির আদি নিদান এবং বিলাতের ড্রুইডগণও আমাদের ভারতীয় পুরোহিত বংশের সংস্করণবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং তাঁহাদের উপাস্য রড্ দেবতা যে আমাদের নরদেবতা রুদ্রই বটেন, তাহাও তোমরা অস্বীকার করিতে পারিবে না। গ্রীকেরা খৃষ্টান হইবার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা করিতেন? তাঁহারা বামপার্শ্বস্থ দেবগণের উপাসক ছিলেন—

গ্রীক্	লাটিন	সংস্কৃত
Pan	Favonius	পবন (পবনস্)
Zeus	Jovis	দ্যু
Zeus pater	Jupiter	দ্যুপিতরঃ
Uranus	Auranos	বরুণস্
Phoroneus		ভরণ্যু
Janus		গণেশ
,,	Vulcan	ভার্গবীণ
,,	Ijnis	অগ্নিস্

গ্রীকদিগের এই পন, জিউস্, জিউস্‌পেটার, উরণস্ ফোরোনিউস্ ও জানুস কি যথাক্রমে আমাদিগের বৈদিক দেবতা পবন, দ্যু, দ্যুপিতরঃ বরুণ, ভরণ্যু ও গণেশের বিকৃতি বা অপভ্রংশবিশেষ নহে? গ্রীকেরা কেন এই সকল দেবতার উপাসক ছিলেন? যবনগণ, যযাতিসন্তান ও ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী। ভারতবাসীরা বৈদিক যুগে যে সকল দেবতার উপাসনা করিতেন, গ্রীক ও লাটিনগণও সেই সকল দেবতার উপাসনা ও ভারতের সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ভব্যতা লইয়া তুরুস্ক হইয়া ইউরোপে গমন করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের নানা বিষয়ে যে সমতা হইবে তাহা ধ্রুবই। এই সকল বস্তু তাঁহাদিগের ও আমাদিগের সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা কখন ভারত হইতে ইউরোপে বা গ্রীসে যাইয়া জ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, এরূপ কোন কথা, না পাশ্চাত্যগণের কোন শাস্ত্রে বা ইতিহাসে রহিয়াছে, না আমাদের কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে আমাদের মহামান্য মনুতে লিখিত আছে যে, কোন এক সময়ে পৃথিবীর সমুদায় লোক আমাদের ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের নিকট জ্ঞানশিক্ষা করিয়া যাইতেন।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য
সকাশাৎ অগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্
পৃথিব্যাঃ সর্ব্বমানবাঃ॥ ২০—২অ

কেবল ইহাই নহে, স্বয়ং খ্রীষ্টদেব ১৩ বর্ষ হইতে ২৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়া আমাদের মনুসংহিতা, গীতা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে স্বদেশে যাইয়া গীতার ছাঁচে উপদেশ দান করিয়াছেন। একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এথেন্স নগরে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দু দর্শন ও জ্যোতিষাদি বিষয়ের উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সুতরাং ইত্যাদি নানা কারণে গ্রীক প্রভৃতি জাতির সহিত আমাদিগের বহু বিষয়ে যে সমতা লক্ষিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি আমরা গ্রীকগণের নিকট যে কিছু ধার করিয়াছি, এরূপ কোন প্রমাণ এ জগতে নাই। ফলতঃ যে গ্রীকগণ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, যাঁহাদের উন্নতির মহাযুগ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন বৌদ্ধযুগেরও পরবর্ত্তী, অথবা কতক সম সাময়িক; সেই গ্রীকগণ আমাদের অধ্যাপক বা উত্তমর্ণ ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক কথা আর কি হইতে পারে?

ভারতে বৌদ্ধযুগ কবে আসিয়াছিল? যখন বৈদিকযুগ, উপনিষদ্‌যুগ, সংহিতাযুগ, দর্শনযুগ, রামায়ণ ও মহাভারতযুগ এবং পৌরাণিক যুগের পতনের পর ভারতে তান্ত্রিক যুগের প্রাদুর্ভাব হইয়া নরবলি ও পশুবলির আতিশয্য দ্বারা ভারত রসাতলে যাইতেছিল, যে যুগে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের প্রতিরোধ ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে সন্তানোৎসর্জন দ্বারা ভারত আপনাকে নরকে পরিণত করিয়াছিল, ভারতের সেই মহাপতনের যুগেই ভারতে বৌদ্ধযুগের প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং যে গ্রীকগণ এহেন অবরজ বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক, আমাদিগের ভারতবর্ষ, তাঁহাদিগ হইতে কত পরিণতবয়াঃ তাহা চক্ষুষ্মাণেরাই ভাবিয়া দেখুন। কোরাণের বয়ঃক্রমে ১২৭৮ বৎসর (সৌর মতে), বাইবেলের বয়ঃক্রমে তিনহাজার বৎসর। আমাদিগের পাণিনি ব্যাকরণও ইহা অপেক্ষা বয়সে বড় ছিল। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বয়ঃক্রমও ৫০১২ বৎসর হইতেছে। ব্যাসদেব কলিযুগের প্রভাত সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এখন আমাদের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিনটি মহাযুগের বয়ঃক্রম যোগ করিলে আমাদের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ, জগতের আদি মহাকাব্য বা আদি ইতিহাস সাম বেদের বয়ঃক্রম কি অন্ততঃ লক্ষ বৎসরও হইবে না? তোমরা অবশ্য তুলার গাঁইটের মত প্রেসার দিয়া আমাদের চারিটা যুগকে খাট ও আয়তনে ছোট করিয়া আমাদের প্রাচীনাদপি প্রাচীনতম বেদ চতুষ্টয়কে তোমাদের ছোকরা-বাইবেলের হাঁটুর নীচে ফেলিতে চাহ বটে, কিন্তু তোমরা নিজেই যখন আমাদের নিরুক্তকার যাস্ককে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে স্থান দান করিতে অভিলাষী, তখন যাস্কের পূর্ব্ববর্ত্তী স্কন্দস্বামী, শাকপূণি, ঔর্ণবাভ ও স্থৌলষ্ঠিবি প্রভৃতি নিরুক্তকারগণকে তোমরা তোমাদের মুষার সমসাময়িক না ভাবিয়া পারিতেছ না।—সে সময়েরও বহুপূর্ব্বে যে দেশে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, দর্শন, স্মৃতি, উপনিষৎ ও সমগ্র বেদচতুষ্টয়ের দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে দেশ কত কালের তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখিতেও সমর্থ নহ।

ব্রাহ্মণো বেদস্য ব্যাখ্যানম্।

ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি বেদের ব্যাখ্যা বা আদি

আয়ুগ্রন্থ। উহাদের বয়ঃক্রমই যখন তোমাদের বাইবেল ও কোরাণের বয়সের বিশ পঁচিশ গুণ বেশী, তখন তোমরা সাতাইশ শত বৎসরের গ্রীক ও দুই হাজার বৎসরের নাবালক রোমকে কোন্ সাহসে আমাদের ভারতের নিকটে খাড়া করিতে চাহিতেছ? আমাদের রেল ছিল, কামান ছিল, বন্দুক ছিল, বিমান ছিল এবং যাহা কাহারও নাই, এমন বেদ ছিল ও এখনও তাহা রহিয়াছে; পক্ষান্তরে গ্রীস, রোম, মিশর, ও চীনের লোকেরা দেখাইতে পারেন, এমন গ্রন্থ তাঁহাদের কি আছে বল? তোমাদের সর্ব্ব প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলের প্রথম পুস্তকে প্রতিমাপূজার নিষেধ রহিয়াছে; আর আমাদের বেদ, উপনিষৎ ও স্মৃতি গ্রন্থে প্রতিমা পূজার কথাটি মাত্রও নাই। সুতরাং যে দেশের নানা জ্ঞানপূর্ণ এই সকল গ্রন্থ এত প্রাচীনতম, সেই দেশের অধিবাসী ও সেই দেশ তোমাদের ঐ সকল দেশ ও দেশবাসী অপেক্ষা কত প্রাচীনতম, তাহা না ভাবিয়া কেন তোমরা অদূরদর্শী পাশ্চাত্যগণের কথায় বিমুগ্ধ হইয়া বিনাশের দিকে যাইতেছ? অবশ্য তোমরা পাশ্চাত্য হলাহল পান করিয়া নেশার ঝোঁকে বলিতে পার, রামায়ণ মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা, পুরাণ মিথ্যা। কিন্তু এই সকল মিথ্যা গ্রন্থগুলি যে আলাদীনের প্রদীপের ঘষায় উৎপন্ন হয় নাই, মহাজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিরা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কি তোমরা সন্দেহ করিতে পার? ঐ সকল ঋষিরা যে সকল জ্ঞানবত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন, তোমাদের কোন্ বৈদেশিক গ্রন্থে তাহা আছে? উহাদের মতন প্রাচীন ঋষিও কি একজনও তোমাদের সাতাইশশত বৎসরের পুরাতন ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অবশ্য ঋগ্বেদে হরিয়ূপীয়া বা ইউরোপের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

যং হরিয়ূপীয়ায়াং হন্

৫—২৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—হরিয়ূপীয়ায়াং হরিয়ূপীয়া নাম কাচিৎ নদী, কাচিৎ নগরী বা।

ইন্দ্র হরিয়ূপীয়া জনপদে (নদী বা নগরী নহে) গমনপূর্ব্বক বরশিখ নামক দৈত্যকে বধ করেন। এই হরিয়ূপীয়া শব্দই লাটিনে Europea ও Europa হইয়া শেষে Europe মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মোক্ষমূলর যে বলিয়াছেন, ইউরোপশব্দ উর্ব্বশীশব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত, তাহা অমূলক। দোহাই ভগবানের! তোমরা এ দেশের ভাষ্যকার ও বিদেশের সাহেবদিগের কথা কখনই শাস্ত্রের সহিত না মিলাইয়া সহসা বিশ্বাস করিও না।

তবে ত ইউরোপ অতি প্রাচীনতম ভূমি? না, তাহা নহে। ঋগ্বেদের মন্ত্রসকল সত্য * ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগ ধরিয়া প্রণীত। স্বর্গের সিংহাসনেও এক ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব করিয়া ছিলেন না। সুতরাং বোধহয় দ্বাপর যুগের কোন ইন্দ্রকর্ত্তৃক হরিয়ূপীয়াবাসী বরশিখ দৈত্য নিহত হইলে, কোন ঋষি তাহা মন্ত্রে বর্ণনা

* পৌরাণিকেরা যে জগতের আদি সৃষ্টি হইতে সত্যযুগের পরিগণনা করেন, আমরা তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করি না। বোধ হয় যে যুগে প্রথম সভ্যতার বিকাশ হইয়া বেদমন্ত্র সকল মুখে মুখে রচিত হইতে আরম্ভ হয় সেই আলোকের যুগই সত্যযুগের প্রভাত কাল।

করেন। গ্রীক জাতি ইহারও ২০।২৫ হাজার বৎসর পরে গ্রীশদেশে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ যে গ্রীক জাতি ও রোমকগণ আমাদের গীতা ও বিক্রমাদিত্য হইতে বয়সে অবরজ বা সমসাময়িক তাঁহাদিগের সহিত ব্রহ্মঘোষ বিঘোষিত ভারতের তুলনা দিতে কে সাহসী হইতে পারে? ভারতের সংস্কৃত বিকৃত হইয়া যে দেশের গ্রীক, লাটিন ও হিব্রুভাষায় অভ্যুদয় হইয়াছে, যে দেশের জর্ম্মাণ, শাকসন, কেলটিক, লিথুনিয়ান, ইংরাজ ও অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি সমগ্র ভাষা সংস্কৃত ভাষার বিকারের বিকারপ্রভব, সেই প্রাচীনতম ভারতের গরিমার সহিত কাহার গরিমা তুলিত হইতে পারে? জ্যেঠার সহিত ভাইপোর বয়সের তুলনা?

মিশর দেশের বয়ঃক্রম ছয় কি সাত হাজার বৎসর, ইহা তোমাদেরই কথা। তথাস্তু; উহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহার সহিত লক্ষ বৎসরের সভ্যতম মহাতীর্থ ভারতবর্ষের কি নামও লওয়া যাইতে পারে? আফ্রিকার বয়ঃক্রম কত হইবে? এখনও উহার মধ্যভাগ সমুদ্রই রহিয়া গিয়াছে, যেন একটা রিঙ্গ সমুদ্রবক্ষে হামা দিয়া বেড়াইতেছে। উহাতে যে সকল যবনসন্তান, প্রথমে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যখন আমাদের যযাতিপুত্র তুর্ব্বশুর সন্তানের মহাসন্তান, তখন তাঁহারা যে আমাদের ভারতের কাছে কত অবরজ তাহা আর কি বলিব? হৈহয় তালজঙ্ঘ, পারদ, শক ও যবন প্রভৃতি কতকগুলি জাতি সগরকর্তৃক পরাভূত ও নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া আফ্রিকাদেশে প্রবেশ করেন। উক্ত মিশ্রজাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া উক্ত জনপদ 'মিশ্রদেশ' নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। 'মিশর' শব্দ তাহা হইতেই ব্যুৎপাদিত। মিশরের "পীরামিড" আমাদের "পুরমঠ" ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবং আমাদের বেদে যাঁহারা মূর বা মূঢ় অর্থাৎ পাষণ্ড বলিয়া প্রখ্যাপিত, মরক্কোর মুরগণ তাঁহাদেরই অনন্তরবংশ্য। এহেন মিশর আমাদের মহাভারতের যুগের সমসাময়িক হইলেও আমাদের প্রকৃত বৈদিকযুগ হইতে কত কনীয়ান্ তাহা প্রবীণেরা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। চীন জাতি ও চীনদেশ কতদিনের? মনু বলিতেছেন যে—

> শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ
> ইমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতা লোকে
> ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥৪৩
> ঔড্রকা পৌণ্ড্র দ্রবিড়াঃ
> কম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ
> কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥৪৪—১০অ

পুণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ (পারস্য), পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ ও খশ, এই দ্বাদশ দেশবাসী ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের অদর্শন ও ক্রিয়ার লোপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অতএব চীনগণ যে ভূতপূর্ব্ব ভারত সন্তান ও ক্ষত্রিয় ছিলেন তাহা প্রতীত হইতেছে। কোন্ দেশ প্রাচীন চীন? ভগদত্ত কিরাত ও চীন সৈন্য লইয়া পাণ্ডবর্গণের সহিত বল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। নেপালের পশ্চিম ভাগ এই চীনদেশ ও পূর্ব্বাংশ একদিন কিরাত দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। কিরাত-

গণ এখন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে যাইয়া মগ জাতিতে ও পশ্চিমে বালুকাস্থান (খিলাত) হইয়া ইউরোপে যাইয়া কেলট্ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। আর চীনগণ নেপাল পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান চীনে যাইয়া বসবাস করেন, তাহাতেই উক্ত জনপদ (জনলোক) চীনদেশ নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। অথর্ববেদে আছে—

উদঙ্ জাতা হিমবতঃ
স প্রাচ্যাং নীয়সে জনম্।

হে কুষ্ঠ তুমি হিমালয়ের উত্তরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে হিমালয়ের পূর্ব্বে জনলোকে নীত হইয়াছ। হিমালয়ের পূর্ব্বে একটি লোক ভিন্ন আর দ্বিতীয় লোক নাই। সুতরাং প্রাচীন জনলোকই যে ভারতীয় চীনগণের সমাগমে চীননাম ধারণ করিয়াছে, তাহা ধ্রুবই। এখনও ঐ কারণে চীনেরা নেপাল হইতে পৈতৃক স্বত্ব বাবত কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রধান মন্ত্রী লিহচাং আমাদের রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাশগুপ্তকেও বলিয়াছিলেন যে, বাবু আমরা আপনাদের ভারতবর্ষ হইতেই এদেশে আগমন করিয়াছি। এখনও চীনে শ্রাদ্ধ, সতীদাহ ও বৃদ্ধসেবা প্রভৃতি বহু হিন্দুভাব বিরাজমান। এখনও চীনে হিন্দুদিগের দশ মহাবিদ্যা অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সকল চীন এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন নাই। সুতরাং যে চীনে এখনও আমাদের তান্ত্রিক দেবতা দশমহাবিদ্যা আরাধিত হইয়া থাকেন, সেই চীন প্রাচীনতম, না আমাদের ভারতবর্ষ প্রাচীনতম, তাহা আক্কেলবদ্ধ নবীনেরা ভাবিয়া দেখুন। উপনিবেশ ভূমি কি আদি ভূমি হইতে কনীয়ান্ নহে? সেই চীনের নিকট আমরা ঘণ্টা পাইয়াছি, না সতীদাহের ন্যায় তাঁহারাই এদেশ হইতে টিকী (বেণী) ও ঘণ্টা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা চীনগণকেই তোমরা জিজ্ঞাসা কর।

সর্ব্বাদৌ দেবগণ বা আর্য্যজাতির পূর্ব্ব পিতামহেরা স্বর্গবাস কালে ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ এই তিন লোকের কথা অবগত ছিলেন। তাই বেদমন্ত্রে সূর্য্যকে উক্ত তিন লোকের প্রসব কর্ত্তা বলিয়া সংসূচিত করা হয়। এই ত্রৈলোক্য আমাদের—

ভারতবর্ষ (আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব্বোপদ্বীপ), অন্তরিক্ষ (অপোগস্থান, পারস্য, স্বাধীনতাতার), স্বর্গ (তিব্বত, চিনতাতার ও মঙ্গলিয়া) ত্রিলোক বলিয়া পরিগণিত। ঐ সময় আমরাও আরহ্রদের (আরাল) পার আছে বলিয়া জানিতাম না। ক্রমে সাইবিরিয়া ও বর্ত্তমান চীন স্থলে পরিণত হইলে ভুবনসংখ্যা তিনের পরিবর্ত্তে সাতটি হয়।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যম্। মহঃ, তপঃ ও সত্য লোক লইয়া সাইবিরিয়া পরিগণিত ও জনলোক বা ভদাশ্ববর্ষই বর্ত্তমান চীন। পরে সপ্তপাতাল বা আমেরিকা ধরিয়া ভুবন বা লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশটি হয়। সুতরাং ঐ সময়ে আরব, তুরস্ক, আফ্রিকা ও ইউরোপের জন্ম আদবেই হয় নাই। হইলে, যাঁহারা আমেরিকার সংবাদ রাখিতেন, হরিয়ূপীয়ার সংবাদও পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যে চৌদ্দলোকের গণনার সময় অত বড় দুইটা মহাদেশ ও আরব তুরুস্ককে পরিত্যাগ করিতেন, তাহা সম্ভাবনার কথাই নহে। ঋগ্বেদে প্রাচীন

স্থানের নাম লইতে যাইয়া স্বর্গ ও ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পুরাণোঃ সম্মনোঃ কেতুঃ।

সুতরাং যাঁহারা জগতের আদি প্রাচীনতম আদি সভ্যভূমি স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া প্রভৃতি ও দ্বিতীয় প্রাচীনতম দ্বিতীয় সভ্যভূমি ভারতকে অবরুদ্ধ ও অন্যের দ্বারের ভিখারী বলিতে চাহেন তাঁহারা ষষ্ঠ মহাপাতকিবিশেষ।

প্রতিফল।

(১)

প্রবাদ আছে—"বাপের কুপুত্তুররা বরযাত্র গিয়া থাকে।" আমি কিন্তু বাপের কুপুত্র হইয়া বরযাত্র যাই নাই; পরে হইয়াছিলাম বল্টে। ব্যাপারটা খুলিয়া বলা যাউক্।

বি, এ, 'একজামিন' দিয়া আসিয়া বাটীতে বসিয়া আছি। 'মেসের' রুদ্ধ কুটীরে দিনরাত্রি পড়িয়া পড়িয়া তিক্ত হইয়া গিয়াছিলাম; এক্ষণে পল্লীর মুক্ত মণ্ডপে বিশ্রামের মধুর আস্বাদে তৃপ্ত হইতেছি। জনাকীর্ণ কলিকাতানগরার প্রায়-সর্ব্বক্ষণ-ব্যাপী বিরাট্ মুখরতায় অনভ্যস্ত হৃদয়টা একেবারে দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে আবার যেন শৈশব-সঙ্গিনী পল্লীভূমির মৌন অভিনন্দনে প্রকৃতিস্থতা লাভ করিলাম। ইহার প্রতি মাঠ ঘাট মন্দিরে—প্রতি গৃহ-কুটীরে, প্রতি তরু-গুল্ম-লতিকায়—আমাকে এমনি একটা সুবিমল প্রীতি দান করে, যাহাকে আমি আত্মীয় স্বজনের ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে পারি। ইহার প্রতি দূর্ব্বাগুচ্ছ, প্রতি ধূলিকণা যেন নিতান্তই আমার 'আপনার' বলিয়া মনে হয়।

কৈশোরকাল হইতে আমার কবিতা লেখা অভ্যাস। বাহ্য-প্রকৃতির যেমন একটা কবিতার যুগ আইসে—যখন ফলে ফুলে নব কিশলয়ে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিভূষিত হয়, দিকে দিকে তাহার সুরভি নিঃশ্বাস বহিতে থাকে, জলে, স্থলে, শূন্যে তাহার কণ্ঠের কলতান নাচিতে থাকে,—তেমনি অন্তঃপ্রকৃতিরও একটা কবিতার যুগ আইসে, যখন অতি নীরস হৃদয়ও একটু সরস হইয়া উঠে, সরস হৃদয় রসপূর্ণ হইয়া উছলিয়া পড়ে। যে মৌন সে ক্ষণেকের তরেও মুখর হয়, অন্ততঃ অন্তরে অন্তরে মুখরতা অনুভব করে; যে মুখর, সে বীণার সহিত কণ্ঠ ছাড়িয়া দেয়। একদিন আমারও তেমনি কবিতার যুগ আসিয়াছিল; তখন আমি কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে

পদার্পণ করিয়াছি মাত্র। আমি অন্তরে বাহিরে নবীনতা অনুভব করিলাম। অচিন্তিত-পূর্ব্বের চিন্তায় ও অনাস্বাদিতপূর্ব্বের আস্বাদে আমাকে মোহিত করিয়া ফেলিল।

অচিরাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধুমহলে আমি একজন 'কবি' হইয়া পড়িলাম। শেষে কবিতার 'নেশা' আমাকে এমন নিবিড় ভাবে আক্রমণ করিল যে, প্রথম বারে এণ্ট্রেন্স পাশ করিতে পারিলাম না। মনে বড় দুঃখ হইল, ঘৃণা হইল। তখন দৃঢ়তার সহিত কল্পনাদেবীকে বলিলাম "কিছু দিনের জন্য বিদায় দাও, সময়ে তোমার পূজা করিব।" সেই হইতে কবিতা লেখা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, যখন নিতান্ত-অবসরে প্রাণটা কেমন-কেমন করিয়া উঠিত, তখনি কল্পনার ধ্যানে মগ্ন হইতাম।

আজি বিশ্রাম-কুটীরে বসিয়া কল্পনা-তুলিকায় পল্লীর সান্ধ্য-চিত্র অঙ্কন করিতেছি; খানিকটা লেখা হইয়াছে, এমন সময় আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা সুধীর আসিয়া উপস্থিত হইল। কবিতা রস-মাধুর্য্যে সুধীর ভায়া বড় তৃপ্তি পাইতেন না; কাজেই তাহাকে দেখিয়া খাতাখানি বন্ধ করিয়া বলিলাম—"এস"।

নানাবিধ আলোচনান্তে সুধীর বলিল, "চল একবার দেশ ভ্রমণ করিয়া আসি।" আমি ভাবিলাম—"এমন অসৌখিন লোকটির হঠাৎ দেশভ্রমণের 'খেয়াল' চাপিল কেন? প্রকাশ্যে বলিলাম, "বেশ্ বেশ্, কোন্ দিক জয় করিতে বাহির হওয়া যায় বল দেখি?" সুধীর নিশ্চিন্ত ভাবে—যেন পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল,—বলিল "মুর্শিদাবাদ"। এতদ্দেশ থাকিতে মুর্শিদাবাদ! আমার পছন্দ হইল না। মুর্শিদাবাদ ঐতিহাসিক স্থান বটে; সেখানে প্রাকৃতিক মধুরতা কিছু আছে কি? আমার মত 'কবি মানুষের' সেখানে লাভের আশা কই?

কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম,—"মুর্শিদাবাদ?" সুধীর হাসিয়া বলিল, "হাঁ মুর্শিদাবাদে গেলেই কিছু জয়ের সম্ভাবনা আছে; দাদা, অন্য দেশে সে আশা নাস্তি।" বলিয়া পকেট হইতে একখানি কাগজে মোড়া ফটো বাহির করিয়া আমার হাতে দিল।

একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া ছায়ামূর্ত্তিকে দেখিলাম। আন্দাজ পঞ্চদশবর্ষীয়া তরুণীর চিত্র। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বটে!

ফটোখানি ফিরাইয়া দিয়া সহাস্যে বলিলাম—"তুমি না হয় একটি সুন্দরী জয় করিয়া আসিলে। আমার লাভ কি?" সুধীরও হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ! মুর্শিদাবাদী ছানাবড়া, খোসায়ালি বর্ফি, খাগড়ায়ে মুর্কি প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রী যথাশক্তি উদরস্থ করিবে।"

আমি সন্তুষ্টচিত্তে বলিলাম,—"অগত্যা—যথালাভ!"

(২)

সুধীর আমার জ্ঞাতি-ভ্রাতা,—আমার চেয়ে মাস কয়েকের ছোট। আমাদেরই অংশীদার। কিন্তু তাহার পিতা—সম্পর্কে আমার জ্যেঠতাত মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক কূটবুদ্ধি-বলে আমাদের অপেক্ষা আয় অনেক বাড়াইয়াছেন। তিনি অর্থোপায়ের নানারূপ ফন্দি অবগত আছেন, কিন্তু তাহার যথাব্যবহারে বদ্ধহস্ত। সুধীর সচ্চরিত্র, সুপুরুষ, পুলিশের কার্য্যের উপযুক্ত না হইলেও সে সম্প্রতি এফ, এ ফেল করিয়া পুলিস-সব্‌ইনেস্পেক্‌টরী

চাকুরী করিতেছে। সুধীর অবস্থাবান্, রূপ-বান্, গুণবান্, স্বাস্থ্যবান্, সুতরাং বিবাহের বাজারে সে যে একজন উচ্চদরের পাত্র, সন্দেহ কি? মুর্শিদাবাদে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। নগদ হাজার টাকা, হাজার টাকার গহনা, এবং বস্ত্রাভরণ-যৌতুকাদিতে ৫০০ শত টাকা লইয়া সুধীরের পিতা মুর্শিদাবাদের কন্যাদায়গ্রস্ত নিরীহ উকিল তারানাথবাবুটিকে উদ্ধার করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

যথাসময়ে নক্ষত্রবেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র প্রায় ত্রিশজন বরযাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া বিবাহার্থে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য আমিও একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মধ্যে গণ্য হইয়াছিলাম। সুধীরের পিতার এত লোকজন লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুধীর তাহার বন্ধু বান্ধবগণকে সঙ্গ-বঞ্চিত করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা লোকবৃদ্ধিপক্ষে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইয়াছিল।

তখন রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ লাইনের কথা-বার্ত্তা নাই। কলিকাতা অঞ্চলের লোককে মুর্শিদাবাদ যাইতে হইলে হাবরায় উঠিয়া আজিমগঞ্জে নামিতে হইত। আমরা ইণ্টার' ক্লাসের একখানি গোটা গাড়ী রিজার্ভ করিয়াছিলাম। বৃদ্ধ, যুবক, বালক ও ভৃত্য, এই শ্রেণীচতুষ্টয়ে উক্ত গাড়ীর কুটীরগুলি বিভাগ করা গিয়াছিল। সুতরাং কোন পক্ষেরই নিঃসঙ্কোচ আলাপে অসুবিধা রহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা যুবক শ্রেণীটি অচিরকালমধ্যে 'সরগরম' হইয়া উঠিল। নানাবিধ আজগুবি' গল্পে, বিশেষতঃ কোন্ বিবাহে কোন্ বরযাত্রীর দল কোথায় কিরূপ 'নাকালের' আদান প্রদান করিয়া 'বাপের কুপুত্র' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল, কোথায় আহার্য্যের সুপরিপাটী বন্দোবস্তে পরম আপ্যায়িত হইয়াছিল এবং কোথায় বা আহারাভাবে 'দন্তরস' সেবনে সমস্ত নিশা জঠরস্থ-বহ্নি-তাড়না-জনিত অনিদ্রায় যাপিত হইয়াছিল—ইত্যাদি বিষয়ক অতিরঞ্জিত বর্ণনায় চলিষ্ণু লৌহ-কুটীর মুখরিত হইয়া উঠিল। সে দিন কি তিথি বলিতে পারিনা—শুভ্র জ্যোৎস্নায় দিক ছাইয়া পড়িয়াছে। দিবালোকে যাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না, আজ জ্যোৎস্নার শুভ্র স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনে তাহাদের এক অপরূপ শোভা দেখিতে পাইলাম। সেই যথাতথা চিরদৃষ্ট চিরপরিচিত নীরব পান্তর, তরু-গুল্ম লতা, গৃহ-কুটীর আজ বড়ই সুন্দর, শান্ত, মধুর বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির স্নিগ্ধ নীরবতা ভেদ করিয়া আমাদের লৌহ-যান সশব্দে ধাবিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে যেন শ্বাস ফেলিবার জন্য স্থানবিশেষে এক-একবার দাঁড়াইতেছে!

সেরাত্রি একরূপ অনিদ্রাতেই কাটিল। পরদিন প্রাতে আমরা আজিমগঞ্জে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম কন্যাপক্ষীয় কয়েকটি ভদ্রলোক আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার মধ্যে একটি সুপরিচিত মুখ দেখিয়া আমি আহ্লাদে ডাকিলাম "কিশোর বাবু!"

কিশোরবাবু ছুটিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"প্রিয়বাবু, আপনি আসিয়াছেন, একটা সংবাদ দিতে হয়!"

আমি বলিলাম,—আপনি যে ইহার মধ্যে আছেন, কেমন করিয়া জানিব?

কি। এ বিবাহ যে আমাদের প্রতিবেশীর কন্যার সহিত হইতেছে!

কিশোর বাবু আমার 'ক্ল্যাসফ্রেণ্ড'; প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সঙ্গে বি,এ, পড়িয়াছি,—উভয়েই এইবারে বি, এ, দিয়াছি। কিশোর বাবুর বাড়ী মুর্শিদাবাদে জানিতাম—কিন্তু খাস মুর্শিদাবাদে তাহা জানিতাম না।

আজিমগঞ্জের একটি দ্বিতল গৃহে আমাদের জন্য পৌর্ব্বাহ্নিক চা-পান ও জলযোগের উদ্যোগ করা হইয়াছে। অনেকেই প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক, কেহ বা স্নানকৃত্য সমাধা করিয়া প্রাতরাশে বসিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য আমিও জিহ্বাকে বঞ্চিত করিলাম না। ওসোয়ালি বর্ফির ও ছানার মাল-পোর সংব্যবহার করিয়া হাসিতে হাসিতে সুধীরকে বলিলাম,—"ভায়া, নমুনায় সাহস হইতেছে, আসলে বঞ্চিত হইব না।"

(৩)

অদ্য রাত্রে বিবাহ। আমরা নব্যযুবকের দল বরযাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট 'হলে' বসিয়া অপরাহ্নে তাসখেলা অরম্ভ করিয়াছি। প্রৌঢ়দের একদল নীরবে দাবা এবং অন্য দল সরবে পাশায় মনঃস-যোগ করিয়াছেন। ইস্তকবিন্তি পঞ্চাশ, কিস্তি, কচেবার, ছ-তিন নয় প্রভৃতির ধীর-উচ্চ শব্দে গৃহ নিনাদিত। সুবাসিত তাম্রকূটের কুণ্ডলীকৃত ধূমপুঞ্জে গৃহ কুহেলিকাছন্নবৎ শোভমান; সর্ব্বোপরি হুক্কাকূজন এবং ক্রীড়াকোলাহল ভেদ করিয়া নিদ্রিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরের সুমধুর নাসাধ্বনি অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত! কন্যাপক্ষীয় বালকবালিকাগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া বর দেখিবার জন্য উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে, এবং কোনটি প্রকৃত বর স্থির করিতে না পারিয়া আমাদের অনেককেই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ দ্বারা বর নির্ব্বাচিত করিতেছে, এমন সময়ে সুধীরের পিতা ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের বাটী হইতে আসিয়াই গম্ভীর অথচ ব্যস্তভাবে বলিলেন—"কোন অনিবার্য্য কারণে বিবাহ হইল না, সকলে শীঘ্র 'রওনা' হইবার জন্য প্রস্তুত হউন্।"

এরূপ অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া আমরা সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। জিজ্ঞাসা-বিস্ফারিত চক্ষে সকলে বক্তার মুখের দিকে চাহিলাম। পুরোহিত মহাশয় তাঁহার বিস্ময়-ব্যাদিত বদন প্রকৃতিস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি কথা, বিবাহ হইল না! আকস্মিক কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল?" সুধীরের পিতা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কেবল বলিলেন,—"সে সব কথা রাস্তায় বলিব; ১০টার ট্রেণ ধরিতে হইবে—বিলম্ব করিবেন না।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিলাম। সুধীর ভায়ার মুখখানি একেবারে এতটুকু হইয়া গিয়াছে! আশায় নিরাশ হইলে, তৃষার সময় সুধাভাণ্ড হাতে পাইতে-পাইতে তাহা হাত ছাড়া হইলে, সকলকেই এমনিই হইতে হয়। বাস্তবিক ফটোখানি বড় সুন্দর!

যাইবার উদ্যোগে ব্যস্ত আছি; এমন সময় কিশোর বাবু আসিয়া আমাকে নির্জ্জনে লইয়াগিয়া বলিলেন,—"প্রিয়বাবু! বড় বিপদ, ভদ্র লোকের বুঝি জাতি রক্ষা হয় না। ছি-ছি, ভদ্রলোক ভদ্রলোককে ইচ্ছা করিয়া এমন বিপদে ফেলিতে পারেন, তাহা মনেও আসে না।

আমি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,— "কাঁগুথানা কি? বিবাহ বন্ধ হইল কেন?"

কি। মহাশয়, দুঃখের কথা বলিব কি, আপনাদের বরের পিতামহাশয়টি অতি ভয়ানক লোক।

আ। আসল কথাটা বলুন, আমাদিগকে শীঘ্রই রওনা হইতে হইবে।

কি। আমরা কন্যাপক্ষ—আমাদিগের কথা বিশ্বাস করিবেন কি?

আ। অবশ্য করিব। আপনি আগাগোড়া খুলিয়া বলুন।

কি। পাত্রের পিতা কোথা হইতে এক বেনামী চিঠি বাহির করিয়া কন্যার পিতাকে বলিলেন, "ইহাতে আপনার পারিবারিক অনেক কুৎসার কথা লেখা আছে। আমি অন্যকার ডাকে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং এ অবস্থায় আপনার কন্যার সহিত আমি পুত্রের বিবাহ দিতে অক্ষম।" কন্যার পিতা ত অবাক্! কন্যাদান করিতে বসিয়া এরূপ কথা শুনিলে মানুষের মনের অবস্থা কেমন হয় বুঝিতেই পারিতেছেন। তিনি অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনি কি পত্রের কথা বিশ্বাস করেন? ইহা কি আমার শত্রুপক্ষের লিখিত মিথ্যা অপবাদ বলিয়া আপনার ধারণা হইতেছে না?" পাত্রের পিতা বলিলেন, "সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন! তবে ছেলের বিবাহ দিতে আসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া লজ্জার কথা, বিশেষ আপনার পক্ষে ঘোরতর লজ্জা ও অপমানের বিষয়, এই জন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি—আপনি দেয় বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে অগ্রসর হউন্।" কন্যার পিতা লোকটি এদিকে নেহাৎ নিরীহ; কিন্তু অন্যায়ের যম। তিনি পাত্রের পিতার নীচ অর্থগৃধ্নুতার পরিচয় পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, বুঝি একটু ক্রুদ্ধও হইলেন। বলিলেন,—"মহাশয়, অর্থ যদি আপনার এতই প্রিয় হয়, ভিক্ষা চাহুন্ দিব, কিন্তু মিথ্যা অপবাদের দণ্ড—ভাবুকির উৎকোচ একটি পয়সাও দিব না।" পাত্রের পিতা কন্যার পিতার মুখ হইতে এতটা রূঢ়—এতটা তেজের কথা শুনিবেন মনে ভাবেন নাই। তিনি যেন অপ্রস্তুত ও অপমানিত হইলেন। আসন হইতে উঠিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন,— "ভাল কথা,—ভিক্ষুকের পুত্রকে কন্যা সমর্পণ করিবেন না। আমরা বিদায় হইলাম।"

এই বলিয়া উনি চলিয়া আসিবার উপক্রম করিলেন। 'রোখের' মাথায় কন্যার পিতাও বলিয়া ফেলিলেন,—"জাতি কুল যায় যাউক্, এমন নীচলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিব না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যই কি উঁহাদের কোন পরিবারিক কলঙ্ক আছে?"

কিশোরবাবু জিহ্বা দংশন করিয়া বলিলেন, "রাম রাম! উঁহারা অতি সৎপরিবার।"

আ। তবে বেনামী চিঠি আসে কেন?

কি। আসল কথা শুনিবেন? কন্যাটি যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী। মেয়েটিকে দেখিয়া তারানাথ বাবুর একটি ধনী আত্মীয়পুত্রের পছন্দ হয়। সে নিজেই বিবাহের প্রস্তাব করে। কিন্তু ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভাল না হওয়ায় এবং সে দেখিতেও শ্রীমান্ নহে বলিয়া তারানাথ বাবু অসম্মত হন। ইহাতে সে অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হয়। আমরা পরে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সে অনেকের কাছে প্রকাশ করিয়াছিল—"তারানাথ বাবু

এখন কন্যা সমর্পণ করিলেন না, কিন্তু আমি বলিয়া রাখিতেছি, তারানাথ বাবু শেষে আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কন্যাদান করিবেন।" প্রিয়বাবু, পাপিষ্ঠ নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল। এই মেয়ের যেখানে যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, অনুসন্ধান লইয়া সেইখানে সেইখানে কুৎসাপূর্ণ বেনামী চিঠি দিয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। পাষণ্ড শেষটা 'জাতি যাওয়া' কাণ্ড ঘটাইয়া তবে ছাড়িল দেখিতেছি! কিন্তু তথাপি হতভাগ্যের আশা পূর্ণ হইবে না।"

আ। এখন উপায়?

কি। উপায়—হাত পা বাঁধিয়া মেয়েটাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া! নিরুপায় হইয়া এখন নিমন্ত্রণাগত একটি প্রৌঢ় বিপত্নীক কুটুম্বের হস্তে কন্যাটিকে সমর্পণ করিবার পরামর্শ চলিতেছে! হায়, মেয়েটার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল! অমন সোনার প্রতিমার ভগ্ন কুটীরে স্থান হইল? অমন সোনার লতিকা শুষ্ক কণ্টকবৃক্ষে জড়িত হইতে চলিল!

আ। মেয়েটি কি প্রকৃতই সুন্দরী—প্রকৃতই সুশীলা?

কি। পরমা সুন্দরী—অতি শান্ত সুশীলা।

আমি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলাম, "আমি বিবাহ করিতে চাই, আপনাদের আপত্তি আছে কি?"

কিশোর বাবু বিস্ময়-নির্নিমেষ চক্ষে কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "প্রিয়বাবু সত্য বলিতেছেন, না এ দুঃসময়ে ভদ্রলোককে উপহাস করিতেছেন"?

আ। যদি অযোগ্য বিবেচনা না করেন, তবে সত্য বলিতেছি, আমি প্রস্তুত আছি।

কিশোর বাবু যেন আহ্লাদে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, "অযোগ্য বিবেচনা করিব প্রিয়বাবু? ভগবান্ যা করেন মঙ্গলের জন্য; শোভার কপালে সুখ আছে, তাই আপনি স্বেচ্ছায় এ প্রস্তাব করিতেছেন।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "মঙ্গলটাকে এখনও বিশ্বাস নাই। ইঁহারা বিদায় হউন্। অন্ধকারে এবং ব্যস্ততার গোলমালে আমার আত্মগোপন সফল না হওয়া পর্য্যন্ত ভরসা নাই।"

বরের দল বিদায় হইলেন। বহুলোকের মধ্যে একটি লোকের অনুপস্থিতি সহসা কাহারও সন্দেহহীন চক্ষে পড়িবার কথা নহে। সুতরাং আমি নির্ব্বিবাদে কিশোর বাবুর নিকট রহিয়া গেলাম!

সেই রাত্রে শোভার সহিত আমার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টিকালে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে মনে বলিলাম, "সুধীর, তুমি বড় হতভাগ্য, তাই এমন রত্ন হাতে পাইয়াও বক্ষে ধারণ করিতে পাইলে না! ভবিতব্য, তোমারই জয়!

(৪)

বাড়ী যাইতে সাহসে কুলাইলনা। এ বিবাহের পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। বরাবর কলিকাতায় গিয়া সাবেক মেসে আশ্রয় লইলাম। এইখানে থাকিয়াই দেখা যাউক, কতদূর গড়ায়।

দিন দুই তিন পরেই বাবা আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, 'মেঘ বজ্রে পরিপূর্ণ।' পিতা গম্ভীর মুখে কিন্তু ব্যঙ্গস্বরে, বলিলেন,—"সুপুত্রের কার্য্য করিয়াছ; এখন যাহা বলিব, তাহা শুনিবে কি?"

আমি অবনতমস্তকে নম্রকণ্ঠে কহিলাম, "আজ্ঞা করুন্।"

পি। যদি সমাজে সসম্মানে আমাকে রাখিতে চাও, তবে বিবাহ, বনাম, দুঃস্বপ্নের কথা বিস্মৃত হও।

আ। জ্যেঠামহাশয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

পি। সত্য-মিথ্যার বিচার হইতেছে না। তিনি যখন বিবাহ দিতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা লোকের গ্রাহ্য হইতেছে। তাঁহার প্রচারিত কুৎসা-কাহিনীই লোকে বিশ্বাস করিতেছে। তোমার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। তুমি যে সৌন্দর্য্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া কলঙ্কভীতিকে অগ্রাহ্য কর নাই, তাহার প্রমাণ কি?

আ। যত দিন প্রমাণ দিতে না পারিব, ততদিন আমাদিগকে গৃহে স্থান দিবেন না। তাহা হইলে কেহই আপনার সম্মান সম্বন্ধে 'টুঁ' শব্দ করিতে পারিবে না।

পিতা রোষমিশ্রিত বিরক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমাদিগকে ত্যাগ করিবে, তথাপি সেই হতভাগিনীকে ত্যাগ করিবে না?"

আমি অবিচলিত স্বরে বলিলাম,—"তাহা হইলে বিবাহ করিতাম না।"

পিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আমি আদেশ করিতেছি, তুমি তাহাকে ত্যাগ কর। আমি সত্বর সুন্দরী, সুশীলা, সদ্বংশীয়া পাত্রীর সহিত তোমার বিবাহ দিব।"

আমিও দৃঢ়স্বরে বলিলাম,—"ক্ষমা করুণ; আমি অধর্ম্মের কাজ করিতে পারিব না। আমি অগ্নি-সাক্ষীকৃতা বিবাহিতা পত্নীকে,—সহধর্ম্মিণীকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

পিতা কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া, আরও কর্কশ করিয়া, আমার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন— "তবে পিতার আদেশ অমান্য করিতে, পিতাকে অপমান করিতে, কুণ্ঠিত নও?"

আমি বিনীতকণ্ঠে উত্তর করিলাম,—"বিবাহ যদি ধর্ম্মের ব্যাপার না হইয়া 'ছেলে খেলা' হইত, তবে আপনার আদেশ অবশ্য রক্ষা করিতাম।"

পিতা কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হায়, ব্রজেশ্বর, তোমার পিতৃভক্তি আর এই হতভাগ্যের পিতৃভক্তি—স্বর্গ নরক তফাৎ।"

প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। ব্রজেশ্বর কে? একটু পরেই বুঝিলাম,—বাবা "দেবীচৌধুরাণী"র ব্রজেশ্বরের কথা বলিতেছিলেন। এত দুঃখেও—এত বিরক্তির মধ্যেও আমার হাসি পাইল। হাসি পাইল বটে, কিন্তু ব্রজেশ্বরের সেই—"পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, পিতা হি পরমন্তপঃ" কথাটা হৃদয়ে আঘাতও করিল! আমি ভাল মানুষের মত চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা মনে করিলেন,—আমার মনটা কিছু নরম হইয়াছে। তিনি কোমল স্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়, বাড়ী চল্। আমি তোর আবার বিবাহ দিব; তুই আমার একমাত্র পুত্র। তোর পিতা মাতার বহু দিনের সাধ কি পূর্ণ হইতে দিবি না? মনে করিয়াছিলাম, কত ধুমধাম করিয়া তোর বিবাহ দিব, বড়-লোকের মেয়ে ঘরে আনিব, তা তুই আমাদের সব সাধে বাদ সাধিয়া বসিলি। যাহা করিয়াছিস্, ভুলিয়া যা। আমি মাসে মাসে সেই হতভাগিনীকে খোরাক পোষাক বাবদ কিছু

কিছু করিয়া দিব। আর কিংকি করিস্‌না। বাড়ী চল্‌; বিয়ে কর্‌, বাপ মার কথা রাখ্‌।" পিতার কণ্ঠস্বর ক্রমে আর্দ্র ও চক্ষু সরস হইতেছিল।

এত অস্বচ্ছন্দতার মধ্যেও আমি মনে মনে বলিলাম, "বাবা, আমি আপনাদের অনেক ক্ষতি করিয়াছি সত্য, আমার বিবাহে আপনারা অনেক টাকা পাইতেন; অনেক অলঙ্কারাদি পাইতেন; আমার বিবাহে ধুমধাম করিয়া মনের সাধ মিটাইতেন সংশয় নাই। কিন্তু 'এমন বউ' পাইতেন কিনা সন্দেহ!"

পাঠক, পাঠিকা, আমার নির্লজ্জতাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ—আমি মনে মনেই ঐরূপ বলিয়াছিলাম! পিতাকে প্রকাশ্যে বলিলাম,—"আমি হঠাৎ কোন মত দিতে পারিতেছি না এবং এখন বাড়ীও যাইতেছি না।

বাবা বুঝিলেন—"অধিক চটকাইলে লেবু তিক্ত হইয়া যাইবে।" তিনি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন-স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, তাই হউক। আমি চলিলাম - আমার সঙ্গে যাওয়াই তোমার ভাল ছিল,—তা যাক্‌, মুর্শিদাবাদ যাইও না।"

বোধ হয় বাবার ভয় হইল—পাছে আমি মুর্শিদাবাদী অপ্সরীর মোহে পড়িয়া যাই এবং আমার কিঞ্চিৎ-অনুকূল মত বদ্‌লাইয়া যায়!

বাবা চলিয়া গেলেন। সুধীরের পিতার উপর আমার বড় রাগ হইল। লোকটা একটি নিরীহ ভদ্রপরিবারের অযথা গ্লানি রটাইয়া বড়াই করিতেছে। শৃগাল দ্রাক্ষা ফল খাইতে না পাইয়া তাহার মিষ্টত্বের কথা গোপন করিয়া অম্লত্বের প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। ক্রোধে, প্রতিহিংসায়, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিলাম, "লোকটাকে যদি ঐ পরিবারের বাড়ীতে না খাওয়াইত আমি বিজয়-চৌধুরীর পুত্র নই।"

দিন কয়েক পরে পত্রদ্বারা বাবাকে আমার মত জানাইলাম। "ভাবিয়া দেখিলাম,—ধর্ম্মতঃ যাহাকে গ্রহণ করিয়াছি, লোকতঃ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি না। লোক অপেক্ষা ধর্ম্মই রক্ষণীয়—মাননীয়।"

পত্রের এইরূপ জবাব পাইলাম—"যদি তাহাদের সংস্রব ত্যাগ না কর এবং পুনরায় বিবাহ না কর, তাহা হইলে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। আমার বিষয় সম্পত্তিতে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। তুমি আমার ত্যজ্য পুত্র হইবে।"

আমি ইহাতে বিচলিত হইলাম না। কারণ, আমি তাঁহার হৃদয় জানিতাম। তিনি মুখে যতই আস্ফালন করুন, কার্য্যতঃ পিছাইবেন। আমার সাহস ছিল, জ্যেঠা মহাশয়কে শীঘ্রই ইহার প্রতিফল দিব; তখন আপনাআপনি পিতার 'ত্যজ্যপুত্র-প্রস্তাব' প্রত্যাহৃত হইবে।

(৫)

দেশে আমার এক বিশ্বস্ত বাল্যবন্ধু আছে, তাহার নাম অবিনাশ। তাহাকে পত্র লিখিলাম— "সুধীরের যেখানে যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সন্ধান লইয়া আমাকে সংবাদ দিবে। এবং বিবাহ সম্বন্ধে সুধীরের মত কি তাহাও জানাইবে।" সুধীর বিবাহ করিতে গিয়া কোন্‌ প্রকৃত কারণে ঘুরিয়া আসিয়াছে, তাহা আমি সেই বন্ধুটিকে জানাইলাম এবং সুধীরকেও জানাইতে বলিলাম। সুধীরের পিতা

কি প্রকৃতির লোক, তাহা সুধীরের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং প্রকৃত কারণ-সম্বন্ধে সুধীর সন্দেহ করিবে না,বরং সম্পূর্ণ বিশ্বাসই করিবে। তখন সে পিতার উপর বিরক্ত হইবে। বিরক্তিই আমার বাঞ্ছনীয়— আমার গন্তব্য পথের অনুকূল। কারণ, আমি একটি ষড়যন্ত্র পাকাইতে বসিয়াছি।

অবিনাশের পত্রে ক্রমে ক্রমে আমি অনেক কথা জানিতে পারিতেছি।—

সুধীরের পিতা সুধীরের বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছেন; নিজ হইতে নানা-স্থানে পাত্রী অনুসন্ধান করিতেছেন। অনেক স্থানে সম্বন্ধ ঠিক হইতেছে। দেনা-পাওনাতেও 'অবনিবনাও' হইতেছে না, তথাপি হঠাৎ কি জানি কেন সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। কন্যা-পক্ষ হঠাৎ নীরব হইয়া পড়িতেছেন; উপর্য্যুপরি-প্রাপ্ত পত্রের উত্তর দিতেছেন না। কেন এমন হইতেছে, সুধীরের পিতা তাহার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। পাত্রের দর নামান সত্বেও এইরূপে চারিপাঁচটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আবার কোন স্থানে মেয়ে পছন্দ হইল ত পাওনার অত্যল্পতাবশতঃ মত হইল না। কোন স্থানে টাকায় বনিল ত মেয়ে পছন্দ হইল না। এইরূপেও কয়েকটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল; ফলে একবৎসর অতীত হইল।

একদিন অবিনাশের পত্রে জানিতে পারিলাম, গয়ার একটি প্রসিদ্ধ অবস্থাপন্ন ডাক্তারের একমাত্র সুন্দরী কন্যার সহিত সুধীরের বিবাহের পাকাপাকি সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। আগামী ২৭শে বৈশাখ বিবাহ। কন্যার মামা আসিয়া সুধীরকে 'আশীর্ব্বাদ' করিয়া গিয়াছেন; সুধীরের পিতাও গয়ায় গিয়া কন্যা-আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছেন। দেনা-পাওনা সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে —পাত্রীর পিতা নগদ টাকা বিশেষ কিছু দিবেন না। কেবল যাতায়াতের খরচ বাবদ দুইশত টাকা দিবেন। তবে তিনি দুই হাজার টাকার অলঙ্কার দিতে প্রস্তুত। তাঁহার এক-মাত্র কন্যা—তাঁহার যাহা কিছু বিষয়সম্পত্তি আছে, ভবিষ্যতে তাহা সমস্ত কন্যারই হইবে। পাত্রের পিতা ইচ্ছা করিলে এখনও তিনি 'দানপত্র' লিখিয়া দিতে সম্মত।

গয়ার এই প্রসিদ্ধ ডাক্তারটি আমার শ্বশুর মহাশয়ের অতি নিকট-আত্মীয়। সুতরাং আমি আশা করিলাম, একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র পাইব। সুধীরের বিবাহে উপস্থিত থাকিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে!

আমার আশা নিষ্ফল হইল না। যথা-সময়ে নিমন্ত্রণ পত্র পাইলাম। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া যাইবার ভারও প্রাপ্ত হইলাম। পত্রে ইহাও জানিতে পারিলাম, শ্বশুর মহাশয় সপরিবারে গয়া রওনা হইতেছেন। সপরিবারে যখন যাইতেছেন, তখন অবশ্য আমার 'তিনি' বাদ পড়েন নাই।

যথাসময়ে গয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার পরেই বিবাহের লগ্ন। পাত্রপক্ষকে নিকটবর্ত্তী একটি বাটীতে বাসা দেওয়া হইয়াছে। আমি কাহারও সহিত দেখা করিলাম না। কারণ, তাহা অনাবশ্যক অথবা ক্ষতিকর মনে করিলাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই বর মহাশয় স্বদল-বলে বিবাহ করিতে আসিলেন। সুধীরের মুখখানি তত প্রফুল্ল বোধ হইল না। এক-

যার আশাভঙ্গ হইয়াছে, এবারেই বা বিশ্বাস কি? আমি হাসিয়া মনে মনে বলিলাম,—সুধীর, এবার নিশ্চিন্ত থাক; সেবার রত্ন-লাভে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলে, এবারে সে আশঙ্কা নাই। এবারে নিশ্চিত তেমনি রত্নই পাইবে।

দেশের কাহারও সহিত দেখা করিব না উদ্দেশে বাহিরে গেলাম না। ভিতরে শ্যালিকা-মহলে যোগদান করিলাম। ভিতর হইতে বাহিরের ব্যাপার-নিরীক্ষণে কোন ত্রুটি বা অসুবিধা হইল না।

"ছল্‌না তলায়" বর আসিয়া বসিলেন। একদিকে বরযাত্রীর দল ও অন্যদিকে কন্যা-যাত্রীর দল শোভা পাইলেন। অচিরে কন্যাকে বিবাহোপযোগী বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া তথায় লইয়া যাওয়া হইল। মন্ত্রপাঠের পূর্ব্বে কন্যার পিতা পাত্রের পিতার সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র ক্যাসবাক্স রাখিয়া বলিলেন, "বৈবাহিক মহাশয়, অলঙ্কারগুলি একবার বুঝিয়া লউন। এবং ঐ সঙ্গে 'দানপত্র' খানাও পাঠ করিবেন।"

পাত্রের পিতা বাক্সটি খুলিলেন। অলঙ্কার রাশির উজ্জ্বলদীপ্তি, গঠন-পারিপাট্য ও গুরুত্ব দর্শনে—তাঁহার নীরস ওষ্ঠাধরে মৃদুহাস্যস্রোত খেলিয়া গেল। দানপত্রখানি পাঠ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বেহাই মহাশয় মহৎলোক, আপনি কি আর অন্যায় করিবেন! বিশেষ আপনার ঐ কন্যাটিমাত্র পুঁজি! তবে নগদের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিলে ভাল হইত!"

কন্যার পিতা হাসিয়া বলিলেন,—"বেহাই মহাশয়ের যদি ইহাতে মনস্তুষ্টি না হইয়া থাকে তবে তাহাও পাইবেন। এখন শুভকার্য্যটা হইয়া যাউক।"

পাত্রের পিতা "আচ্ছা আচ্ছা" বলিয়া শুভ-কার্য্যে অনুমতি প্রদান করিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় সুধীর কি মনে করিয়াছিল বলিতে পারি না। তবে এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, শোভার অপ্রাপ্তিতে তাহার হৃদয়ে যে বেদনা জন্মিয়াছিল, বিভার প্রাপ্তিতে তাহা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছিল। সুধীর যদি ইহা স্বীকার না করে, তবে বলিব সে মিথ্যাবাদী। বিভা পরমা সুন্দরী।

(৬)

আহারের যেমন "মধুরেণ সমাপয়েৎ", বিবাহের তেমনি বাসরেণ সমাপয়েৎ। বাস্তবিক বিবাহের যাহা কিছু মজা—যাহা কিছু সার—তা বাসরে। এই বাসরের যিনি আবিষ্কারিকা—তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ। বাসর-বিপণিতে রূপ ও রসের পসরা লইয়া তরুণী ও যুবতীর দল বিরাজমানা। তরুণীরা রূপের এবং যুবতী মহাশয়ারা রসের অধিকারিণী! একমাত্র—ক্রেতারূপী বর মহাশয় এই রূপ-রসের মাঝখানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকেন। ক্রেতা যদি রসিক হন্, তবে হাবুডুবুগুলি হজম করিয়া সসম্মানে পার হইয়া যান্। আর যদি বে-রসিক হন্—তবে হয় বেসামাল হইয়া পড়েন, নয় অজীর্ণ-বমনের দুর্গন্ধে সুন্দরীকুলকে নাসারন্ধ্র রুদ্ধকরণে বাধ্য করেন!

আমাদের সুধীর ভায়া সুরসিক না হইলেও বেরসিক নহে। সে বাসরে আসিয়া পসার করিতে না পারিলেও নিতান্ত অসাড় হইয়া

পড়িল না। সে একটা আধটা কথার বেশ্ সুরুচিসঙ্গত মধুর মোলায়েম জবাব দিতে লাগিল। আমি শোভাকে শিখাইয়া দিয়াছিলাম—"সুধীরকে তোমার চাঁদমুখখানা ভাল করিয়া দেখাইও। আহা! বেচারা তোমার ফটোখানি বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াছে, শেষটা শিশুপালের মত ফিরিয়া গিয়াছে।" শোভা সহাস-ভ্রূকুটির তিরস্কার করিয়া, বড় বড় নয়ন-তূন হইতে দুটো চোখা-চোখা কটাক্ষ-বাণ মারিয়া এবং আমার গণ্ডদেশে তাহার যুগল চম্পকাঙ্গুলিনিঃসৃত আঘাত বিশেষের (যাহা দেশজ ভাষায় 'ঠোনা' নামে প্রসিদ্ধ) অস্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল!

আমি বাসরঘরের দৃশ্য দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পাঠক-পাঠিকার বিচারে ইহাতে আমার ফাঁসিই হউক, আর শূলই হউক, জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া গেলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার অধিকার নাই। তবে আশা করি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না।

অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্ব্বক শ্রীমতী শোভা শ্রীমান্ সুধীরকুমারের সম্মুখে নির্ব্বিকার চিত্তে বসিয়া গিয়াছেন, এবং সুধীরের সম্মুখস্থ একখানি 'খাগড়ায়ে ডিসের' উপর অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন, "ছানাবড়াটা খাও, এ 'ওশোয়ালি' বর্ফিখানা রাখিলে কেন? বিভার জন্য বুঝি? তা ওটা খাও, প্রসাদ দুটো 'খাগড়ায়ে মুর্কি' রাখিলেই চলিবে।"

সুধীর একবার সন্দেশ মুখে দেয়, একবার শোভার মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, এবং কিয়ৎক্ষণ চক্ষু নত করিয়া কি ভাবে। এইরূপ কয়েকবার করিয়া সুধীর বলিয়া ফেলিল,—"আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি মনে হইতেছে।"

শোভা তাহার অনাবৃত মস্তক কিঞ্চিৎ অবগুণ্ঠিত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"স্বপনে নয় ত?"

সু। উঁহু, স্বপ্নে নয় জাগরণে।

শো। তবে বুঝি গাঁজা টানিয়া হৃদয়ের মধ্যে দেখিয়া থাকিবে।"

শোভার রসিকতা দেখিয়া আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মনে মনে বলিলাম, "বলিহারি বঙ্গবধূ! বাসরে ঢুকিলেই তোমাদের রসের অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী প্রকাশ্যে প্রবাহিত হইয়া পড়ে!"

সুধীর বলিল, "এই ছানাবড়ার সহিত আপনার মুখের স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।"

শোভা। কেন, আমার মুখখানা কি উহার মত গোল না চ্যাপ্টা?

সু। না, তা নয়, ছানাবড়াটার মতই আপনার মুখখানি সরস-মধুর। আপনাকে আমি চিনিয়াছি, কিন্তু আপনি এখানে আসিলেন কেমন করিয়া ভাবিয়া পাইতেছি না।

ধরা পড়িল দেখিয়া শোভা আর কথা কহিতে পারিল না; মাথায় অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া বাহিরে পলাইয়া আসিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গলা 'খেঁকারি' দিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। কয়েকটি তরুণী ভাল করিয়া ঘোমটা টানিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; কয়েকটি সুপক্ব যুবতী পূর্ব্ববৎ 'রিহার্সেল' দিতে লাগিলেন।

সুধীর আমাকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়া বলিল, "প্রিয় দা, তুমি এখানে?"

আমি বলিলাম—"তাই ত ভায়া, একলাই 'ছানাবড়া' গুলা পার করিলে?"

সু। তোমরা যুগলমূর্ত্তিতেই এখানে—ব্যাপারখানা কি?

আ। ব্যাপারখানা এই,—তোমরা ত নিমন্ত্রণ করিলে না! কাজেই শ্বশুরবাড়ী হইতে একটা নিমন্ত্রণ চাহিয়া লইলাম!

সু। কখন আসিলে?

আ। প্রাতে।

সু। তবে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে দেখা কর নাই কেন?

আ। কি জানি ভায়া, আমার সঙ্গে দেখা হইলে তোমার বিবাহ পণ্ড হইয়া যায়! শেষটা আবার একটা ঘাড়ে পড়িবে?

সু। তোমার কোন কথাই বুঝিতে পারিতেছি না।

আ। কথাটা প্রহেলিকাচ্ছন্ন। খুলিয়া না বলিলে বুঝিতে পারা কঠিন। শ্রীমতী বিভা, অর্থাৎ ত্বদীয় সদ্যোলব্ধা সহধর্ম্মিণী মদীয় পূর্ব্বালব্ধা শ্যালিকা, অর্থাৎ খুড়শ্বশুর নন্দিনী। বুঝিতে পারিলে কি?

সুধীর চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কি রকম খুড়শ্বশুর?"

আ। আপন খুড়শ্বশুর, ভায়া—আপন খুড়শ্বশুর; শ্বশুরের সহোদর ভ্রাতা! পিস্‌তুতো বা মাস্‌তুতো নহে। ত্যজ্যপুত্র হইবার ভয় হইতেছে না কি? না, ত্যক্তবধূ হইবে?"

মনে মনে বলিলাম,—"ভায়া, যে ফাঁসি গলায় পরাইয়াছি, সাধ্য কি ছিঁড়িয়া পালাও!"

সুধীর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—"দাদা, কাজটা ভাল হইল না।"

আমি বলিলাম, "বধূটি ভাল হইয়াছে ত?" তারপর গম্ভীর হইয়া বলিলাম—"ছিঃ—সুধীর, তুমি বড় কাপুরুষ, তোমার কিছু মাত্র সৎ-সাহস নাই।"

সু।—বাবার প্রকৃতি কি জান না?

আ। জানি; যে কল টিপিয়াছি, তিনি আর 'টু' শব্দটি করিতে পারিবেন না। তুমি দৃঢ়, নীরব এবং নিশ্চিন্ত থাক। আমি সমস্ত মীমাংসা করিয়া দিব। এই ব্যাপারে আমাদের উভয়ের মঙ্গল হইবে।"

সুধীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"আচ্ছা"।

পরদিন বিবাহ বিদায় হইল। আমরাও তাহার পরে রওনা হইলাম।

(৭)

সুধীরের 'বৌভাতের' দিন—পিতার ত্যজ্য-পুত্র-আমি বহুদিন পরে পিতৃগৃহে পদার্পণ করিলাম। মা ত আমাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া আকুল! বাবা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"অসময়ে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে, আর উপায় নাই।" আমি বলিলাম, "ঠিক সময়ে আসিয়াছি। আজ দশজনের সমক্ষে প্রমাণ করিব আমি ত্যজ্যপুত্র হইবার মত কোন কার্য্য করি নাই।"

মা—হাসিয়া-কাঁদিয়া বলিলেন,—"তাই কর্ বাবা!"

বাবা উদাসীন ভাবে বলিলেন,—"ভাল দেখা যাউক।"

আমি তখনি সুধীরদের বাড়ীতে উপস্থিত

হইলাম। দেখিলাম—স্থানীয় ও বিদেশীয় নিমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্বে বিবাহ বাটী পরিপূর্ণ। যাঁহারা আমাকে পিতার ত্যজ্যপুত্র বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহারা অদ্য আমাকে এই উৎসব-মণ্ডপে সহসা সমাগত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। জ্যেঠা মহাশয় আমাকে একটু সম্ভাষণও করিলেন না,—বিরক্তভাবে মুখ ফিরাইয়া লইলেন!

আমি সকলের প্রতি চাহিয়া বলিলাম,—"মহাশয়গণ, আপনারা বোধ হয় জানেন না—জ্যেঠামহাশয় সুধীরের বিবাহে বিষম প্রতারিত হইয়াছেন।"

সকলে সাশ্চর্য্যে সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন—"কিরকম? কিরকম?"

জ্যেঠামহাশয় ব্যস্তপদে আমার সম্মুখে আসিলেন।

আমি বলিলাম—"প্রথম দফা,—অলঙ্কারগুলি প্রকৃত স্বর্ণের নহে—কেমিকেল। অর্থাৎ গিল্টি।

তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারগুলি জ্যেঠামহাশয় কর্তৃক আনীত হইল। পরীক্ষায় বুঝা গেল,—আমার কথাই সত্য। জ্যেঠামহাশয় মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। রাগে দুঃখে যেন তাঁহার শরীর অবসন্ন হইল।

আমি বলিতে লাগিলাম, "দ্বিতীয় দফা, দান-পত্রখানির কোন মূল্য নাই, উহা প্রকৃত রেজেষ্টীকৃত নহে—জাল। তৃতীয় দফা, কন্যার পিতা গয়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার নহেন। তিনি কৃষ্ণনগরে 'প্র্যাক্‌টিস্' করেন। তাঁহার কন্যা একমাত্র বটে, কিন্তু পুত্র দুইটি, সুতরাং ভবিষ্যতে তাঁহার সম্পত্তির মালিক হইবার আশা কন্যার থাকিতে পারে না।—"

জ্যেঠামহাশয় অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িলেন। অবিশ্বাসমিশ্রিত তীব্র দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "আমি নালিশ করিয়া এ জুয়াচুরির দণ্ড দিব।"

আমি বলিলাম, "নালিশে প্রমাণ পাইবেন না। আপনাদের কাগজে-কলমে কিছু লেখা-পড়া নাই, বিশেষ সাক্ষীসাবুদও নাই। মুখে মুখে প্রস্তাব হইয়াছে মাত্র। সুতরাং মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।"

কিঞ্চিৎ থামিয়া, পরে বলিলাম, "আমার শেষ কথা শ্রবণ করুন। চতুর্থ দফা,—পাত্রী আমার শ্যালিকা, আমার শ্বশুরমহাশয়ের সহোদর ভ্রাতার কন্যা।"

জ্যেঠামহাশয় উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই উদ্ধত ছোক্‌রা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছে।"

আমি সব্যঙ্গ-বিনয়ে বলিলাম, "সত্যমিথ্যার পরীক্ষা এখনই আপনার পুত্রবধূ দ্বারা হইতে পারে, অথবা দুই দিন পরে আপনা-আপনিই হইবে। মহাশয়গণ, বিচার করিবেন, যে দোষে আমি ত্যজ্যপুত্র হইয়াছি, সেই দোষে সুধীরও ত্যজ্যপুত্র, নতুবা জ্যেঠা মহাশয় 'একঘরে' হইতে পারেন কি না!" সকলে স্তম্ভিত হইয়া পরস্পর 'মুখ-চাওয়াচায়ি' করিতে লাগিলেন। জ্যেঠামহাশয় অস্থির হইয়া পড়িলেন।

আমি বলিলাম,—"আপনারা চিন্তা করিবেন না, জেঠামহাশয়ও নিরাশ হইবেন না। উনি প্রকৃত ব্যাপার ব্যক্ত করিলেই সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায়।"

"বাড়ী হইতে আসিতেছি" বলিয়া জেঠামহাশয় চলিয়া গেলেন। তিনি কি জন্য বাড়ীর

ভিতর যাইতেছেন, আমার বুঝিতে বাকী রহিল না। পরে অপরেও তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন।

জ্যেঠামহাশয় প্রথমতঃ নববধূর নিকট গেলেন। তাহার মুখে যাহা যাহা শুনিলেন, তাহাতে আমার কথায় তাঁহার সন্দেহ থাকিল না। তারপর সুধীরকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বধূ ত্যাগ করিতে বলিলেন, অনেক জেদাজেদির পর সুধীর স্পষ্টাক্ষরে বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না।" আমি আগে হইতেই সুধীরকে 'গড়িয়া' রাখিয়াছিলাম। জ্যেঠামহাশয় তখন চারিদিকেই অন্ধকার দেখিলেন। প্রথমতঃ উপার্জ্জনক্ষম পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার ক্ষমতা তাঁহার মত অর্থগৃধ্নু লোকের থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এত উদ্যোগ-আয়োজন অর্থব্যয়, সমস্তই বিফল হয়,—তাহাও অসহ্য। অগত্যা নিরুপায় হইয়া তিনি বাহির্বাটীতে আসিলেন। এবং ব্যক্ত করিলেন যে, "প্রিয় যাহা যাহা বলিয়াছে, সমস্তই সত্য।" পরিশেষে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন—আমার শ্বশুরের পারিবারিক কুৎসাকাহিনী যাহা তাঁহার কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। টাকাকড়ি সম্বন্ধে 'বনিবনাও' না হওয়ায় এবং তাঁহারা অপমানসূচক কথা বলায় তিনি সেখানে পুত্রের বিবাহ না দিয়া ফিরিয়া আসেন।

জ্যেঠামহাশয়ের কথা সকলে বিশ্বাস করিল কি না বলিতে পারি না। বোধ হয় সকলে করিল না। করিতে পারেও না। কারণ সংসারে সরল ও সংশয়ী দুই শ্রেণীর লোক আছে। সরল লোকের বিশ্বাস সহজেই হয়; সংশয়ীর বিশ্বাস জাগান কঠিন। এ ক্ষেত্রে সংশয়ীর দল মনে করিতে পারে— 'চৌধুরী মহাশয় ঠেলায় পড়িয়া এখন কুৎসার কথা উল্টাইয়া লইতেছেন।" যাউক সংশয়ী লোকের কথা; তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরমা সাধ্বী সীতাদেবীর চরিত্রেও সন্দেহ করিয়াছিল।

গ্রামের মধ্যে কেবল আমাদের দুই সরিকের অবস্থা ভাল। আমরাই গ্রামের বনিয়াদি জমিদার। আমাদের দুই ঘরের যদি মতের সমতা থাকে, তাহা হইলে দুইটি দল গঠিত হইবার কোন সম্ভবনা থাকে না। এতদিন সে মতসাম্য ছিল না, তাই জ্যেঠামহাশয় দল পাকাইয়া, সমাজ চ্যুতির ভয় দেখাইয়া বাবাকে পুত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। আজ উভয়ে সমানপন্থী। লোকে ইহা বুঝিল। তাই সকলে সমস্বরে বলিল,—"যাহা হইবার হইয়াছে! এখন সকল গোলমাল মিটাইয়া ফেলানই ভাল।"

জ্যেঠামহাশয় সাহ্লাদে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না, মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক আহার করিতে চলুন। সমস্ত প্রস্তুত। বাবাজি, তুমিও এস" বলিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বিজেতৃগর্ব্বে—সকলের সহিত একস্থানে বসিয়া গেলাম, এবং চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি উপাদেয় পদার্থে উদর পূর্ত্তি করিয়া মনে মনে বলিলাম, "আজ আমার প্রতিজ্ঞা সার্থক হইল; উপযুক্ত প্রতিফল দিলাম।"

উপসংহারে বলিয়া রাখি, প্রতিফল প্রাপ্তির পর জ্যেঠামহাশয় কৃত্রিম অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে প্রকৃত স্বর্ণের অলঙ্কার ৮০০৲ টাকার

পাইয়াছিলেন এবং নগদও তাঁহাকে পাঁচ শত টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

শেষে সকলের কাছে আমাকে বিনীতভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছিল, জ্যেঠামহাশয়কে 'প্রতিফল' দিবার উদ্দেশ্যে আমাকেই আগাগোড়া ঐরূপ নির্দ্দোষ প্রতারণা বা ষড়যন্ত্র করিতে হইয়াছিল!

পিতা ও মাতার অনুমতি ক্রমে শোভাকে বাড়ী লইয়া আসিলাম। পাঠক, আমাকে স্ত্রৈণ বিবেচনা করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না, পাঠিকা, স্মিত-হাস্যে মুখ ঢাকিবেন না—বউ দেখিয়া মা ও বাবা উভয়েই একযোগে অনুতপ্ত স্বরে বলিয়াছিলেন, "এমন লক্ষ্মী-প্রতিমা এতদিন ঘরে আনি নাই!"

গোধন রক্ষা।

(১)

বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত গাভীকে হিন্দু জাতি অপূর্ব্ব "পবিত্র সম্পত্তি" (Sacred-possession) বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছেন। গাভীর যতগুলি প্রতিশব্দ আছে, তন্মধ্যে জননী, পালিকা, অন্ন্যা, প্রাণ, ধন, শোভা, লক্ষ্মী, প্রভৃতি পর্য্যায় প্রধান। গো ভিন্ন হিন্দুর একপদ চলিবার উপায় নাই; সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ পুণ্যক্রিয়ায় গাভীর অথবা গাভীজাত পদার্থের প্রয়োজন। যে কালে মুদ্রার প্রচলন ছিল না, সে সময়ে গাভী, বিনিময়ের অন্যতম উপায় ছিল। গাভী আমাদের প্রাণরক্ষয়িত্রী, গৃহলক্ষ্মী এবং শৈশবে সর্ব্বপ্রধান সহায়। গোহত্যার তুল্য অপরাধ আর নাই। গো জাতির রক্ষা ও প্রতিপালন সর্ব্বজাতীয় মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে ইহা অবশ্যকরণীয়। মনুসংহিতার ভুবন বিখ্যাত টীকাকার কল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন, যে গৃহে স্ত্রীলোক, বালক, বালিকা ও গাভীর আদর নাই, সে গৃহ কেবল সারমেয় ও শৃগালের বাসের উপযুক্ত। বিষ্ণুপুরাণের ঋষি বলেন, যে গৃহে গাভী নাই সে গৃহের শোভা নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু বিষম বিস্ময় ও বিষাদের বিষয় এই, যে দেশে গাভীর এত সম্মান ও প্রয়োজন, সে দেশে বর্ত্তমান যুগে বর্ষে বর্ষে, এমন কি মাসে মাসে, দিনে দিনে, লক্ষ লক্ষ গাভী এবং গোজাতীয় পশুর বিনাশ হইতেছে, অথচ তাহার প্রতিকারের আশু কোনই উপায় দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রকারেরা কহেন, যে দেশে এক শতাধিক গোহত্যা হইয়া গিয়াছে, সে দেশের মৃত্তিকা অশুদ্ধ; যে দেশে সহস্রাধিক গোবধ হয়, সে দেশের পানীয় জল অস্পৃশ্য; আর যে দেশে দশসহস্রের অধিক গাভী বা

গোজাতীয় পশুর বিনাশ হইয়া থাকে. সে দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে নাই, করিলে কোন ফল হয় না। তদ্ভিন্ন সে দেশে মূর্ত্তিপূজা, যাগ, যজ্ঞ, হোম, তপ, জপ, সঙ্কল্প প্রভৃতির বিধি নাই। এমন কি, সে দেশে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর মৃত্যু হইলে, তাহার মৃতদেহ দাহ করাও নিষিদ্ধ। এই জন্য পেশাওয়ার প্রদেশে হিন্দু মরিলে এখনও সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুরা এ পারে শব দাহ করে এবং শ্রাদ্ধাদিও এ পারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গাভী আমাদের প্রধান ধন; ইহার বিনাশে আমাদের বংশ বিনাশ হয়, প্রধান প্রধান খাদ্য হইতে আমরা বঞ্চিত হই এবং সমস্ত জাতি দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। গোধনের রক্ষা, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক কল্যাণের কারণ।

অনেকে অনুমান করেন, প্রাচীন কালে হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করিতেন। যজুর্ব্বেদান্তর্গত "অশ্বমেধং যজেৎ, গোমেধং যজেৎ" ইত্যাদি বচন তাঁহাদের উক্তির প্রমাণ। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদিতেও এরূপ কথা পড়িতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে গোমাংসের বর্ণনা ও প্রশংসা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সময়বিশেষে বা ক্রিয়াবিশেষে গোমাংসের প্রচলন ছিল ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও কোনকালে সমস্ত আর্য্যহিন্দু জাতি গোখাদক ছিল, ইহার অণুমাত্রও প্রমাণ নাই। বরং কোন কোন শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, গোমাংস ভক্ষণ করিয়া অশুদ্ধ হইলে পুনঃশুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য হিন্দুরা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন এবং তদ্দ্বারা খাদকের কায়া ও চিত্ত শুদ্ধ হইত। যাহাহউক, সেকালে যেরূপভাবে গোমাংস প্রচলন ছিল তাহা সমস্ত জাতিগত নহে, অথবা সখের ব্যাপার বলিয়া গণ্য ছিল না। এখনও বিলাত ফেরৎ অনেক বাঙ্গালী হিন্দুসন্তান গোমাংস ভক্ষণে এমন অভ্যস্ত যে গোমাংস খাইতে খাইতে অনেকে বাস্তবিক গো বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও দেখাইয়া দিতে পারা যায়। তাই বলিয়া কি সমস্ত বাঙ্গালী জাতিটা গোখাদক? পঞ্জাবের ক্ষত্রিয় ও সারস্বত ব্রাহ্মণ সমাজে মুর্গীমাংস এক প্রকার নিত্যভোজ্য দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে; মাদ্রাজ অঞ্চলে মুদালিয়র, পিলে প্রভৃতি উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা ঘরে ঘরে মোরগ ও মুর্গী পোষে এবং পাকশালায় নিত্য তরকারী রাঁধিয়া খায়। তাহারা "পতিত" বলিয়া গণ্য নহে, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সমস্ত দেশের হিন্দু জাতিকে মুর্গী খোর বলিতে পার না। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যেখানে গোমাংস না খাইলেও চলে, বা যাহাদের ভোজনক্রিয়া গোমাংস বিনাও সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহারা অকারণে কেন গরু খায় তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বঙ্গদেশের মুসলমান অথবা বাঙ্গালী খৃষ্টানেরা গো-মাংস না খাইয়া অতি সুখে দিনপাত করিতে পারে, এবং গো-মাংস না খাওয়া অধিকতর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর; তথাপি ইহাদের মধ্যে অকারণে গরুর মাংসের এত প্রচলন কেন, বুঝি না। ইহাতে সামাজিক অনিষ্টও যথেষ্ট আছে. কারণ গো মাংস-খাদক বাঙ্গালী খৃষ্টান ও বাঙ্গালী মুসলমান, কোন কাজে সহজে বাঙ্গালী হিন্দুর সহানুভূতির আশা করিতে পারেন না। তেলে ও জলে কি সহজে মিলে বা মিশে? প্রাচ্য দেশে

আচার, ব্যবহার, বিশেষতঃ খাদ্যাখাদ্য, লইয়াই সমাজের অর্দ্ধাংশ গঠিত হয়।

গাভীকুলের বিনাশে দুগ্ধের অপ্রচুরতা, দুগ্ধের অশুদ্ধতা, ঘৃতাদির অপ্রাপ্তি ও দুর্ম্মূল্যতা প্রভৃতির কথা এখন থাকুক ; আমাদের দেশে (ভারতবর্ষে) কত গাভীর হত্যা হয় তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। রোগে, সর্প দংশনে, অনাহারে, অযত্নে, হিংস্র পশু প্রভৃতির আক্রমণে কত গরু মরে তাহারও হিসাব এখন দিতেছি না, কেবল গো-খাদক দিগের উদর তৃপ্তির জন্য নিত্য নিত্য কত গরু কাটা যায় তাহার হিসাবটা পাঠ করিয়া বিস্মিত হউন। খাস বঙ্গদেশে অর্থাৎ কলিকাতার ছোটলাট বাহাদুরের শাসনাধীন রাজ্যে কোথায় কত গরু নিহত হয় সর্ব্বপ্রথমে তাহার তালিকা দিব। কলিকাতা (মায় সহরতলী), দমদমা, বারাকপুর, দানাপুর, হুগলী জেলান্তর্গত পাণ্ডুয়া (পেঁড়ো), পাটনা, মুর্শিদাবাদ এবং গয়া ও মুঙ্গের জেলার কোন কোন স্থলে, গোহত্যার প্রধান আড্ডা। ভারতবর্ষের যেথানে যেথানে দুর্গ (Fort) এবং ছাউনী বা ক্ষুদ্র সেনানিবাস (Cantonment) আছে, সেথানে গো-হত্যার বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। পাণ্ডুয়ায় সেনানিবাস নাই, ইহা একটি বৃহৎ গ্রাম মাত্র, হিন্দুর সংখ্যাও কম নহে, কিন্তু অনেক পূর্ব্বকাল হইতে এই মুসলমানপ্রধান গ্রামে গো-হত্যার ঘর ও হাট বাজার পর্য্যন্ত দেখা যায়। এখানে গো-মাংস ভক্ষণ না করিলে মুসলমানের কোনই ক্ষতি হয় না, কিন্তু মনুষ্য না কি অভ্যাসের দাস, তাই এখনও এই প্রথা সমভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই জন্ত গরিব মুসলমানদের মধ্যে কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। উপরিউক্ত কয়েকটি স্থানে গোহত্যার পরিমাণ দেখুন। (অন্যান্য স্থলের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।)

স্থান	হত গো-সংখ্যা
কলিকাতা (মায় সহরতলী)	৮২৮০
বারাকপুর	১০০০০
দমদম	৭২৭৭
দানাপুর	৮৫০০
পাণ্ডুয়া	৪০২
মুঙ্গের ও গয়া জেলা	৬০০০
পাটনা	৪০০০
মুর্শিদাবাদ জেলা	৭০০
মোট...	৪৫১৫৯

উপরে প্রদত্ত হিসাব, গড়ে বার্ষিক হিসাব; অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর ঐ সকল স্থানে ছিচল্লিশ সহস্র গোজাতীয় পশু হত হইয়া থাকে।

এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষের একটা মোটামুটি হিসাব দিতেছি। ইহাও গড়ে সম্বৎসরের হিসাব।

স্থান	গো সংখ্যা
খাষ বাঙ্গলা	৪৫১৫৯
পূর্ব্ববঙ্গ	৩০২২
আসাম	৯০৮
(পশ্চিমোত্তর প্রদেশান্তর্গত)	
আগ্রা	১১০০০
গোরখপুর	৪৭৬৬
জেলা ইটা	৩০৫৯
কানপুর	৯৬০২
ফররুখাবাদ	১০০০০
লক্ষ্ণৌ	১৩০০০
বেরেলী	৬৭০১

স্থান	সংখ্যা
পিলভিৎ	২০৭০
গাজিপুর জেলা	৩০১০
বুলন্দসহর	৯৮০
জৌনপুর ও আজমগড়	৫০০০
বেণারস	২০০০৯
চুনার জেলা	৩০৭৭
সাহারণপুর ও সাজাহানপুর	৯০০০
এলাহাবাদ	২১০৯২
(পঞ্জাব প্রদেশ মধ্যে)	
অম্বালা ছাউনী	৬০০০
পেশাওয়ার	৩৬০০০
লাহোর	২২০০০
রাউলপিণ্ডি	৩২০০০
বন্নু	৪০০০
মুলতান	৭০৮৭
(সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া বা মধ্যভারত)	
নওগাঁ	৮০০০
মৌ	১১০০০
(রাজপুতানা মধ্যে)	
টঙ্করাজ্য	২০১২
অপরাপর স্থান	১৭০০
আজমীর	৩০০০
বেয়াশ	৯০১
(বোম্বাই প্রদেশ)	
সিন্ধুরাজ্য	১২০০০
খাষকরাচি	৭০০
খাষ বোম্বাই	২১০০০
পুনা	১১০০০
অপরাপর স্থান	৯০০০
(মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি মধ্যে)	
ভেল্লোর	২০০০
মালবার উপকূল (বৃটিশ)	১৬০০
অপরাপর স্থান	১০০০
খাষ মাদ্রাজ নগর	১৯০০০
(দেশীয় রাজ্য এবং অন্যান্য)	
হায়দ্রাবাদ	১৩০০০
জুনাগড়	৯০০
রামপুর প্রদেশ	৮০১
মোরার	৪০০০
সেকেন্দ্রাবাদ	৬০০০
মধ্যপ্রদেশ	১১০৩
কাটিয়াবাড়	৯০০
মধ্যপ্রদেশ	১৪০০০
ভাওলপুর	২০০০
ঝিন্দ	২০০০
মহীসুর	১৮০০
বেরার	৭০৯
কোচিন	১০০০
মালাবার উপকূল (দেশীয়)	৬৬০০
প্রান্ত প্রদেশ	১৩০০০

আর অধিক হিসাব দিবার আবশ্যক নাই। কয়েকটা প্রধান আড্ডা মাত্রের হিসাব দিয়াছি। তদ্ভিন্ন অগণ্য আড্ডা আছে এবং গোরা সেনাদের খোরাক ব্যতীত অন্যান্য বহুবিধ কারণেও গোহত্যা হইয়া থাকে, তাহার হিসাব কে করিবে? * এখন ভাবিয়া দেখ, আমাদের

* এই হিসাবের জন্ত আমার ইউরেশীয়ান বন্ধু টমাশ ডি সুজা, ইসলাম বন্ধু মৌলবী হয়দর আলি (সৈয়দ) এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বন্ধু (কলিকাতার প্রসিদ্ধনামা) শ্রীযুক্ত আতর্থী মহাশয়গণের নিকট ঋণী আছি।

দেশে প্রতিবৎসর কত গরু ও গোজাতীয় পশুর ধ্বংস হইতেছে। প্রতিকারের কোন উপায় আছে কি?

— প্রতিকারের উপায় থাকিলে প্রতিকার হইত, কিন্তু তাহা নাই বলাই ভাল। আমরাও এক সময়ে গো-রক্ষার আন্দোলনে খুব মাতিয়া ছিলাম, কিন্তু স্পষ্ট কথায় বলা ভাল, বহুবর্ষের চেষ্টা ও পরিশ্রমের পরে আমরা নিরাশ হইয়া এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি। উপায় নাই বলাই ভাল। রাজার নিকট হইতে এ বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। রাজবিধি (আইন) করিয়া লওয়া সম্ভবপর নয়। কষ্ট দিয়া "জবাই" প্রথা দ্বারা গোবধ করাও তুমি নিষেধ করিতে পার না, কারণ তাহা আইনসিদ্ধ, মুসলমানদের ইহা দেশাচার, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনুকূল। "An Act for the prevention of cruelty to animals" (পশুর প্রতি অত্যাচার নিবারণ বিষয়ক আইন) নামে যে রাজবিধি আছে, তাহার গণ্ডীর মধ্যে "জবাই" প্রথা আসেনা, সুতরাং বধ-করাটা আসিতেই পারে না। ইহা আইন মতে অপরাধ বলিয়া গণ্য নয়। বিদেশী রাজা ও রাজপুরুষগণ, তাঁহাদের শাস্ত্র মতে, গো-মাংস ভক্ষণ বিহিত বলিয়া বিবেচনা করেন; এ বিষয়ে মুসলমান প্রভৃতি জাতি তাঁহাদের সহায়, সুতরাং হিন্দুর চীৎকার বৃথা বলিয়াই গণ্য করা উচিত।

তবে আমরা একটা কাজ করিলেও করিতে পারি। যাহাতে গোজাতির বল ও আয়ু বৃদ্ধি হয়, যাহাতে গোজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আমরা সে জন্য কিছু করিলেও করিতে পারি বোধ হয়। কিন্তু এদেশের লোক উত্তরোত্তর, কালপ্রভাবে, এতাদৃশ অকৃতজ্ঞ হইয়া পড়িতেছে যে, দুগ্ধ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, গাভীর দিকে আর যত্ন দৃষ্টিপাত করে না। একটি পয়সাও খরচ করিব না, অথচ প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পাইব, ইহাই অনেক অকৃতজ্ঞের কামনা। সমস্ত দিবস কৃষিক্ষেত্রে বলদেরা অস্থিমাংসভেদী পরিশ্রম করিয়া আসিল, কিন্তু রীতিমত খাইতে পাইল কি না তদ্বিষয়ে কয়জন গৃহস্থের দৃষ্টি থাকে? অকৃতজ্ঞতার পরিণাম চিরকালই অসুখদায়ক ও অশুভকর। ইংরেজি ভাষায় Breeding (বৃডিং) বলিয়া একটা শব্দ আছে। এই শব্দ প্রয়োগে পশুর রক্ষা, পালন, যত্ন, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বুঝায়। ইংলণ্ড, জার্ম্মণী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গোজাতীয় পশুর রীতিমত বৃডিং হইয়া থাকে। আমরা যত্ন করিলে আমরাও তাহা করিতে পারি। ইহাতে গোহত্যা বন্ধ হইবে না সত্য, কিন্তু পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং দুগ্ধের প্রচুরতা যে হইবে ইহা নিশ্চয়, সুতরাং দুগ্ধ ঘৃতাদির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

এদেশে রীতিমত বৃডিং প্রথা নাই, সাহেবেরা সম্প্রতি কোন কোন স্থানে এই অত্যাবশ্যকীয় প্রথার প্রচলন আরম্ভ করিয়াছেন। সাহেবদিগের সহায়তা ব্যতীতও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে ঐ প্রথার প্রবর্ত্তন হইতে আরব্ধ হইয়াছে দেখিয়া আমারা সুখানুভব করিলাম। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিসার নগরে, মধ্য প্রদেশে নাগোর সহরে, মুলতানের নিকট গুর্গায়রা গ্রামে, সিন্ধুপ্রদেশে, কাটিয়াবাড়ে, ভাগলপুর ও দার্জ্জিলিং পাহাড়ে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নেল্লোর নগরে, এবং মহীশূর প্রদেশে ভারতবর্ষীয়দিগের যত্নে বৃডিং প্রথার

হস্তগত হইয়াছে এবং ঐ সকল দেশে এখন উত্তম উত্তম বলদ ও গাভী পাওয়া যায়। বারান্তরে এই সকল স্থানের বৃডিং ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল। দেশীয় রাজ্যসমূহ মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর বরোদা, যোধপুর, যশলমীর, বিকানীর, নেপাল এবং ভাউনগরের গাভী ভাল, কিন্তু এ সকল রাজ্যে বৃডিং প্রথা নাই। (ক্রমশঃ)

দুরাশা।

—:o:—

যদি গুণ্ গুণ্ সুরে সাধিতে সাধিতে
মৃদু রাগ, ভাঙ্গা রাগিণী,
কভু মনে পড়ে গান, পারিবা বাঁধিতে
তোমারি পুণ্য কাহিনী

যদি শিশির পীড়নে অরুন কিরণে
আপন মাধুরী ফুটা'য়ে,
তব চরণের তলে, ছিঁড়ে দলে দলে
পারি কভু দিতে লুটায়ে,

যদি বিপুল জলধি বাহিতে বাহিতে
পাইগো কূলের কণিকা,
যদি মেঘের আঁধারে চাহিতে চাহিতে
নেহারি' সহসা ক্ষণিকা,

যদি কভু ঘুম ঘোরে দেখা দাও মোরে
স্বপন ছায়ায় আসিয়া,
তাই মুদিয়া নয়ান করেছি শয়ান
দুঃখ লই ভাল বাসিয়া।

আমি পাইবারে চাই ঘুরিতেছি তাই,
নাই পাইবার সাধনা,
চাই বহিয়া নিঝরে পশিতে সাগরে
সহিনি পাষাণ বেদনা।

যদি নাইবা পাইনু কিবা ক্ষতি তা'য়
প্রজাপতি মধু পায় না,
সে কি তবু ফুলি' ফুলি' আকুলি' বিকুলি'
ফুলে ফুলে গিয়ে গায় না।
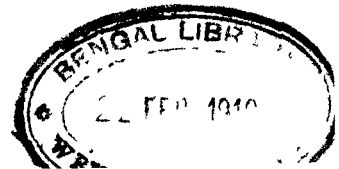
উপাসনা।

কর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচার।

(৬)

যোগ ও সগুণোপাসনা তত্ত্ব।

(৫) ঈশ্বরই ফলদাতা।

৫২। প্রকৃত প্রস্তাবে নাম ও রূপ যতই থাকুক, এবং ক্রিয়া ও ফলের প্রকারভেদ যতই থাকুক, ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই নহেন। যদি পৃথক্ পৃথক্ নাম ও ক্রিয়া অবলম্বনে ফলসঙ্গরহিত হইয়া উপাসক কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, অথবা যদি কেবল আত্মজ্ঞানী হইয়া জনসমাজের ধর্ম্মরক্ষার্থে নির্লিপ্তভাবে ক্রিয়া করেন, তবে সর্ব্বদেবতা স্থলে, একমাত্র মোক্ষস্বরূপে ব্রহ্মই দৃষ্ট হন। ভারতবর্ষের দেবতা জ্ঞান এইরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানও এইরূপ। ব্রহ্মই কামনাধিকারে ফলদাতারূপে ও সর্ব্বমন্ত্রময়রূপে, নানা দেবতা; কর্ম্মযোগাধিকারে যজ্ঞেশ্বর ও সগুণমোক্ষরূপে বিষ্ণু; আর সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারে মোক্ষস্বরূপে ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি দেবতারূপে "অন্য," আর মোক্ষরূপে "অনন্য" অর্থাৎ আত্মা। ব্যাসদেব শারীরকে কহিয়াছেন "নানা দেবতা পৃথক্ জ্ঞানাৎ।" পৃথক্ জ্ঞানই নানা দেবতার হেতু। তাহা বেদবিধি দ্বারা নিয়মিত। কিন্তু "নেহনানাস্তিকিঞ্চন" প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাতে নানাত্ব কিছুমাত্র নাই। এই অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড, এই অচিন্ত্যরচনা জীবরাজ্য, এই সমস্তই সেই একমাত্র প্রয়োজনবিজ্ঞবান ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিত্যকাল নিয়মিত। জীবের অদৃষ্ট, কর্ম্ম বা অপূর্ব্বরূপ হেতুই প্রয়োজন। এবং ঈশ্বর সেই প্রয়োজনের জ্ঞাতা এবং যথা যেমন প্রয়োজন তথা সেইরূপ বিধানকর্ত্তা। এক দিকে ঐশিশক্তিস্বরূপিণী পরমাপ্রকৃতির বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার হইতে জীবের উপার্জ্জিত কর্ম্ম বা অদৃষ্ট উপযাচক, অন্য দিকে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক ও বৈদিক নিয়ম তাহার উত্তরসাধক। ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিয়ন্তা। জীবের উপযাচন নানা, এবং সাকার ও সগুণ। প্রকৃতির উত্তরসাধনরূপ ফল সকলও

সেজন্য নানাবিধ, সাকারধর্মী এবং গুণপূর্ণ। ঈশ্বর, যিনি একমাত্র ফলদাতা ও উক্ত সাধ্য সাধনের নিয়ন্তা, তিনি সেই জন্য উক্ত ফলাধিকরণে নানাদেবতাস্বরূপ এবং সগুণ ও মূর্ত্তিবিশিষ্ট। কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জীবের ভাগ্য, প্রকৃতির ভাণ্ডার, এবং দেবপ্রসাদ একরাশিস্থ হয়। তাহাতেই ফলোৎপন্ন হয়। এস্থানে প্রশ্ন এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে কে ফল দেয়? কর্ম্মে ফল দেয়, প্রকৃতি ফল দেয়, না ঈশ্বর ফল দেন? ইহার উত্তর এই।

ফলমত উপপত্তেঃ। শ্রুতত্বাচ্চ। ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব। পূর্ব্বন্তুবাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ। (শারীরকে ৩।২।৮ম অধিঃ। ৩৮-৪১)।

ঈশ্বরই কর্ম্মের ফল দেন (কর্ম্ম শব্দে শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া। ঈশ্বর শব্দে উক্ত ক্রিয়াতে পূজিত দেবতারূপী ঈশ্বর)। বেদেতে শ্রুতি আছে ঈশ্বরই সর্ব্ব কর্ম্মের ফলদাতা। জৈমিনি কহেন শুভাশুভ ফল ঈশ্বর দেন এরূপ কহিলে ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ জন্মে, অতএব ধর্ম্মই ফল দেন। ধর্ম্ম শব্দে কর্ম্ম, অদৃষ্ট বা প্রকৃতি। কিন্তু ব্যাসের মত পূর্ব্বোক্ত—অর্থাৎ ঈশ্বরই ফল দেন। ফলে "হেতুব্যপদেশাৎ" পাপ পুণ্যরূপ হেতু অনুসারে। আচার্য্যদিগের পূর্ব্বপক্ষ—"কর্ম্মণো অপূর্ব্ব ব্যবধানেনাপি কালান্তরভাবি ফলদাতৃত্বসম্ভবাৎ ঈশ্বর কল্পনে গৌরবমিতি।" অপূর্ব্ব, কি না অদৃষ্ট ব্যবধানেতে কালান্তরভাবি ফলদান করা কর্ম্মেরই সম্ভব। অতএব ঈশ্বরকল্পনা গৌরবমাত্র। ইহার উত্তর এই যে, "অচেতনস্য কর্ম্মণোঽপূর্ব্বস্য বা তারতম্যেন প্রতিনিয়তং ফলং দাতুং ন সামর্থ্যমস্তি। অতঃ সেবিতরাজবৎ পূজিতেশ্বরাৎ ফলসিদ্ধিরভ্যুপেয়া, ন চ কল্পনাগৌরবং। শাস্ত্রসিদ্ধত্বেন ঈশ্বরস্য অকল্পনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মভিরারাধিত ঈশ্বরঃ ফলদাতা।" কর্ম্ম বা অপূর্ব্ব অচেতন। সুতরাং প্রতিনিয়ত তারতম্যরূপে ফলদান করিতে তাহাদিগের সামর্থ্য নাই। অতএব সেবিত রাজার ন্যায় পূজিত ঈশ্বর হইতে ফলসিদ্ধি স্বীকার করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। গৌরবার্থ ঈশ্বরকল্পনা নহে। অতএব কর্ম্মের আরাধনা করিলে ঈশ্বরই ফল দেন। কর্ম্ম, অদৃষ্ট বা প্রকৃতি এসবই অচেতন। সুতরাং প্রয়োজনানুসারে তারতম্যরূপে ফল দিতে পারে না। কিন্তু পাপপুণ্যরূপ হেতুর পরিমানানুসারে ঈশ্বরই ফলদাতা। এই সংসারস্থিতির হেতুস্বরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্ম ও ফলপরিবেষণরূপ তাহার উত্তর সাধন নিত্যকাল হইতে নিয়মবদ্ধ। কিন্তু "মায়িকত্বাত্তু ন বৈষম্যং" ঈশ্বরে বৈষম্য আরোপ করিও না। কেন না উপরে বলা গিয়াছে যে তিনি, যেমন পাপপুণ্য, যেমন কর্ম্ম, সেইরূপ ফল দেন। আর এখন কহিতেছেন যে, পাপ পুণ্য ফলাফল সমস্তই মায়াজন্য। জ্ঞানোদয়ে কর্ম্ম, কর্ম্মফল, দেবতা, মন্ত্র, সমস্তই বিনাশ পায়। একমাত্র পরব্রহ্ম সংস্বরূপ নিরঞ্জন জীবের পরমগতিস্বরূপে দৃষ্ট হয়েন।

এতাবতা দেবতারূপে ঈশ্বর ফল দিলেও ফলার্থ দেবপূজকের ঈশ্বরলাভ হয় না, কিন্তু ঐহিক সুখভোগ ও পরলোকে ঐসকল দেবতার লোকে বাস ও স্বর্গভোগ হয়। স্বর্গভোগান্তে এই মর্ত্ত্যপুরে অথবা অন্যলোকে পুনঃ শরীরধারণ হয়। কিন্তু "যেতু সর্ব্বদেবতাসু মামেব অন্তর্গামিনং পশ্যন্তো যজন্তি তেতু নাবর্ত্তন্তে"। যে ব্যক্তি ঐ সর্ব্বদেবতাতে ঈশ্বরের

অন্তর্ধামিত্ব দর্শনপূর্ব্বক, অর্থাৎ সর্ব্বদেবতাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জানিয়া ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যজিয়া, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করেন; সমস্ত যজ্ঞ, দেবোৎসব, ব্রত, অনশন, নিত্যসেবা, নিত্যকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ ঈশ্বরেরই উদ্দেশে, এই যোগবুদ্ধিতে ঈশ্বরার্থে তৎসমস্ত পালন করেন, তিনি ঈশ্বরেরই উপাসক। ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ফলকামনার অভাবহেতু তাঁহাকে আর অন্য দেবতার উপাসক বলা যায় না। তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতা, অগ্নিম্বাত্তাদি পিতৃগণ, এবং বিনায়ক মাতৃগণাদি সর্ব্বদেবতাই এক ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বর তাঁহাদের অন্তর্যামি। তিনি এইরূপ অপ্রতীক উপাসনার ফলে ব্রহ্মভুবনে স্থান লাভ করেন। ক্রিয়াযোগের এই মহাফল।

(৮) ঈশ্বরই সকল দেবতা।

৫৩। অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়াতে যজমানের মনে যে ফলকামনা থাকে তাহা স্বভাবের বেগমাত্র। কিন্তু বিধিবিহিত সংকল্পপাঠ তাহার স্থান গ্রহণ করে। অতঃপর ব্রহ্মার্পণও যথা যেমন বিধি সেইরূপে পঠিত হয়। অতএব সংকল্প ও অর্পণ উভয়ই ক্রিয়াবিধির অন্তর্গত আছে। তাহা পরে বুঝাইব। ফলে সকল দেবতাই ঈশ্বর এখন এই দৃঢ়বিশ্বাস প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মসেবীর হৃদয়ে বিরাজমান আছে। এই বিশ্বাসানুসারে এখন দুর্গা প্রভৃতি দেবীগণের, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবাদি দেবগণের এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারবৃন্দের মহাপূজা সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিই ক্রিয়াযোগের বিশুদ্ধ ও উন্নতভাব। ইহা কেবল মনোভাবমাত্র নহে। কিন্তু শাস্ত্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া এবং ভগবান ও ভগবতীতে বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে ক্রিয়াযোগ সার্থক হইয়াছে। কেবল ফলার্থ ক্রিয়া করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, এরূপ "অস্তিবাদশূন্য" যজমান্ দেখা যায় না। তবে অলস, বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সর্ব্বযুগেই আছে। তাহাদিগকে বিধি বা যোগ বা উভয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য।

৫৪। উপরিউক্ত ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণ একই ব্রহ্মের সংজ্ঞাভেদ মাত্র। তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র ও আচার-প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। এই বঙ্গদেশে এবং মিথিলাদি দেশে শ্রীসম্পন্ন সমস্ত ভদ্রগৃহে নিত্যসেবার নিমিত্তে শিবলিঙ্গ, শালগ্রামশিলা, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ, সীতারামের বিগ্রহ এবং কোন কোন গৃহে দশভুজা, অষ্টভুজা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবীগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদ্ভিন্ন কত তীর্থস্থানে ও মহৎলোকদিগের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য অসংখ্য দেবালয়ে কতই দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন। উপাসকেরা এই সমস্ত দেবদেবীকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। পাঠকদিগের ইহা যেন মনে থাকে, যে, আমরা এখনও পর্য্যন্ত ক্রিয়াযোগের কথাই বলিতেছি। ব্রহ্মজ্ঞানের কথা অথবা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনরূপ পরব্রহ্মোপাসনার কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, এই ক্রিয়াযোগ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের পরম্পরা হেতু; অথবা প্রতিবন্ধ না থাকিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হইতে পারে।—কর্ম্মযোগের অধিকারে এই সমস্ত দেবদেবীর উপাসনা, প্রেমভক্তিযুক্ত সগুণব্রহ্মোপাসনা মাত্র। সে উপাসনাকে অন্য

দেবতার পূজা বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই; অথবা সেই মূর্ত্তিসকল-উপলক্ষিত দেবতারা স্বতন্ত্র আধার এবং ব্রহ্ম তাঁহাদের অন্তর্যামি এরূপ দ্বৈধভাবেরও কোন কারণ নাই।

(১) কঠোপনিষদে কহেন—

যঃ পূর্ব্বন্তপসোজাতমভ্যঃ পূর্ব্বমজায়ত।
গুহাংপ্রবিশ্যতিষ্ঠন্তং যোভূতেভির্ব্যপশ্যত॥
এতদ্বৈতৎ। ৪। ৭।

ব্রহ্মের তপস্যাতে যিনি সর্ব্ব প্রথমেই জন্মিয়াছেন এবং পঞ্চভূতেরও পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, এমন যে সেই হিরণ্যগর্ভ আত্মা (অর্থাৎ ব্রহ্মা) তাঁহাকে যিনি সকল ভূতের শরীরের গুহাতে নিহিত করিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থ দেখেন। তিনিই সেই প্রকৃত ব্রহ্ম। (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, স্বয়ং ব্রহ্মই)

(২) মনু কহেন "তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা"। কুল্লূকভট্ট লেখেন "স্বয়ং পরমাত্মৈব হিরণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাদুর্ভূতঃ।" পরমাত্মাই স্বয়ং ব্রহ্মারূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অতএব ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মই। "আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ"। "ইন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বদেবতাঃ পরমাত্মৈব।" ব্রহ্মই ইন্দ্রাদি সর্ব্বদেবতা। "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং। ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণমপরে ব্রহ্মশাশ্বতং"। এই পরমাত্মাকে কেহ অগ্নি, কেহ মনু প্রজাপতি, কেহ ইন্দ্র, কেহ প্রাণ, কেহ সচ্চিদানন্দস্বরূপ সনাতন ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে। অতএব ব্রহ্মই সর্ব্বদেবতা। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতা অসিদ্ধ।

(৩) ব্যাসদেব শারীরকে কহিলেন। "ভূয়ঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি। ৩। ৩।৫৮। সকল গুণের প্রকাশের কর্ত্তা যে পরমেশ্বর তাঁহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ হয়, যেমন সকল কর্ম্মের মধ্যে যজ্ঞকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মানা যায়। এইরূপ বেদে দেখাইতেছেন। ৫৮। তবে নানা দেবতার উপাসনা কেন? তাহার উত্তর এই। "নানাশব্দাদিভেদাৎ"। ৫৯। পৃথক্ পৃথক্ অধিকারিরা পৃথক উপাসনা করে, যেহেতু বিদ্যার নানাত্ব এবং ব্রহ্মেরও গুণ সকল পৃথক্ পৃথক্। ৫৯। কিন্তু এককালে একজনই যে নানা উপাসনা করিবেক এমত নহে। "বিকল্পোবিশিষ্ট ফলত্বাৎ"। এই সূত্রটি ইষ্টদেবতার নিত্য সন্ধ্যাবন্দনরূপ উপাসনাবিধায়ক।

(৪) "ঈশসাক্ষাৎ কৃতেস্বেক বিদ্যয়ৈব প্রসিদ্ধিতঃ। অন্যানর্থক্যবিক্ষেপৌ বিকল্পস্য নিয়ামকৌ" (অধিকরণমালা)। উপাসনার প্রয়োজন ঈশ্বর সাক্ষাৎকার। তাহা একটি উপাসনাতেই সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ যে দেবতা যাঁহার ইষ্টদেবতা তাহারই অর্চ্চনায় ফলজনক হইতে পারে, কেন না তিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতা নহেন। তাহা সিদ্ধ হইলে আর আর উপাসনা অনর্থক হয়। এবং নানা উপাসনায় চিত্তবিক্ষেপ হওয়া সম্ভব। অতএব বিকল্পের নিয়মই কর্ত্তব্য।

(৫) ফলে ব্রহ্মই সর্ব্বদেবতা ইহাই সিদ্ধান্ত। বহুপ্রকার অধিকারীগণে পরিবৃত একই গৃহে নানা উপাসনার যে নিয়ম তাহা সাধারণতঃ সকলের প্রীত্যর্থে, কিন্তু একই ব্রহ্মের উপাসনামাত্র। "সর্ব্ববেদান্ত প্রত্যয়ং চোদনাদ্য বিশেষাৎ"।৩।৩।১। সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধ যে উপাসনা তাহা একই ব্রহ্মের। সেই ব্রহ্মের যত সংজ্ঞা আছে তাহা অবিভাগে তাঁহাকেই বুঝায়। "ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি"। যদি কহ বেদে কোথাও আত্মাকে, কোথাও কৃষ্ণকে, কোথাও

রুদ্রকে উপাসনা করিতে কহেন, অতএব এই ভেদকথনদ্বারা দেবতা ও উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমত নহে। নামের ভেদে উপাস্য ও উপাসনার ভেদ হয় না। অতএব কৃষ্ণও ব্রহ্ম, রুদ্রও ব্রহ্ম, এবং অন্যান্য উপাস্য দেবতাও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেবতা নাই।

(৬) "সলিল বচ্চ তন্নিয়মঃ" ৪। "নশাখা-ভেদাদুপাসনং ভিদ্যতে"। সমুদ্রেতে যেমন জল সকল প্রবেশ করে, সেই নিয়মে সকল উপাসনা ঈশ্বরেতে প্রবেশ করে। তন্ত্রে কহিলেন "যথাগচ্ছন্তিসরিতোঽবজেনাপি সরিৎ পতিং। তথার্চ্চাদীনিকর্ম্মাণি তদুদ্দেশ্যানি পার্ব্বতি"। যেমন নদী সকল স্বভাবতঃ সাগরে গমন করে সেইরূপ পূজা অর্চ্চা সকল, ব্রহ্মেরই উদ্দেশে গমন করে। "নৃণামেকোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণবইব"। পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব্বরাজ মহাদেবের স্তবে কহিলেন, হে মহাদেব! যেমন নানা-দেশের নদনদী সকল সাগরে সঙ্গমিত হয়, সেই রূপ নানা উপাসকগণের পক্ষে আপনিই এক-মাত্র গম্যস্থান।

অতএব এদেশীয় উপাসকবৃন্দ, সকল দেবতাকে যে ঈশ্বররূপে জ্ঞান করেন, তাহা শিষ্টাচার ও শাস্ত্রসিদ্ধ। রামায়ণ ও পুরাণ-শাস্ত্রে রামচন্দ্র ও কৃষ্ণবলরামের ব্রহ্মত্ব বিশেষ-রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রে ব্রহ্মরূপে তাঁহাদের পূজা হইয়া থাকে।

৫৫। দেবী, শিব, শালগ্রাম, বিষ্ণু, ও কৃষ্ণের পূজা সম্বন্ধে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রেই বিস্তারিত উপদেশ আছে। বিশেষতঃ দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী সরস্বতি ও সাবিত্রী প্রভৃতি মহা-শক্তিগণের উপাসনার নিয়ম, পদ্ধতি ও ফলশ্রুতিতে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র সকল পরিপূর্ণ। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মময়ী, নারায়ণী রূপে অর্চ্চনীয়া। তাঁহারা পরমাপ্রকৃতি ও মহামায়া নামে উক্ত হন। তাঁহারা স্বস্বরূপনামাত্মিকা মন্ত্রশক্তিরূপিণী। তাঁহারা সাধকগণের কামনা-নুসারে চতুর্ব্বর্গ ফলদান করেন। তন্ত্রশাস্ত্রের এবং তদুপকারী দেবীভাগবৎ ও চণ্ডিগ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মনোহর। তাহার পাঠ ও মন্ত্রশ্রবণে সাধকের হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হয়। তদ্বিহিত মন্ত্রময় ক্রিয়া, জপ, হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠানে গৃহস্থের ভবন পবিত্র হয়; এবং নৃত্যগীত বাদ্য, ব্রাহ্মণ ও কুমারিভোজন, দরিদ্রমণ্ডলে অন্নবস্ত্রাদি দান, ব্রত, অনশন প্রভৃতিদ্বারা গ্রাম নগরে মহানন্দ বিরাজ করে।

(৭) নিরবয়ব ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয় পূজা।

৫৬। ফলতঃ ক্রিয়াযোগের নিগূঢ় মর্ম্মের প্রতি একবার মনোযোগ করা উচিত। স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, কেবল ঈশ্বরার্থে যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি অনুষ্ঠান করাই ক্রিয়াযোগ। কিন্তু ক্রিয়াসমস্ত যথাশাস্ত্র দেবতা ও মন্ত্রময়, ক্রমবিহিত ও দ্রব্যময় থাকিবে এবং পুরোহিত দ্বারা অনুষ্ঠিত হইবে। কেবল তাহাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, অন্তর্যামিত্ব, ও অধিদৈবততত্ত্ব সংযুক্ত হইবে. ইহাই অভিপ্রায়। ফলে এ অভিপ্রায় কিজন্য। যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়ার যোগ পরিত্যাগ করিয়া একেবারে নিরবয়ব ঈশ্বরের পূজার বিধি দিলেই তো হইত। ইহার উত্তর এই যে, প্রথমতঃ সমস্ত ক্রিয়াই ঈশ্বরের উদ্দেশে এবং তাহাই শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাহাই সমুদয় ভারতবর্ষের সামাজিকধর্ম্ম এবং সর্ব্ববর্ণের সদাচার এবং ঐক্যবন্ধন। তাহা পরিত্যাগ করিলে কৃতনাশ

দোষ জন্মে এবং তৎপরিবর্ত্তে একেবারে নিরাকার ঈশ্বরের নিষ্ক্রিয় পূজা প্রবর্ত্ত করিলে অনধিকার ও অকৃতাভ্যাগমদোষ উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, ক্রিয়া সমস্ত শব্দব্রহ্মরূপিণী ঐশিশক্তি দ্বারা উপাসকদিগের প্রকৃতির উত্তরসাধক এবং তাহার মন্ত্র সকল এবং মন্ত্রাধিপতি দেবতা সকল ঈশ্বরের পরমা প্রকৃতিস্বরূপিণী শব্দব্রহ্মময়ী মহাশক্তির ব্যঞ্জক। যজমানের ফলকামনা না থাকিলেও মন্ত্র ও অর্থবাদের নিগূঢ়তত্ত্বস্বরূপিণী ঐ মহাশক্তি অলক্ষ্যভাবে তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। অতএব বুঝিয়া দেখ, ক্রিয়াযোগে ক্রিয়াব্যাপিনী ঐশিশক্তির সঙ্গে শক্তিমান্ ঈশ্বরের সংযোগ হইয়াছে। দিব্যচক্ষুতে দর্শন কর, এই মণিকাঞ্চনযোগ দেখিতে পাইবে। তথাপি ইচ্ছা হয় তো জিজ্ঞাসা করিতে পার। ঈশ্বরের শক্তি, যাহা সমস্ত ক্রিয়ার প্রাণস্বরূপিণী, তাহাতো ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে আবার ঈশ্বরের যোগ কেন? ইহার উত্তর এই যে, তোমার স্বার্থ, তোমার ফলাভিসন্ধি, অথবা তোমার বিধিকৈঙ্কর্য্য, তোমার মনোনেত্রে এমন এক সুখের অঞ্জন দিয়া দিয়াছে যে তুমি ক্রিয়ার অভ্যন্তরে বিরাজিনী দেবতা ও মন্ত্রময়ী মহাশক্তিকে আপনার অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতির মনোমোহিনী মূর্ত্তিরূপে দেখিতেছ। তুমি জাননা যে তোমার অবিদ্যারূপিণী ক্রিয়াময়ি প্রকৃতির সহিত ঈশ্বরের যোগ শাস্ত্রবিহিত নহে। কেবল শাস্ত্রীয় ক্রিয়াই যোগের গর্ভ। কিন্তু শাস্ত্র, তোমাকে এই অবিদ্যাস্বপ্ন হইতে জাগাইয়া ক্রিয়ার যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তোমার অবিদ্যাচ্ছন্ন মনের যে প্রকার ভাব তাহাতে তুমি মনে করিতে পার যে, তুমিই ক্রিয়ার জনক। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিও মনে করিতে পারেন যে, তোমার অবিদ্যালক্ষণা-প্রকৃতিরূপি স্বভাবদ্বারা তোমার ক্রিয়া বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। তোমার অবিদ্যালক্ষণা স্বভাবকে সংশোধনার্থে ক্রিয়ার বিধি। শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমস্ত ঈশ্বরপ্রেরিত। শুদ্ধ প্রেরিত নহে, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তিরূপিণী শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা শব্দব্রহ্মময়ী বৈদিকী ও তান্ত্রিকী প্রকৃতি দ্বারা তাহা বিরচিত। এবং তিনি তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে বর্ত্তমান, কেননা শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ নাই। শাস্ত্র, এই মহাযোগ বুঝাইয়া দিয়াছেন। ক্রিয়াতে ঈশ্বরের যোগ বলিয়া বুঝ, আর ক্রিয়ার উপাদানকারণস্বরূপিণী ঐ প্রকৃতিতে ঈশ্বরের যোগ বলিয়া বুঝ, সে একই কথা। কেননা, যজ্ঞ দেবার্চ্চনাদি যত ক্রিয়া আছে সবই উপাসনার অবলম্বন। যাহা কিছু সেরূপ অবলম্বন সবই ভগবানের শক্তিরূপিণী পরমাপ্রকৃতির পরিণাম। ভগবান তাহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। এই যোগ বুঝামাত্রে তোমার অবিদ্যা, সমস্ত কামনার সহিত নষ্ট হইয়া যাইবে। অথবা পূর্ব্বসুকৃতিবশে যদি অগ্রেই তোমার ফলকামনা যায় তবে তুমি ক্রিয়াতে, নিজ অবিদ্যা বা স্বভাবের পরিবর্ত্তে, ক্রিয়ার যথার্থ তত্ত্ব যে উপাদানরূপিণী নারায়ণী শক্তি তাঁহাকে যোগপ্রসবিনী মহাবিদ্যা ও শিবসমন্বিতরূপে একেবারেই দর্শন পাইবে।*

* স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রজাপতি দক্ষ যে তেরটি কন্যাকে ধর্ম্মকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি কন্যার নাম "ক্রিয়া"। তাঁহার পুত্রের নাম "যোগ" অর্থাৎ "কর্ম্মযোগ"। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কং।

৫৭। অতএব ক্রিয়াযোগের মর্ম্ম এরূপ নহে যে ক্রিয়া, ক্রিয়াসমবায়ী। নারায়ণী প্রকৃতি, মন্ত্র, ও দেবতা সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছেন। কেবল পূজার সময় ঈশ্বরকে অহ্বান করিয়া তৎসমস্তে যোগ করিয়া দিলাম, এবং সমস্ত ক্রিয়ার ফল, দেবতা ও ঈশ্বরে ভেদ দৃষ্টিতে, ঈশ্বরে অর্পণ করিলাম। অথবা এরূপও মর্ম্ম নহে যে, ক্রিয়ার মন্ত্রাধিপতি দেবগণ এবং উপাস্য ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণ, মন্ত্র ও অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের সহিত সর্ব্বশুদ্ধ জড়ধর্ম্মী; সেজন্য ঈশ্বরকে আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের অন্তর্যামিরূপে ভাবিয়া লইলাম। অতএব দৃঢ়তররূপে বুঝিয়া রাখ যে, ক্রিয়াযোগের মর্ম্ম এরূপ নহে। উহার নিশ্চিত মর্ম্ম এই যে, উপাস্য দেবদেবীগণ সকলেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বরী। কেবল তোমার মানসনয়ন হইতে প্রাগুক্ত অঞ্জনটি ধুইয়া ফেলিতে হইবে এইমাত্র প্রয়োজন। অর্থাৎ স্বার্থে না হইয়া ঈশ্বরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠিত হইবে। এ স্থানে "ঈশ্বর" শব্দ, সমস্ত অর্চ্চনীয় দেব দেবীর বোধক। সমস্ত শাস্ত্রেই গুহ্যতমরূপে ক্রিয়াযোগের এই পরমরহস্য উহ্য রহিয়াছে। যদিও গীতাতে স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরার্থে যুদ্ধরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম পালনের উপদেশ অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধক্রিয়া কোন দেবার্চ্চনারূপ যজ্ঞ নহে। ফলে, সেই উপলক্ষে যজ্ঞাদি ক্রিয়াযোগের যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার যাহা মর্ম্ম তাহা উপরিউক্ত ব্যাখ্যার অনুগত। কেবল "যেঽপ্যন্য দেবতাভক্তা" এবং "যে তু সর্ব্ব দেবতাসু মানেব অন্তর্যামিনঃ পশ্যন্তো যজন্তি তেতু না বর্ত্তন্তে" ইত্যাদি বাক্যে যদি কাহারও মনে দ্বৈধ জন্মে এই জন্য প্রসঙ্গাধীন এতদূর নিবেদন করিলাম।

৫৮। যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম প্রভৃতি সকল দেবগণই অবিভাগে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর মাত্র; এবং যখন দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাধা প্রভৃতি সমস্ত দেবীগণ অভিন্নরূপে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরী মাত্র; আর যখন উক্ত ঈশ্বরগণ একই শিবস্বরূপ এবং ঐ ঈশ্বরীগণ একই শক্তিস্বরূপিণী পরমাপ্রকৃতি; অতঃপর যখন শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, তখন সেই শিব ও শক্তি এক অদ্বৈততত্ত্ব ইহা মনে রাখিবে। যখন এই পরমতত্ত্ব অবধারিত হইল তখন "যোগ" অর্থাৎ "ক্রিয়াযোগ" শব্দ লইয়া আর বিচারের প্রয়োজন নাই। অতঃপর যখন শব্দব্রহ্ম ও মন্ত্রময়ী মহাশক্তি পরব্রহ্মেরই রূপবিশেষ, তখন সমস্তক্রিয়াই ব্রহ্মস্বরূপিণী। তাহাতে যোগ করিবার বা তাহা হইতে বিয়োগ করিবার কিছুই নাই।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

১। হ্যালির ধূমকেতু।

প্রাচীনকালে প্রায় সকল দেশেরই জনসাধারণ ধূমকেতুর উদয়কে অতি অমঙ্গলজনক ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। এই বৃহৎকায় জ্যোতিষ্কগুলি তাহাদের দীর্ঘপুচ্ছের সহিত রাজ্যবিপ্লব ও মহামারী প্রভৃতি নানা অনিষ্ট বহন করিয়া আনে বলিয়া অনেকেরই বিশ্বাস ছিল। কেহ কেহ ইহাদের সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণের আশঙ্কা করিয়া ভীত হইয়া পড়িতেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রের উন্নতির সহিত ধূমকেতুর গতিবিধি এবং গঠনোপাদান আবিষ্কৃত হওয়ার পর ঐ সকল কুসংস্কার অপনীত হইয়াছে।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন, ধূমকেতুর আকার খুব বৃহৎ হইলেও জিনিষটার গুরুত্ব খুব অধিক নয়। হাইড্রোজেন্ অঙ্গার প্রভৃতি পদার্থের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ডই ইহার প্রধান গঠনোপাদান। এই অতি ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলি পরস্পরকে ধাক্কা দিয়া উষ্ণ হইয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই আমরা সেই দহনাগ্নির আলোকে ধূমকেতুকে দেখিতে পাই। বুধ, বৃহস্পতি এবং চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহগণ যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত হইয়া আমাদের চক্ষুগোচর হয়, ধূমকেতুর আলোক সেপ্রকার নয়। ইহারা নিজেদের আলোকেই উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়ায়।

ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব জানা গিয়াছে। সৌরজগতের বহির্ভূত প্রদেশ হইতে ইহারা হঠাৎ সৌররাজ্যের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িলে সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা পড়িয়া যায়। তখন সূর্য্যের দিকে ছুটিয়া যাওয়া ব্যতীত তাহাদের আর অন্য উপায় থাকে না। এই প্রকারে চলিয়া ধূমকেতুগুলি একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ হইতে বাহির হইয়া যায়। সূর্য্যের আকর্ষণ ইহাদিগকে সৌরজগতে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এই সকল ধূমকেতু অধিবৃত্তাকার (Parabolic) পথে চলে। সুতরাং একবার সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করার পর ইহাদের আর দ্বিতীয়বার সৌরজগতে আগমনের সম্ভাবনা থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতুগুলি ছাড়া, আর এক শ্রেণীর ধূমকেতুর অস্তিত্ব আছে। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত ধূমকেতুগুলির ন্যায় হঠাৎ সৌরজগতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে, এবং প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া সৌরজগৎ হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ইহাদের থাকে না। কাজেই একবার সৌরজগতে প্রবেশ করিলে এই সকল জ্যোতিষ্ক চিরদিনের জন্য শৃঙ্খলিত হইয়া সৌরপরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে, এবং ঠিক গ্রহ উপগ্রহাদিরই

ন্যায় এক একটি বৃত্তাভাস (Elliptical) পথ অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্য প্রদক্ষিণ আরম্ভ করে।

প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করিতেন, সকল ধূমকেতুই অনুবৃত্তাকার পথ অবলম্বন করিয়া একবার মাত্র সৌরজগতে প্রবেশ করে, এবং তারপর সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া তাহারা চিরদিনের জন্য সৌররাজ্য ত্যাগ করিয়া যায়। গ্রহের ন্যায় বৃত্তাভাস পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনঃ পুনঃ সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করিতে পারে, তাহা ইঁহারা জানিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নিউটনের মধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছিলেন, ধূমকেতুর কক্ষা কেবল অনুবৃত্তাকার না হইয়া বৃত্তাভাসাকারও হইতে পারে। এই ব্যাপারটি জ্যোতিষিক গবেষণার এক নূতন পথ খুলিয়া দিয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদ্ হ্যালি (Halley) সাহেব জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রাচীন ইতিহাস খুলিয়া অতীত যুগের বহু ধূমকেতুগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি বৃত্তাভাস পথে ঘুরিয়া পুনঃ পুনঃ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তাহার গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে যে বৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, সেটি বৃত্তাভাসপথাবলম্বী বলিয়া ইঁহার মনে হইয়াছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া হিসাবে বসিয়া তিনি ধূমকেতুর পরিভ্রমণ পথ ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; এবং অতি প্রাচীনকালের ধূমকেতুগুলির বিবরণের সহিত তুলনা-করায় দেখা গিয়াছিল, ঠিক ১৬৮২ সালের ধূমকেতুর ন্যায় দুইটি ধূমকেতু ১৬০৭ ও ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর আকাশে উদিত হইয়াছিল। এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিনটি ধূমকেতু যে একই তাহাতে আর হ্যালি সাহেবের সন্দেহ ছিল না। নানা প্রকারে অনুসন্ধান করিয়া তিনি উহাদের ভ্রমণ পথেরও সম্পূর্ণ একতা দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর পরিভ্রমণ শেষ করিয়া এটি এক একবার সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় বলিয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল। হ্যালি সাহেব তাঁহার গণনার বিশেষ বিবরণসহ সিদ্ধান্তটি প্রচার করিয়া ঘোষণা করিলেন। ১৬৮২ সালের বৃহৎ ধূমকেতুটি ৭৫ বৎসরে তাহার বৃত্তাভাস কক্ষা পরিভ্রমণ করিয়া ১৭৫৭ বা ১৭৫৮ সালে নিশ্চয়ই আবার দেখা দিবে! এ পর্য্যন্ত কোন জ্যোতির্ব্বিদই জ্যোতিষিক ব্যাপারে এপ্রকার দৃঢ়তার সহিত কোন ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করিতে সাহস করেন নাই। জগতের পণ্ডিতসম্প্রদায় হ্যালি সাহেবের অসমসাহসিকতায় বিস্মিত হইয়াছিলেন।

হ্যালি সাহেব ১৭৪২ সালে ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন, কিন্তু তাঁহার ঘোষণাবাণী স্পষ্টাক্ষরে ভবিষ্যৎ জ্যোতিষিক ঘটনার তালিকায় লিপিবদ্ধ রহিয়া গেল। পরবংশের জ্যোতিষিগণ হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যৎবাণীর পরীক্ষার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে পরীক্ষার দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সুবিখ্যাত গণিতবিদ্ পণ্ডিত ক্লেরট্ (Clairaut) সাহেব হ্যালির গণনার পরীক্ষা করিতে বসিলেন। ইনি হিসাব করিয়া বলিলেন, হ্যালির ধূমকেতুটি যখন শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া আসিবে, তখন এই দুই জ্যোতিষ্কের প্রবল আকর্ষণে ইহাকে সম্ভবতঃ ছয় শত দিনের পথ পিছাইয়া থাকিতে

হইবে। এই হিসাবে ধূমকেতুটির উদয়কাল ১৭৫৯ সালের ১৫ই এপ্রিল নির্দ্দিষ্ট হইল।

১৭৫৮ সালের শীতের প্রারম্ভ হইতে নানা দেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ রাত্রির পর রাত্রি দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কত অনিদ্র রজনী কাটিয়া গেল, কিন্তু ধূমকেতুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শেষে হঠাৎ ২৫শে ডিসেম্বর দূরবীক্ষণে ইহাকে দেখিতে পাইয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হ্যালি সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়া গিয়াছিল!

পূর্ব্বোক্ত স্মরণীয় দিনের পর ৭৬ বৎসরে কক্ষা পরিভ্রমণ করিয়া হ্যালির ধূমকেতু ১৮৩৫ সালে একবার দেখা দিয়াছিল। আবার ইহার আর একটি পরিভ্রমণ কাল পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ হিসাব করিয়া বলিতেছেন, সম্ভবতঃ আগামী শীতকালের শেষেই ইহাকে ক্ষীণাকারে আকাশে দেখা যাইবে, এবং পুষ্টাবয়বসম্পন্ন হইতে তাহার পর দুই তিন মাস সময় লাগিবে।

গ্রহণ উপগ্রহণের সময় নিরূপণ এবং গ্রহ উপগ্রহাদির উদয়াস্তের কাল গণনা খুব কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু ধূমকেতু ঠিক্ কোন্‌দিন উদিত হইবে তাহার হিসাব করা বড়ই কঠিন। ইহাদের কক্ষা সাধারণ গ্রহকক্ষার ন্যায় এককেন্দ্রিক বৃত্তের ন্যায় সজ্জিত থাকে না। বৃহস্পতি এবং শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের কক্ষা ছেদ করিয়া, ইহারা প্রায়ই সৌরজগতের দূরতম গ্রহের অধিকারবহির্ভূত স্থানে গিয়া পৌঁছায়। সুতরাং ঐ সকল বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ধূমকেতুর নির্দ্দিষ্ট গতিতে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। ১৭৭৯ সালে একটি ধূমকেতু বৃহস্পতির নিকটবর্ত্তী হইয়া এত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেই অবধি তাহার আর সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। সুপ্রসিদ্ধ এন্‌কির (Encke) ধূমকেতুটিকেও জ্যোতির্বিদ্‌গণ বুধ বৃহস্পতির আকর্ষণে বিচিত্রগতিসম্পন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। হ্যালির ধূমকেতুটিকে শনি এবং বৃহস্পতি এই দুটি বৃহৎ গ্রহের কক্ষাভেদ করিয়া আসিতে হইবে। সুতরাং উহাদের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া এ'টি যে ঠিক্ কোন্ দিন দেখা দিবে তাহা হিসাব করা এক প্রকার অসম্ভব। এই শ্রেণীর ধূমকেতুর আবির্ভাবকালের একটা নিতান্ত মোটামুটি হিসাব দাঁড় করানো ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই।

হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাগমনের জন্য এখনো কয়েক মাস প্রতীক্ষা করিতে হইবে। প্রথমে এ'টি এত ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট হইয়া দেখা দিবে যে, বৃহৎ দূরবীন্ ও ফোটোগ্রাফের ছবি ব্যতীত ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ইহার পর সে'টি যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিবে, তাহার মুণ্ড ও পুচ্ছ ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই সময় ধূমকেতুটিকে দেখিবার জন্য দূরবীক্ষণের আবশ্যক হইবে না। অন্ততঃ দুই তিন মাস ধরিয়া ইহাকে নগ্নচক্ষুতে সুস্পষ্ট দেখা যাইবে।

শনি ও বৃহস্পতি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহগুলির আকর্ষণে ধূমকেতুটির কতকটা বিচলন সম্ভাবনা, ইতিমধ্যে নানাদেশের জ্যোতির্বিদ্‌গণ তাহার হিসাব আরম্ভ করিয়াছেন। কাওয়েল (Cowell) এবং ক্রমেলিন্ (Crommelin) নামক দুইজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ইতিমধ্যে, তাঁহাদের গণনা শেষও করিয়াছেন। ইহাদের

এষ্ট্রনমি সোসাইটির গত অধিবেশনে ইহাঁরা স্ব স্ব গণনার ফল প্রচার করিয়া বলিতেছেন, খুব সম্ভবতঃ আগামী ১৯১০ সালের ৮ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী হইবে। এখন এটি মৃগশিরা নক্ষত্রে (Orion) অবস্থান করিতেছে। কিন্তু এখনো ইহা পৃথিবী হইতে এতদূরে অবস্থিত যে, অবস্থান জানা থাকিলেও তাহাকে চাক্ষুষ দেখিবার উপায় নাই। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, সম্ভবতঃ আগামী নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের কোন সময় ধূমকেতুটি দূরবীণে ধরা দিবে। এই সময়ে ইহাকে বৃষরাশি হইতে মেষরাশির দিকে ধাবিত হইতে দেখা যাইবে।

২। অবসাদ নাশের নূতন উপায়।

সময়ে সময়ে দেহের নাইট্রোজেন্‌যুক্ত অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া যে হানিকর পদার্থ উৎপন্ন করে, তাহা নানা আকারে শরীর হইতে স্বভাবতঃই বাহির হইয়া যায়। এই ব্যবস্থা থাকায় ঐ বিষপদার্থ দেহের কোন অনিষ্টই করিতে পারে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জিনিষটা দেহে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া পড়ে যে, তখন স্বাভাবিক উপায় তাহাকে নিঃশেষে শরীর হইতে বাহির করিতে পারে না। কাজেই এই অবস্থায় প্রাণিদেহে নানা প্রকার ব্যাধিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

গত ১৮৮৭ সালে টিউরিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মসো (Mosso) সাহেব পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারটি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি দেখিয়াছিলেন, কঠোর পরিশ্রমের পর শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িলে যে সকল পীড়ার উৎপত্তি হয়, দৈহিক নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন পূর্ব্বোক্ত বিষময় পদার্থই তাহাদের মূল কারণ। শরীরকে শ্রান্ত করিলে ঐ পদার্থটি এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, স্বাভাবিক উপায়ে তাহা শরীর হইতে বাহির হইতে পারে না। কাজেই সেই বিষে রক্ত দূষিত হইয়া নানা প্রকার ব্যাধির সূচনা করে।

বহুক্ষণ তাড়া দিয়া শিকারীগণ যে সকল ক্লান্ত পশুপক্ষী বধ করে, তাহাদের মাংস আহার করিলে কখন কখন পীড়ার উৎপত্তি হয়। মসো সাহেব বলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে পশুপক্ষীর দেহে যে অবসাদজাত বিষপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা মৃত্যুর পরও দেহে থাকিয়া যায়। কাজেই সেই বিষযুক্ত মাংস আহার করিলে শরীর অসুস্থ হইবারই কথা। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেবিগ্ সাহেব এই প্রকার ভোজনবিভ্রাটের একটি উদাহরণ তাঁহার এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রাখিয়াছেন। একদল শিকারী কয়েকটি হরিণকে বহুক্ষণ তাড়াইয়া জালবদ্ধ করিয়া বধ করিয়াছিল। এই মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিয়া যখন শিকারীরা আমোদমত্ত, তখন হঠাৎ তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

মসো সাহেবের গবেষণার পর ডাক্তার ওয়েকার্ট (Dr. Weichart) অবসাদজাত বিষপ্রসঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। অবসন্ন প্রাণীর পেশীতে ইনি সত্যই একপ্রকার বিষের সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই বিষ সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি সুস্থ প্রাণীর রক্তের সহিত মিশ্রিত করায়, প্রত্যেকটিতে অবসাদের স্পষ্ট লক্ষণ একে একে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এবং

শেষে দুই একটি প্রাণীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়াছিল।

যে বিষ দেহস্থ হইলে পীড়ার উৎপত্তি করে, তাহা ক্রমশঃ অল্প মাত্রায় দেহস্থ করিতে থাকিলে, প্রায়ই সেই বিষের বিনাশক এক প্রকার পদার্থ (Antitoxine) স্বভাবতঃ শরীরে উৎপন্ন হইয়া বিষের ক্ষয় করিতে থাকে। কাজেই উহার অনিষ্টকারিতা এক প্রকার লোপ পাইয়া যায়, এবং পরে হঠাৎ কোন প্রকারে সেই বিষ দেহস্থ হইলে পূর্ব্ব-প্রস্তুত বিনাশক পদার্থ বিষের ক্ষয় করিতে থাকে। এই ব্যাপারটিকে অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আজকাল নানা প্রকার টিকা দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে।

ডাক্তার ওয়েকার্ট পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে অবসাদবিষ দ্বারা কতকগুলি ইতরপ্রাণীকে টিকা দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বসন্ত বা প্লেগের টিকা দিলে যেমন ঐ সকল ব্যাধির আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকা যায়, উক্ত প্রাণীগুলিও সেই প্রকারে অবসাদজাত সকল প্রকার উপদ্রব হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

সম্প্রতি জর্ম্মাণির কয়েকজন বৈজ্ঞানিক (Kalle and Co.) অবসাদবিষের সংহারক পদার্থটিকে (Antitoxine) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিবার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইঁহারা দেখিয়াছিলেন, আল্‌বুমিন (Albumin) নামক পদার্থের সহিত নাইট্রিক এসিড্ মিশাইয়া তাহাতে দশ ঘণ্টাকাল মৃদু উত্তাপ দিতে থাকিলে, মিশ্রিত পদার্থ দুইটির রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে অবিকল অবসাদবিষের অনুরূপ একটি পদার্থের উৎপত্তি হইয়া পড়ে। ইহার পরও তাপ দিতে থাকিলে, সেই বিষ বিযুক্ত হইয়া তাহারই সংহারক পদার্থটিকে উৎপন্ন করিতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ এই পদ্ধতিতে বিষঘ্ন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া, তাহা দ্বারা টিকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবসাদজাত বিষ দেহে উৎপন্ন হইবামাত্র, পূর্ব্বসঞ্চিত বিষঘ্ন পদার্থদ্বারা তাহা সম্পূর্ণ ক্ষয় পাইয়া এখন শরীরকে ব্যাধিমুক্ত রাখিতেছে।

৩। একটি নূতন গ্রহ।

একশত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি গ্রহের সহিত পরিচিত ছিলেন। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হার্শেল সাহেব স্বহস্তরচিত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইউরেনস্ গ্রহ আবিষ্কার করিলে গ্রহের সংখ্যা সাত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের এই আবিষ্কারের দিন অদ্যাপি জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটির পর বহুকাল আর নূতন গ্রহের আবিষ্কার সমাচার পাওয়া যায় নাই। সাতটি গ্রহ লইয়াই সৌরপরিবার গঠিত বলিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আর এক নূতন আবিষ্কারে সমগ্র জগৎ চমকিত হইয়াছিল। ইংরাজ জ্যোতিষী এডামস্ এবং ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভেরিয়ার (Leverrier) ইউরানস্ গ্রহকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষা হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া অপর একটি বৃহৎ গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়াছিলেন। পণ্ডিতদ্বয় একযোগে

গণনা আরম্ভ করেন নাই, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে গণনা করিয়া তাঁহারা একই ফল পাইয়াছিলেন। গণনার ফলের ঐক্য দেখিয়া তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন্‌দিন আকাশের কোন্ অংশে দূরবীক্ষণ লক্ষ্য করিলে নূতন গ্রহটির সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা স্পষ্টাক্ষরে উভয়েই বলিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৪৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আকাশের নির্দ্দিষ্ট অংশে দূরবীক্ষণ যোজনা করিয়া অষ্টমগ্রহ নেপ্‌চুন্‌কে দেখা গিয়াছিল। আধুনিক জ্যোতিষিক এই আর একটি স্মরণীয় দিন। আকাশ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া বা নক্ষত্রের ছবি না উঠাইয়া কেবল কাগজ কলমে এই প্রকার একটা বৃহৎ আবিষ্কার সুসম্পন্ন করা যে সম্ভবপর, ইহার পূর্ব্বে কোন পণ্ডিতই তাহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

নেপ্‌চুন আবিষ্কারের পর এপর্য্যন্ত আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষার মধ্যে থাকিয়া যে সকল ক্ষুদ্রগ্রহ (Asteroids) সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে, আধুনিক বৃহৎ বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কেবল তাহাদেরই অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতকগুলি নূতন নক্ষত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল আবিষ্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৃহৎ দূরবীন ও ফটোগ্রাফের ছবিই আবিষ্কারকদিগের একমাত্র অবলম্বন। যে প্রথায় নেপ্‌চুন্ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত কোন জ্যোতিষিকই সে প্রথায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

সম্প্রতি আমেরিকার হারভার্ড (Harvard) মানমন্দিরের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী অধ্যাপক পিকারিং সাহেব আর একটি নূতন গ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন। এই গ্রহটি নেপ্‌চুন হইতেও অনেক দূরে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে গ্রহটি আকাশের কোন্ অংশে অবস্থান করিবে, পিকারিং সাহেব তাহাও গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইঁহার এই গণনার ফল সত্য হইলে বর্ত্তমান যুগের একটি বৃহৎ আবিষ্কার সাধিত হইবে।

পিকারিং সাহেবের গণনার আমূল বৃত্তান্ত আজও প্রকাশিত হয় নাই। শীঘ্রই হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণীতে ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিখ্যাত ক্রন্ দূরবীন্ দ্বারা ছবি তুলিয়া ইতিমধ্যে নূতন গ্রহটির সন্ধান আরম্ভ হইয়াছে এবং জগতের প্রধান প্রধান মানমন্দিরের জ্যোতিষিগণ ইহার অনুসন্ধানের আয়োজন করিতেছেন।*

---

* Harvard College Observatory Circular No. 144.

বেদ অপৌরুষেয় নহে।

—★—

এই প্রবন্ধে আমরা বেদের কথা বলিব। বেদের কি কথা বলিব? বেদ "পৌরুষেয়" কি "অপৌরুষেয়," নিত্য কি অনিত্য, ও বেদ শব্দের ব্যাপ্তিব্যাপকতা ও নিদান কি? কিরূপে বেদের উৎপত্তি ও বিভাগ হইয়াছিল, বেদের প্রথম ও শেষবিভাগকর্তা বা সংস্কর্তা কে? চারি বেদের প্রথম বিভাগকর্ত্তাই বা কে ছিলেন? বেদের বয়ঃক্রম কত? ত্রয়ী কত কালের? অথর্ববেদ কত দিনের? কোন্ বেদ আদি বা জগতের আদি গ্রন্থ? ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎসমূহ বেদ বা শ্রুতিপদবাচ্য বটে কি না? বেদের প্রথম ব্যাখ্যা গ্রন্থ কি? কোন্ কোন্ ব্যক্তি বেদ ও উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন? ঐ সকল ভাষ্য কতদূর প্রামাণ্য? বেদের প্রাতিশাখ্যগুলি কি জিনিষ? বেদের ছয়টি অঙ্গ কি কি? নিরুক্তকারগণের ব্যাখ্যা সাধীয়সী, কি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিকগণের বিবৃতি সাধীয়সী, বাইবেল ও বেদের মধ্যে কেই বা প্রাচীন ও কেই বা অর্ব্বাচীন? পুরাণসমূহ বাইবেলের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বটে কি না? আমরা এই প্রকরণে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। বিষয় অতি গুরুতর, কাজেই প্রবীণগণ—

সহসা বিদধীত ন ক্রিয়া-
মবিবেকঃ পরমাপদাম্পদম্।

কোন স্বার্থসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদিগের কথায় সহসা অনাস্থা বা আস্থা প্রদর্শন করিবেন না। অভিনিবেশসহকারে সমুদায় ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আমরা সম্প্রতি বেদ পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, নিত্য কি অনিত্য, প্রণীত কি অপ্রণীত, এই বিষয় লইয়া দু চার কথা বলিতেছি।

বেদ কাহাকে কহে? বিদ ল জ্ঞানে বেত্তি জানাতি পুরাতত্ত্বাদিকমনেন ইতি বিদ্ ধাতোঃ কর্ম্মনি অল্ বেদঃ। অর্থাৎ যাহা পাঠ করিলে পূর্ব্বকালের বিবরণ, অর্থাৎ প্রাচীনতম যুগের লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি, কার্য্যাকার্য্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ঈশ্বর, সৃষ্টি ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীণ বিবরণ জানা যায়, তাহারই নাম বেদ। বেদে যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে জড় ও নরোপাসনা, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এবং ঈশ্বরের সত্তার অনুভব ও মাহাত্ম্যের কথা বিবৃত আছে, তেমনই ইহাতে তদানীন্তন মানব নিচয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ঐতিহ্য তত্ত্বও বিরাজ করিতেছে।

অবশ্য গগনমেদিনী বিকম্পিত করিয়া বিতর্ক হইবে যে, "সে কি কথা, বেদ যে অনাদি ও অপৌরুষেয় নিত্য পদার্থ? ইহা যে কেবল ভগবদ্বদনবিনিঃসৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব লইয়াই প্রাদুর্ভূত। ইহাতে আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য মানুষের আপৎ, বিপৎ, সম্পৎ ও সুখদুঃখের অতি ক্ষুদ্র ঐতিহ্যতত্ত্ব বিজড়িত থাকিবে কেন?

তস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ

বেদকদম্বক যে সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানেরই একমাত্র নিঃশ্বসিতবিশেষ! ইহাতে আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জড়নরের কথা বা তাহাদের উপাসনার বিষয়ই বা আসিবে কোথা হইতে?

বিতর্কের একটা দিক্ এইরূপই বটে। বেদে ইতিহাসের অধিগম কেন হইবে? বেদে কেন সাধারণ ঘরকন্নার কথাও স্থান পাইবে? ভক্তিপ্রবণ প্রত্যেক ব্যক্তির মনে আপাততঃ যে এইরূপ একটা সংস্কার আসিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিবে, ইহা ধ্রুবই। কিন্তু যাঁহারা অভিনিবেশসহকারে প্রকৃত পদার্থগ্রহের সহিত প্রসন্নমনে স্বাধীনচিত্তে একতানহৃদয়ে বেদসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছেন, বেদ বা শ্রুতিসম্বন্ধে একমাত্র শ্রৌত জ্ঞানই যাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল নহে, যাঁহারা মহাত্মা জৈমিনী বিরচিত মীমাংসা দর্শন ও ন্যায়মালাবিস্তর গ্রন্থ অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন করিয়া উহার সারসমাহারে সমর্থ হইয়াছেন, বাল্য কুসংস্কার ও জড়তা যাঁহাদিগের আত্মাকে জড়ীভূত ও শৃঙ্খলিত করিতে সমর্থ হয় নাই, তাঁহারা কখনই মনে একথা স্থান দিতে পারিবেন না যে, বেদ বা শ্রুতি-কদম্বক নিত্য বা অনাদি এবং তৎসমুদয় একমাত্র অধ্যাত্মতত্ত্বেরই নিদানভূমি, কিংবা শুক্লাবদাত অনবদ্য ভগবদ্বাণী। অবশ্য খৃষ্টান বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে,—

Bible is the word of God.

তাঁহাদিগেরই ঈশ্বর কেবল তাঁহাদিগেরই জন্য হিব্রু বা গ্রীকভাষাতে বাইবেল রচনা করিয়া দিয়াছেন এবং মুসলমানেরাও সর্ব্বান্তঃকরণে মনে স্থান দিয়া থাকেন যে তাঁহাদিগের পবিত্র কোরাণ গ্রন্থ একমাত্র খোদার কলম বা একমাত্র ভগবদ্বাণীবিলসিত ঐশ্বরিক বস্তু, এবং উহা মহান্ ঈশ্বর হইতেই সমাগত, হিন্দুগণও সেই মান্ধাতার আমল হইতে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে—

বেদো হরের্ব্বাক্ সাবিত্রী
বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা।
কল্কিপুরাণম্।

তাঁহাদিগের বেদসমূহ তাঁহাদিগের নিজস্ব পরমেশ্বর হরি বা বিষ্ণুর বাণীবিশেষ এবং সাবিত্রী বা গায়ত্রী বেদের মাতৃস্বরূপা। কিন্তু বস্তুতই কি এ কথাগুলি সত্য-সত্যই সত্য যে বাইবেল ও বেদপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র সাধারণনিয়ন্তা জগতের সাধারণ পিতা পরমেশ্বরের বাণী বা নিঃশ্বসিতবিশেষ? বস্তুতই কি সেই পরব্রহ্ম হইতে—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥
৯—৯০সূ—১০ মণ্ডল।

না, ইহা কখনই সত্য কথা নহে যে, সেই পরমেশ্বর হইতে সাম, ঋক ও যজুঃ সমূহের উৎপত্তি হইয়াছিল। ফলতঃ এই বৈদিক মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য যে, সেই যজ্ঞের জন্যই সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসমূহ নানা ছন্দোবন্ধে তদানীন্তন ঋষিগণকর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।

উক্তঞ্চ—

বেদাহি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ
কালানুপূর্ব্ব্যা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।

কেবল জ্যোতিষ নহে, হরিবংশও বলিয়াছেন—

"ঋচো যজূংষি সামানি নির্ম্মমে যজ্ঞসিদ্ধয়ে"।

কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বা পরমেশ্বর হইতে কোন বেদ সমাগত হয় নাই। বায়ুপুরাণ যে বলিয়াছেন ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ এবং বায়ু অগ্নি ও জল সেই অবিনাশী মহেশ্বর হইতে সমাগত, তাহাও ভক্তি ভিন্ন যুক্তির কথা নহে। যথা—

ঋচো যজূংষি সামানি,
বায়ুরগ্নিস্তথা জলং।২
অক্ষরাৎ নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে,
দেবদেবাৎ মহেশ্বরাৎ॥ ৫-৩২অ

ফলতঃ "Bible is the word of God" এবং "বেদো হরের্ব্বাক্," ইহা ভক্তগণের মনের আবেগের একটা অবাধ বিস্ফুরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ঈশ্বর এক, মানুষ এক, সেই একই ঈশ্বর তাঁহার একই সন্তান মানবজাতির জন্য তিনটি পৃথক্ ভাষায় পরস্পর বিসংবাদবাদী তিন খানি, অথবা জেন্দাভেস্তা লইয়া চারি খানি, পৃথক্ ধর্ম্মগ্রন্থের সৃজন বা প্রচার করিবেন, ইহা হইতেই পারে না। কেবল তাহাও নহে, যে সকল বর্বরজাতি অদ্যাপি কোন ভাষা বা সাহিত্যের ধার ধারে নাই, ভগবান্ যে তাহাদিগকে আমাদের সহিত জল, বায়ু, অগ্নি ও চন্দ্রসূর্য্যাদি সম্বন্ধে তুল্য ফলভাগী করিয়াও কেবল ধর্ম্মগ্রন্থসম্বন্ধে বঞ্চিত করিবেন, যুক্তি ইহারও সমর্থন করে না। ফলতঃ ঈশ্বর কাহারও জন্য কোন ধর্ম্মপুস্তক করেন নাই। করিলে তাহা সকলের পক্ষে সাধারণ সাবভৌম বস্তু হইতে। বাইবেল ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে বিবৃত আছে, জগতের সমগ্র নরনারী একদিন এক ভাষা-ভাষী ছিল, (আমরা মনে করি, সমগ্র নহে, কেবল আর্য্যজাতি এক ভাষা-ভাষী ছিলেন, সে ভাষার নাম গীর্বাণবাণী সংস্কৃতভাষা)। ঈশ্বরের তেমন প্রয়োজন হইলে তিনি সেই সংস্কৃত ভাষায় কেবল এক খানি ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া সাধারণের জন্য প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ হিন্দুজাতি ভিন্ন আর কাহারও নয়নগোচর হয় নাই, এদেশে ইংরাজ না আসিলে বোধ হয় অদ্যাপি ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার কিংবা এশিয়ার অন্যান্য দেশের লোক বেদের নাম পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর করিতেন না। ঈশ্বর একদেশদর্শী কিংবা পক্ষপাতপ্রবণ নহেন। তিনি যে তাঁহার দয়া হইতে সকলকে বঞ্চিত করিয়া কেবল একটি চিহ্নিত জাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমরা জগতে কি দেখিতেছি? আমরা কি দেখিতেছি যে ভগবান্ এই তিন চারি ধর্ম্মাবলম্বীর নিমিত্ত পৃথক তিনটি সূর্য্য, (যাহার একটির গলায় পৈতা, একটির মাথায় টুপী ও আর একটি হ্যাটকোটপরা) পৃথক তিনটি চন্দ্র, পৃথক তিন প্রকার বায়ু, জল, অগ্নি, ও পৃথক পৃথক খাদ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন? যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নরনারীকে একই সাধারণ বস্তুদ্বারা লালনপালন করিতে সমর্থ, তিনি কি তাহাদিগকে এক খানি সার্বভৌম বিশ্বজনীন সাধারণ ধর্ম্মগ্রন্থ দান করিয়া নিয়মিত রাখিতে পারিতেন না? গীতার ভগবান্ কৃষ্ণ যেমন তাঁহার প্রতি অভ্যসূয়াকারী লোকদিগকে তাঁহার বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত রাখিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, বাইবেলের গড যেমন কেবল তাঁহার ইস্রায়েল

জাতিকেই বিশেষ স্নেহ করিতেন, আমাদের সাধারণ বিশ্বপতি ভগবানও কি তদ্রূপ জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য কেবল বিশেষত্বের আশ্রয় করিতে পারেন? সৃষ্টির কি লক্ষ লক্ষ বৎসর পরেই আংশিক উন্নতির যুগে (যাহাকে সত্যযুগ বলে) মানুষের হৃদয়কন্দর হইতে শনৈঃ শনৈঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিসংবাদ বাহী নানা ঐতিহ্য তত্ত্বমন্থর এই সকল বেদ-মন্ত্রের সৃষ্টি বা প্রণয়ন হয় নাই?"

অবশ্য বেদ যে জগতের মধ্যে অতি প্রাচীনতম বস্তু, তাহা সর্ব্বথাই স্বীকৃত সত্য। এবং কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি য়িহুদি, কি পার্শি, কি খৃষ্টান, সকলেরই আদি সাধারণ পৈতৃক সম্পত্তি, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি কি বেদকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? যদি বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বা তদ্বিসৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি কেন আবার উহার পঞ্চাশ কি অন্ততঃ বিশ সহস্র বৎসর পরে বাইবেলের সৃষ্টি করিলেন? তিনি কি তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের প্রথম সংস্করণে নানা ভুল ভ্রান্তি দেখিতে পাইয়া তাহার সংশোধন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাইবেলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? এবং উক্ত বাইবেলেও ভ্রান্তি-প্রমাদ আছে জানিয়া আজ বার তের শত বৎসর হইল কোরাণের প্রণয়ন করিয়াছেন? ফলতঃ মানুষের যদি কোন ঐশ্বরিক ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজন থাকিত, তাহা হইলে, অনন্তশক্তি কালত্রয়দর্শী ভূমা মহেশ্বর চন্দ্রসূর্য্যাদির ন্যায় সৃষ্টির প্রথমেই উহার সৃজন বা প্রণয়ন করিয়া জগতের কোন প্রকাশ্য চৌমাথায় উহা লটকাইয়া রাখিতেন। যাহাতে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, এই চারি মহা জনপদ ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা উহা তুল্যভাবে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইত। আরও আশ্চর্য্য এই যে পরমেশ্বর যাহা কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ এই এসিয়ার জন্যই রচনা করিলেন, অন্য মহাদেশবাসীরা যেন তাঁহার কেহই নয়, আর দশ বা একুশবার যে খন্তা কুড়ুল লইয়া অবতীর্ণ হইলেন, তাহাও এই আলোকের দেশ এশিয়াতেই!!! ফলতঃ কি বেদ, কি বাই-বেল, ইত্যাদি কোন গ্রন্থই নিরপরাধ ঈশ্বরের প্রণীত নহে। তিনি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে, তাহা সৃষ্টির প্রথমেই করিতেন। বেদ-সৃষ্টির পূর্ব্বে কোটি কোটি লোক যে নরহত্যা, নরমাংস ভোজন, ব্যভিচার ও নানারূপ পাপ তাপ করিয়া নরকে গিয়াছে, তাহার জন্য কি ঈশ্বরের কোন চিন্তা ছিলনা? তাহারা কেন বেদ বাইবেল ও কোরাণাদি পাঠের সুখসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইল? অপিচ বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত নহে, তাহার ইহাই এক প্রধান ও জলন্ত প্রমাণ যে, বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে নানা জলন্ত বিসংবাদ বিরাজমান।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

ইহা ভারতভূষা বেদবিভাগকর্ত্তা, সুতরাং বেদের বিশেষতত্ত্বজ্ঞ, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিজের কথা। তিনি বলিতেছেন যে বেদ সকল ভিন্নমতবাহী। উহাদের কাহারও সহিত কাহারও সমতা নাই। স্মৃতি সকলও পরস্পর দ্বৈধীভাবাপন্ন, মুনিদিগের মধ্যেও কাহারও সহিত কাহারও ঐকমত্য দেখা

যায় না, ধর্ম্মের তত্ত্ব সকলও যেন গুহার অন্তস্তলে বিনিহিত। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্থির করা কঠিন যে, কোন্ মত ও কোন্ পথ অবলম্বনীয়। কাজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই একমাত্র পন্থা। যদি বল পরমেশ্বর প্রথমে সামবেদের প্রণয়ন করেন, পরে উহাতে ভুলভ্রান্তি দেখিয়া ঋগ্‌বেদ রচনা করেন, ক্রমে তৃতীয় সংস্করণে যজুঃ ও চতুর্থ সংস্করণে অথর্ব্ববেদের সমাগম ঘটিয়াছে, তাহা হইলে তাহাতেও ঈশ্বরে নানা দোষাশঙ্কা ঘটিয়া উঠে। অপিচ বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে কতিপয় মন্ত্রের একতা ভিন্ন আর কোন সাগন্ধ্যই বিদ্যমান নাই, সুতরাং এই চারিখানি বেদকে কখন এক কারিকরের হাতের জিনিষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। বাইবেল ও কোরাণের ন্যায় বেদচতুষ্টয়ও অপর চারিজন পরমেশ্বর রচনা করিয়াছেন, ইহাও যখন মনে করা যায় না, তখন বেদ ঈশ্বর প্রণীত নহে, ইহাই প্রকৃত কথা। বলিবে, তাহা হইলে কেন মহর্ষি পরাশর বলিলেন যে—

"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ
বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ॥" ২০—১অ

বেদের কেহ প্রণেতা নাই, উহা অপৌরুষেয়, চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাও উহার রচয়িতা নহেন, তিনিও উহার স্মরণকর্ত্তা মাত্র। হাঁ, পরাশর ইহা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা তাঁহার ভক্তির কথা ভিন্ন কাজের কথা নহে। আর চতুর্ম্মুখ উপাধিমান্ উত্তরকুরুপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা বেদের স্রষ্টা একবারেই নহেন, ইহাও আমরা সত্য বলিয়া মনে করি না। কেননা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিরাও বহু বেদমন্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছেন, স্বয়ং তিনি এবং তাঁহার মাতা অদিতি, ভ্রাতা ইন্দ্র, ত্বষ্টা ও বরুণ প্রভৃতিও বেদমন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি সত্য হইতে দ্বাপরযুগের শেষপর্য্যন্তও নানা ঋষি নানা মন্ত্রের প্রণয়ন করেন, তাই বেদমন্ত্র সকল কচিৎ বৈদিক সংস্কৃতবহুল, কচিৎ বা লৌকিক সংস্কৃতপ্রধান। ঐ সকল বেদমন্ত্র সমাহৃত ও গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়াই ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব বেদের দেহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অবশ্য মহামতি যাস্ক, পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ, ঋষির্দর্শনাৎ

ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র, তাঁহারা ঈশ্বর-কৃত মন্ত্র দেখিয়াছেন, তাই তাহাদের নাম ঋষি। এবং উপমন্যুতনয় মহর্ষি ঔপমন্যবও বলিয়া গিয়াছেন যে—

স্তোমান্ দদর্শ ইতি ঋষিঃ

ঋষিরা স্তোম বা মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাই তাঁহাদের নাম ঋষি। কিন্তু যাস্ক ও ঔপমন্যবের এ ধারণা অদোষসমাঘ্রাত নহে। অবশ্য কতক-গুলি বেদমন্ত্র এরূপ রহিয়াছে যে উহাদের কে প্রণেতা, তাহা কেহ অবগত নহেন। ঐ সকল মন্ত্র সমাহর্ত্তা ঋষিদিগের নামেই সংসূচিত হইয়াছে। যেমন—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

এই মন্ত্রের সমাহর্ত্তা বা দ্রষ্টার নাম মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয় মহর্ষি মধুচ্ছন্দাঃ। এই মন্ত্রের প্রণেতা কে, তাহা তৎকালে বিদিত ছিল না। এখন যেমন আমরা নিজ দোষে বহু উদ্ভটশ্লোকের কে প্রণেতা, তাহা অবগত নহি, তদ্রূপ তৎকালেও তদানীন্তন সামা-

জিকগণের অনবধানতা বা ঔদাসীন্য বশতঃ যথাসময়ে মন্ত্রপ্রণেতার নাম লিখিয়া বা শিখিয়া না রাখাতে কালে প্রণেতার নাম লোকে ভুলিয়া গিয়াছেন। তথাপি, কোন উদ্ভট শ্লোকের প্রণেতা যেমন অবশ্য কোন মানুষই বটেন, তেমনই কোন বৈদিকমন্ত্রের প্রণেতার নাম জানা না গেলেও তাহা মানুষ ঋষি কেহ রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও লওয়া কর্ত্তব্য।

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ

যেমন ধূমদর্শনে অনুমানের সাহায্যে তথায় বহ্নির অনুমান করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ অনুমান বলেই মনে করিয়া লইতে হইবে যে কোন না কোন ঋষিই মন্ত্রপ্রণেতা বটেন। অথবা কেবল অনুমান নহে, প্রত্যেক বেদেই এমন কতকগুলি মন্ত্র রহিয়াছে, যাহাতে তন্মন্ত্রপ্রণেতার নামও তৎসহ অনুস্যূত রহিয়াছে। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থন জন্য এখানে কতিপয় বেদমন্ত্রের সমাহার করিব। যদস্তি সামবেদে—

১। তং ত্বা গোপবনো গিরা
জনিষ্ঠং অগ্নে অঙ্গিরঃ।
স পাবক শ্রুধী হবম্। ৯—১৪পৃঃ।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অথ নবমী—গোপবন ঋষিঃ। হে অগ্নে, তং ত্বা ত্বাং গোপবন ঋষিঃ গিরা স্তুত্যা জনিষ্ঠং জনয়ন্তি বর্দ্ধয়তি স্তূয়মানা হি দেবতা বর্দ্ধন্তে তাদৃশাগ্নে! অঙ্গিরঃ সর্ব্বত্র গন্তঃ। অঙ্গিরসাং পুত্রো বা হে পাবক শোধক গোপবনস হবম্ আহ্বানং শ্রুধি শৃণু।

২। নি ত্বা মগ্নে মনুর্দধে
জ্যোতির্জনায় শশ্বতে।
দীদেথ কণ্ব ঋতজাত
উক্ষিতো যং নমস্যন্তি কৃষ্টয়ঃ॥
১০-২৭ পৃষ্ঠা।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অথ দশমী - কণ্ব ঋষিঃ। হে অগ্নে! জ্যোতিঃ প্রকাশরূপং শশ্বতে বহুবিধায় যজমানায় মনুঃ প্রজাপতিঃ নিদধে দেবযজনদেশে স্থাপিতবান্। হে অগ্নে ত্বং ঋতজাতঃ ঋতেন যজ্ঞেন নিমিত্ত ভূতেন উৎপন্নঃ উক্ষিতঃ হবির্ভিঃ তর্পিতঃ সন্ কণ্বে এতন্নামকে মহর্ষৌ ময়ি দীদেথ দীপ্তবান্ অসি যম্ অগ্নিং কৃষ্টয়ঃ মনুষ্যাঃ নমস্যন্তি নমস্কুর্বন্তি স ত্বমিতি পূর্ব্বত্রান্বয়ঃ।

৩। স্তোমং তে ইন্দ্র
বিমদা অজীজনন্।
৬-২৩ সূ—১০ম

তত্র সায়ণঃ—হে ইন্দ্র! তে তুভ্যং বিমদা বিমদনামানো বয়ং স্তোমং স্তোত্রবিশেষম্ অজীজনন্ জনিতবন্তঃ কৃতবন্তঃ।

৪। এতানি বা মশ্বিনা বর্দ্ধনানি,
ব্রহ্ম স্তোমং গৃৎসমদাসো অক্রন্।
৮-৪০সূ—২ম।

তত্র সায়ণঃ—হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ বাং যুবয়োঃ এতানি বর্দ্ধনানি বৃদ্ধিসাধনানি ব্রহ্ম ব্রহ্মাণি মন্ত্রান্ স্তোমং স্তোত্রঞ্চ গৃৎসমদাসঃ গৃৎসমদা অক্রন্ অকুর্ব্বন্।

৫। এষ বঃ স্তোমো মরুত
ইয়ং গীর্মান্দার্য্যস্য
মান্যস্য কারোঃ।
১৫-১৬৫সূ—১ম।

হে মরুদগণ! আমি মন্দারতনয় স্তোতা মান্যঋষি, আমার এই স্তুতিবাক্য ও স্তোত্র, তোমাদিগের জন্যই।

৫। অগ্নয়ে ব্রহ্ম ঋভব স্ততক্ষুঃ।

৭-৮০সূ—১০ম।

অপগস্থানবাসী সুধন্বার পুত্রগণের সংজ্ঞা ঋভু। ঋভুগণ শিল্পী ছিলেন। তাঁহারা গুণমাহাত্ম্যে মনুষ্য হইয়াও পরে দেবত্ব লাভ করেন। তাঁহারাও অগ্নির উপাসক ছিলেন, এবং অগ্নির স্তুতির নিমিত্ত ব্রহ্ম বা বেদমন্ত্র সকল রচনা করেন।

৬। অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোমো
বিপ্রেভি রাসয়া অকারি।

১-২০সূ—১ম।

তত্র সায়ণঃ—ঋভবোহি মনুষ্যাঃ সন্তঃ তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ। তে চ অত্র সূক্তে দেবতাঃ। জন্মনে জায়মানায় ঋভুসঙ্ঘ-রূপায় দেবায় তৎপ্রীত্যর্থং অয়ং স্তোমঃ (বেদমন্ত্রঃ) বিপ্রেভিঃ মেধাবিভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ আসয়া স্বকীয়েন আস্যেন অকারি নিষ্পাদিতঃ।

৭। যুবভ্যাম্ ইন্দ্রাগ্নী স্তোমং
জনয়ামি নব্যম্। ২-১০৯সূ—১ম

অঙ্গিরার পুত্র কুৎসঋষি বলিতেছেন, হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আমি তোমাদিগের জন্য এই নূতন মন্ত্র রচনা করিতেছি।

৮। মিমীহি শ্লোক মাস্যে
গায় গায়ত্র মুক্‌থম্।

১৪-৩৮সূ—১ম।

তত্র সায়ণঃ—হে ঋত্বিক্‌সমূহ! আস্যে স্বকীয় মুখে শ্লোকং স্তোত্রং মিমীহি নির্ম্মিতং কুরু। গায়ত্রং গায় পঠ।

৯। তৎ বাং নরা শংসং,
পজ্রিয়েণ কক্ষীবতা নাসত্যা।

৬-১১৭সূ—১ম।

তত্র সায়ণঃ—হে নরা নেতারৌ নাসত্যৌ অশ্বিনৌ পজ্রিয়েণ পজ্রাণাং অঙ্গিরসাং কুলে জাতেন কক্ষীবতা ময়া বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধি তৎ কর্ম্ম শংস্যম্।

১০। যুবাং হ ঘোষা পর্য্যশ্বিনী যতী
রাজ্ঞ উচে দুহিতা পৃচ্ছে বাং নরা॥

৫-৪০সূ—১০ম।

তত্র সায়ণঃ—হে নরা নেতারৌ অশ্বিনৌ যুবাং হ খলু পরি পরিতো যতী গচ্ছন্তী রাজ্ঞঃ কক্ষীবতো দুহিতা পুত্রী ঘোষা ঘোষাখ্যা অহ্ন্যুচে।

১১। অগ্নে ব্রতপতে ব্রত
মচারিষং তদশকং,
তন্মে অরাধি। ইদমহং
যত্রবাস্মি সোঽস্মি।

২৮-২অ—২৬ক। শুক্লযজুঃ।

তত্র মহীধরঃ—হে অগ্নে! হে ব্রতপতে! কর্ম্মপালক। ব্রত মচারিষং কর্ম্ম অনুষ্ঠিতবান্ অস্মি তৎ অশকং শকিতবান্। ত্বৎপ্রসাদাৎ তৎকর্ম্মশক্তঃ অভবম্ ত্বয়া চ তৎ মে মদীয়ং কর্ম্ম অরাধি সাধিতম্। হে অগ্নে! ইদং কর্ম্ম সমাপ্য যোঽহং কর্ম্মণঃ পুরা অস্মি স এব মনুষ্যঃ অস্মি।

১২। সোমানং স্বরণং কৃণুহি
ব্রহ্মণস্পতে! কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥

২৮-৩অ—২৭ক।

হে ব্রহ্মণস্পতে! উশিজ পুত্র কক্ষীবান্, সোমাভিষবকারী আমাকে তুমি তোমার স্তোত্রপাঠে সমর্থ কর।

আমরা উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তাহাতে জানা যাইতেছে যে; মহর্ষি গোপবন, কণ্ব, বিমদ, গৃৎসমদ, মান্য, ঋভুগণ, বিপ্রগণ, কুৎস, পারশব শূদ্র কক্ষীবান্, তৎ-

কন্যা ঘোষা, এবং অজ্ঞাতনামা ঐরূপ কোন মনুষ্য ঋষি যে এই সকল মন্ত্রের প্রণেতা তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে মন্ত্রপ্রণেতা আরও বহু ঋষির নাম উক্ত মন্ত্রেই বিধৃত রহিয়াছে, আমরা বাহুল্যভয়ে ও নিষ্প্রয়োজনবোধে তৎসমুদায় মন্ত্রের সমাহার করিলাম না। ফলতঃ "আমরা ইন্দ্রের জন্য এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছি" "তোমরা মুখে মুখে বেদমন্ত্র রচনা কর" এই সকল কথা দ্বারা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, এই সকল মন্ত্র একমাত্র মনুষ্যবিরচিত। অবশ্য ঋগ্বেদের একত্র রহিয়াছে—

সূক্তবাকং প্রথমমাদিৎ
অগ্নিমাদিং হবিরজনয়ন্ত দেবাঃ।
স তেষাং যজ্ঞো অভবং তনুপাঃ,
তং দ্যৌ র্বেদ তং পৃথিবী তমাপঃ॥
৮—৮৮সূ—১০ম।

অর্থাৎ, সকলের আদিতে সর্ব্বপ্রথম দেবগণই "সূক্তবাক" বা বেদমন্ত্রসমূহের প্রণয়ন, অগ্নির উৎপাদন ও ঘৃত প্রস্তুত করেন। সেই নব প্রজ্বালিত অগ্নিই সেই মহাহিমানীনিপীড়িত দেবগণের তনুরক্ষাকারী ও প্রথম উপাস্য (যজ্ঞ-যজনীয়) দেবতা হইয়াছিল। সেই অগ্নিকে স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও অপগস্থানবাসী লোকেরা অবগত আছেন।

কিন্তু এই দেবগণ যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ও আমাদিগের ন্যায় জননমরণশীল মানুষ ছিলেন, দেবতা শব্দ যে বিদ্বান্ ব্যক্তির উপাধিবিশেষ (বিদ্বাংশো বৈ দেবাঃ—ইতি শতপথ ব্রাহ্মণঃ), তাহা আমরা "দেবতা ও মানুষ একই" এই প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছি। সুতরাং কোন বেদের কোন মন্ত্রই মানুষ ভিন্ন ভূমা মহেশ্বর প্রণীত নহে ও তাহা হইতেও পারে না। বায়ুপুরাণও বলিয়াছেন—

বেদাঃ সপ্তর্ষিভিঃ প্রোক্তাঃ
ধর্ম্মশাস্ত্রং মনুর্জ্জগৌ।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতাঃ ও বশিষ্ঠপ্রভৃতি সপ্ত ঋষিকর্ত্তৃক বেদমন্ত্র সকল কথিত। আর ধর্ম্মশাস্ত্র বা স্মৃতিসংহিতার প্রণেতা মহর্ষি মনু বটেন।

ফলতঃ কেবল শাস্ত্রবাক্য নহে, যুক্তিও এ কথার সমর্থন করে না যে, স্বয়ং পরমেশ্বর কাহারও বেদ, বাইবেল রচনা করিয়া দিয়া থাকেন। আর বেদ সকল যেরূপ ভ্রান্তি ও প্রমাদ এবং সংশয় ও জিজ্ঞাসাভূয়িষ্ঠ, তাহাতেও এই সকল গ্রন্থ, স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর প্রণীত দূরে থাকুক, ইহা কোন অভ্রান্ত মনুষ্যের রচনা বলিয়াও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থনজন্য এখানে ঋগ্বেদহইতে দুইটি ভ্রান্তির উল্লেখ করিতেছি।

উদগাৎ অয়মাদিত্যো
বিশ্বেন সহসা সহ।*
১০—১৫০সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অয়ং পুরোবর্ত্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্।

এখানে ঋষি যে শূন্যবিহারী জড়সূর্য্যকে অদিতিনন্দন আদিত্য বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন, ইহা ভ্রান্তির কার্য্য হইয়াছে। কেননা শূন্যবিহারী জ্যোতির্ম্ময় জড়পিণ্ড ও কশ্যপাত্মজ অদিতিনন্দনবিশেষের যুগপৎ "সূর্য্য" নাম হইলেও জড়সূর্য্যকে কোন কারণে আদিত্য বা

* অথর্ব্ববেদে এই মন্ত্রটি ভিন্নাকারে বর্ত্তমান। তথায় আদিত্য অর্থ অদিতিনন্দন মানুষ সূর্য্য করা যায়।

কাশ্যপেয় বলা যাইতে পারে না। ধাতা (সুর-জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা), বরুণ, ত্বষ্টা, ভগ, অর্য্যমা, ইন্দ্র, মিত্র, সূর্য্য, বিবস্বান্, সবিতা, পূষা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ ভ্রাতা, অদিতিগর্ভজ বলিয়া দ্বাদশ আদিত্য নামের বিষয়ীভূত।

ধাতা মিত্রোঽর্য্যমাইন্দ্রো,
বরুণঃ সূর্য্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ
সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা
বিষ্ণুর্দ্দাদশ উচ্যতে॥ প্রাঞ্চঃ।

অন্যথা আকাশের জড়সূর্য্য ও আদিত্য এবং মহাপ্রলয়কালে আকাশে দ্বাদশ আদিত্য বা বারটা সূর্য্যের উদয় হইবে, ইহা মুখর পৌরাণিকগণের মুখরব ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা যে—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্য-
পেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

বলিয়া জড়সূর্য্যকে কাশ্যপেয়নামে সম্ভাষিত করিয়া থাক, ইহাও জলন্ত ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। আকাশের সূর্য্যের সহিত মনুর পৌত্র কশ্যপের কি তোয়াক্কা আছে বল? বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা
যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবী
মন্তরিক্ষ মথো স্বঃ॥ ৩-১৯০সূ-১০ম।

অর্থাৎ ধাতা পরমেশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় এই যুগেও নূতন চন্দ্র, সূর্য্য, দিব্ বা ব্রহ্মার স্বর্গ ও ভূ র্ভুবঃ স্বঃ, ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহাও ভ্রান্তির কথা হইল। কেননা আমরা যে পৃথিবী ও চন্দ্রসূর্য্যাদি দেখিতেছি, ইহারাই ঈশ্বরের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত অক্ষতভাবে বিরাজ করিতেছে। কোন মহাপ্রলয় হইয়া একযুগের বিধ্বংস ঘটিয়া পরে নূতন যুগের আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহা পৌরাণিক ভ্রান্তি। তাহা হইলে ত্রেতাযুগের বিভীষণ কেমন করিয়া কলিযুগের রাজসূয়যজ্ঞে আগমন করিলেন? দ্বাপরযুগের মানুষ কৃষ্ণ, ব্যাস ও যুধিষ্ঠিরাদিই বা কেমন করিয়া কলিযুগেও বর্ত্তমান থাকিলেন? পক্ষান্তরে দেখ বেদই বলিতেছেন যে—

সকৃৎ হ দ্যৌ রজায়ত,
সকৃৎ ভূমি রজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়ঃ,
তদন্যো নানুজায়তে॥
২২—৪৮সূ—৬ম।

তত্র সায়ণভাষ্যং—সকৃৎ হ সকৃদেব দ্যৌঃ অজায়ত উদপদ্যত সকৃদুৎপন্না এব স্থিতা ভবতি। ন পুনঃ তস্যাং নষ্টায়াম্ অন্যা তৎসদৃশী দ্যৌঃ জায়তে। ভূমিশ্চ সকৃদেব অজায়ত। পৃশ্ন্যাঃ মরুতাং মাতুঃ গোঃ পয়শ্চ সকৃৎ একবারমেব দুগ্ধং। যথা দ্যাবাপৃথিব্যৌ সকৃদেব উৎপদ্যেতে, এবং পৃশ্নিরপি সকৃৎ। ততঃ পরম্ অন্যঃ পদার্থঃ ন অনুজায়তে তৎসদৃশো ন উৎপদ্যতে।

অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ, এই তিন লোকের একবারমাত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সৃষ্টির পর আর অন্য কোন পদার্থের নূতন সৃষ্টি হয় নাই।

এই বেদমন্ত্রটি বৈদিক সংস্কৃতে বিরচিত, আর পূর্ব্বমন্ত্রটি পৌরাণিকযুগের লৌকিক

সংস্কৃতে বিরচিত। সায়ণ যে ভাবে এই দ্বাবিংশ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতেও বেশ বুঝা যায় যে কোন মহাপ্রলয় হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিব্যাদি যাহা একবার সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই অক্ষতদেহে অদ্যাপি বিরাজমান। সুতরাং দশম মণ্ডলের ১৯০ সুক্তের ৩য় মন্ত্রটি ভ্রান্তিপূর্ণ ভিন্ন আর কি মনে করা যাইতে পারে? অতঃপর আমরা বেদে সংশয় ও জিজ্ঞাসার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। নেম ঋষি বলিতেছেন—

> প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্তঃ
> ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
> নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উ ত্ব আহ
> ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম॥
>
> ৩—৮৯সূ—৮ম।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে জনা বাজয়ন্তঃ! সংগ্রামমিচ্ছন্তো যূয়ম্ ইন্দ্রায় সত্যং সত্যভূতং স্তোমং সু সুষ্ঠু প্রভরত, "ইন্দ্রঃ অস্তি" ইত্যেতৎ যদি সত্যমস্তি ভবতি। ইন্দ্রাস্তিত্বে কঃ সন্দেহঃ? তত্রাহ—নেম উ ভার্গবো নেম এব ইন্দ্রো নাম ত্বঃ কশ্চিৎ নাস্তি ইত্যাহ। তত্র কারণং দর্শয়তি কঃ ঈম্ এনম্ ইন্দ্রং দদর্শ অদ্রাক্ষীৎ? ন কোপি অপশ্যৎ অতঃ কং বয়ম্ অভিষ্টবাম অভিষ্টুমাঃ? তস্মাৎ ইন্দ্রো নাম কশ্চিৎ বিদ্যতে বাদমাত্রং নতু তৎ সত্যমিত্যর্থঃ।

এই মন্ত্রের প্রণেতার নাম নেম ঋষি। সুতরাং ইহা ঈশ্বরপ্রণীত নহে। তৎপর যে ইন্দ্রকে তদানীন্তন লোকেরা স্বয়ং ঈশ্বরবোধে স্তুতিবন্দনা করিয়াছেন, ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে যে ইন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, নেম ঋষি বলিতেছেন, ইন্দ্র আবার কে? কেন তোমরা যুদ্ধে তাহার স্তব করিতে বলিতেছ, তোমরা কেহ কি ইন্দ্রকে দেখিয়াছ? ইন্দ্রনামে যে কেহ আছেন বা ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি?

এখন দেখ, বেদ যদি স্বয়ং ঈশ্বরপ্রণীতই হইত, তাহা হইলে সে মন্ত্রে নেমঋষির নাম আসিবে কেন? আর ইন্দ্রনামে কোন ঈশ্বর বা উপাস্য দেবতা ছিলেন বা আছেন কি না, তাহা মানুষ নেমঋষি নাও জানিতে পারেন, কেননা তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বেই মানুষ ইন্দ্র উপরত হইয়াছিলেন। কিন্তু বেদপ্রণেতা স্বয়ং পরমেশ্বরও কি ইন্দ্রের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের কথা অনবগত থাকিবেন? সুতরাং এই সকল সংশয়দ্যোতক মন্ত্র অনন্তশক্তি মহান্ ঈশ্বরের লেখনীলালা হইতে পারে না। অপিচ ইন্দ্র যে একজন নরদেবতা, তিনি যে মা বাপের সন্তানসন্ততি, তাহা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও বেদেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋগ্বেদই বলিয়াছেন যে অদিতি ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতা, সুতরাং যে বেদে সেই ইন্দ্রাদি মনুষ্য-দেবগণ উপাস্য দেবতা বা ঈশ্বর বলিয়া পূজিত, সেই প্রমাদবাহী বেদ কখন ঈশ্বরের প্রণীত হইতে পারে না। এক সময়ে ইন্দ্রাদি মনুষ্য-দেবতাগণকে ভারতের মনুষ্যেরা উপাস্য দেবতা বলিয়া বন্দনা করিতেন, তাই ভারতে প্রণীত ঋগ্বেদের বিশেষণ "দেবদৈবত্যঃ।"

> ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যঃ। ১২৪-৪অ-মনু।

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—দেব এব দেবতা অস্য ইতি দেবদৈবত্যঃ।

ভারতবাসীরা ইন্দ্রাদি মানুষ-দেবতার আরাধনা করিতেন। মীমাংসাভাষ্যে মহামতি শবরস্বামীও বলিয়া গিয়াছেন, যথা—

সর্ব্বোহয়ং প্রয়াসো দেবতারাধনার্থ এব। সা অস্ম প্রদয়া ফলং দদাতি। এবং শ্রূয়তে তৃপ্ত এব এন মিত্রঃ প্রজয়া পশুভি স্তর্পয়তি।

উত্তরার্দ্ধ—৯৫ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতারা প্রসন্ন হইলে সন্তান ও গবাদি পশুলাভ হইয়া থাকে। ইহা ভ্রান্তি, কেননা কোন বড়লোক প্রসন্ন হইলে পশু দান করিতে পারেন, পরন্তু পুত্র দিতে পারেন না। ঋগ্বেদের সময়ে ভারতবাসীরা সন্তানাদির কামনায় উক্ত মানুষ-ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিতেন। তবে উক্ত ইন্দ্রাদি মানুষ-দেবতারা গুণবান্ ও পদস্থ লোক ছিলেন মাত্র। তাই মীমাংসা দর্শন উত্তরার্দ্ধে বলিয়াছেন—

গুণত্বেন দেবতা শ্রুতিঃ। ৯৪ পৃষ্ঠা।

শবরস্বামীও "গুণশ্চ অনর্থকঃ স্যাৎ"

(পূর্ব্বখণ্ড—১৩১ পৃষ্ঠা।)

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাকালেও বলিয়াছেন—"মহত্বং নাম ইন্দ্রস্য গুণোভবতি, ইতি দেবতাভিধানম্"—অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতারা গুণবান্ মনুষ্য ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা দেবতা নামের বিষয়ীভূত। অতএব যে সকল বেদমন্ত্রে ইন্দ্রাদি মানুষ-দেবতারা উপাস্য দেবতা বলিয়া বিবৃত, তৎসমুদায় ভ্রান্তিসমাভ্রাত হইতেছে। মহর্ষি মুণ্ডক বলিতেছেন।

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি
ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

অর্থাৎ, হে লোক সকল! এই জড় অগ্নি পরমেশ্বর বা উপাস্য নয়, এই জড় সূর্য্যও পরমেশ্বর বা উপাস্য নয়, এবং এই নর-ইন্দ্র, বায়ু ও শিবও ঈশ্বর বা আরাধ্য দেবতা নহে। মহান্ ঈশ্বরের ভয়েই অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছে এবং তাঁহার ভয়েই ইন্দ্র, বায়ু ও শিব প্রভৃতি নরদেবগণ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, সুতরাং বেশ্ বুঝা গেল, যে সকল বেদমন্ত্রে জড় অগ্নি, জড় সূর্য্য ও নর-ইন্দ্র, বায়ু, শিব ও বরুণাদি উপাস্য দেবতা বলিয়া বিবৃত, সেই সকল বেদমন্ত্র, বা তদ্বহুল বেদসকল কথনই ঈশ্বরপ্রণীত অভ্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বেদ একত্র বলিতেছেন—

কোদদর্শ প্রথমং জায়মানং
অস্থন্বন্তং যদনস্থা বিভর্ত্তি।
ভূম্যা অসুরস্বগাত্মা ক স্বিৎ
কো বিদ্বাংস মুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ?

৪-১৬৪সূ ১ম।

যিনি সকলের প্রথমে জন্মিয়া ছিলেন, তাঁহাকে কে দেখিয়াছে? আর অস্থিরহিত নিরাকার পরব্রহ্ম যে প্রকারে এই আকারবান্ পার্থিব পদার্থসমূহের সৃষ্টি করিলেন, তাহাইবা কে দেখিয়াছে ও কে জানে? পার্থিব বস্তু ভূমি হইতে যেন পার্থিব পদার্থ প্রাণ ও শোণিতের উৎপত্তি হইল, কিন্তু অপার্থিব বস্তু আত্মা কোথা হইতে জন্মিল? কোন্ ব্যক্তি বিদ্বানের নিকট যাইয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিবে?

কিং স্বিৎ আসীৎ অধিষ্ঠানং
আরম্ভণং কতমৎ স্বিৎ কথাসীৎ
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা,
বি দ্যামৌর্ণোৎ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ২

সেই বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ কিসের উপর অধিষ্ঠিত থাকিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন? সৃষ্টির উপাদান কি ছিল? তাহাই বা কোথা হইতে

আসিল? তিনি কোন্ স্থান হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া পরে নিজ মহিমায় স্বর্গের সৃষ্টি করিলেন? তথাহি—

কিং স্বিৎ বনং ক উ স বৃক্ষ আস,
যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু,
তৎ যদধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্॥
৪-৮১সূ-১০ম।

সে কোন্ বন? সে বৃক্ষই বা কি ছিল? যাহা দিয়া এই স্বর্গ ও পৃথিবী গঠিত হইয়াছে? হে মনীষিগণ! তোমরা মনে মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি, সেই নির্ম্মাতা ভুবনসমূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক যাহাতে অধিষ্ঠান করেন, সেই স্থানই বা কি?

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাক্ দেবা অস্য বিসর্জনেন,
অথ কো বেদ যত আবভূব॥
৬-১২৯সূ—১০ম।

কেই বা প্রকৃত কথা জানে? কেই বা বলিয়া দিবে? এই নানা প্রকার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? কেই বা কি দিয়া সৃষ্টি করিল? অথবা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে হইল, তাহা কেই বা জানিবে, কেননা দেবতারাও এই জগৎসৃষ্টির পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব,
যদি বা দধে যদি বা ন?
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥ ৭ ঐ

• জগতের এই নানা সৃষ্টি ব্যাপার কাহার দ্বারা সম্পন্ন হইল? ইহা কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, না ইহা আপনা হইতেই হইয়াছে? এই পৃথিবীর অধ্যক্ষ সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, পরম-ব্যোম বা উত্তরকুরু ব্রহ্মলোকে বাস করেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও কৃতবিদ্য ও বটেন। হয় ত তিনিই ইহা অবগত আছেন, অথবা হয় ত তিনিও ইহা নাও জানিতে পারেন?

বেদে এই সকল অনভিজ্ঞতামূলক সন্দেহ-দ্যোতক জিজ্ঞাসা থাকিল কেন? ঈশ্বর কি নিজে সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াও তাহা অবগত ছিলেন না? এই সকল জিজ্ঞাসামূলকমন্ত্র কি অনভিজ্ঞ ও সংদিগ্ধচেতা মনুষ্যদিগের কৃত নহে? ৮২ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে বলা হইতেছে—

যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধতো,
ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব,
তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা॥

যে বিশ্বস্রষ্টা আমাদিগের পিতা, জন্মদাতা, বিধাতা, যিনি সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি একাকীই সকল দেবতার নাম ধারণ করেন, কেবল আমরা নহি, অন্যান্য ভুবনের লোকেরাও তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন।

এতৎপাঠেও জানা যাইতেছে যে, স্বয়ং ঈশ্বর আপনাকে আপনার পিতা ও বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, ইহা ঈশ্বরের স্পষ্ট কোন তৃতীয় ব্যক্তির উক্তি। অপিচ ইহা ভিন্ন বেদে যখন হিংসা, দ্বেষ, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ ও অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ তুচ্ছাতিতুচ্ছ পার্থিব বিষয়ের সদ্ভাব রহিয়াছে, তখন ইহাকে ঈশ্বর প্রণীত দূরে থাকুক, কেবল সাধু প্রণীত গ্রন্থ বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে না। অবশ্য বেদসমূহের স্থানে স্থানে বহু সারগর্ভ বিষয়েরও অবতারণা রহিয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রণেতা

সাধুগণই বটেন, কিন্তু বেদে এরূপও বহু বিষয় রহিয়াছে যাহার সহিত সাধুত্বের কোন সংশ্রবই দেখা যায় না। বেদে আছে—

যো অস্মান্ দ্বেষ্টি
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্মঃ।

শুক্ল যজুঃ।

যদি কেহ আমাদিগকে দ্বেষ করে, তবে আমরাও তাহার প্রতি দ্বেষ করিব। ইহা অতি অনুদারতার কথা। পক্ষান্তরে দেখ, মনু বলিতেছেন—

ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্রুধ্যেৎ
আক্রুষ্টঃ কুশলং বদেৎ। ৪৮—৬অ
নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোপি
নপরদ্রোহকর্ম্মধীঃ। ১৬১—২অ

যদি কেহ তোমাকে ক্রোধ করে, তবে তুমি তাহাকে ফিরাইয়া ক্রোধ করিও না। যদি কেহ গালি দেয়, তবে তাহাকে মিষ্ট কথা বল। যদি কেহ ধরিয়া মারেও তবে তাহাকে এমন একটি অরুন্তুদ বাক্যও বলিবে না, যাহাতে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। তুমি মনে মনেও পরের অনিষ্ট চিন্তা করিও না। কিন্তু বেদ বলিতেছেন—

যদি নো গাং হংসি
যদ্যশ্বং যদি পূরুষং।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো
যথা নোসো অবীরহা॥

প্রথম খণ্ড অথর্ব্ববেদ—৯৭পৃ।

হে শত্রু। যদি তুমি আমাদের গো, অশ্ব ও লোকদিগের কোন হিংসা কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সীসনির্ম্মিত গুলিদ্বারা বিদ্ধ করিব, যাহাতে তুমি আর আমাদের বীরঘাতী না হইতে পার। তথাহি—

ত্বমগ্নে যাতুধানান্
উববদ্ধানিহাবহ।
অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেণাপি
শীর্ষাণি বৃশ্চতু॥ ৫৪পৃঃ ঐ

অর্থাৎ হে অগ্নি! তুমি রাক্ষসগুলিকে এখানে বান্ধিয়া আন, তার পর ইন্দ্র তাঁহার বজ্রদ্বারা উহাদের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলুন। বাইবেলেও রহিয়াছে—

"আর চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু
ও দন্তের পরিশোধে দন্ত"

৪৩—৫অ—মিথ

অর্থাৎ যদি কেহ তোমার চক্ষু নষ্ট করে, তবে তুমিও তাহার চক্ষু নষ্ট করিবে, কেহ তোমার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে, তুমিও তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া দিবে।

সুতরাং বুঝা গেল, বাইবেল ও বেদের এই সকল উক্তি গড বা "হরের্ব্বাক্" দূরে থাক্, উদারচেতা নরের বাক্যও নহে। সুতরাং বেদ বা বাইবেল মনুষ্যকৃত, পরন্তু ঈশ্বরকৃত বা ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট সাধুজনবাক্য নহে! কেবল ইহাই নহে, বেদের ভিতর—ঘরকন্না, সংসার-ধর্ম্মপ্রভৃতি নানা সাধারণ বিষয়েরও অবতারণা আছে, আর যাগযজ্ঞ, পশুহিংসা ও নানা আবর্জনারাশিরও সমাবেশ রহিয়াছে, তজ্জন্য ইহাকে ঈশ্বরপ্রণীত কিংবা কোন সাধুজন-বিরচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থও বলা যায় না। আমরা নহি, স্বয়ং মহর্ষি মুণ্ডকও ঐ সকল কারণে বেদাঙ্গষট্‌ক ও বেদচতুষ্টয়কে "অপরা" অর্থাৎ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যৎ ব্রহ্মবিদো বদন্তি। পরা চৈব অপরাচ। তত্র অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা

কল্পে। ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।”

অর্থাৎ বেদজ্ঞ ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে, বিদ্যা দুইটি, একটি পরা আর একটি অপরা বা অশ্রেষ্ঠা। তন্মধ্যে যদ্দ্বারা সেই অবিনাশি পরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, সেই উপনিষদাদি গ্রন্থই পরা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, আর যাগযজ্ঞবহুল ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এতৎ সমুদায়ই অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

ইহা মুণ্ডকশ্রুতির বাক্য, যদি উপনিষৎ সমূহও বেদ সুতরাং, ঈশ্বরবাণী. বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বয়ং পরমেশ্বর বলিতেছেন যে আমার এই উপনিষৎই প্রকৃত গ্রন্থ, বেদগুলি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নহে। বেদ ঈশ্বর প্রণীত হইলে, মুণ্ডক কথন সে বেদের প্রতি এরূপ সাবজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। মহর্ষি জৈমিনিও বেদের অপৌরুষেয়ত্বে আস্থা প্রদর্শন করিয়া যান্ নাই। তিনিও বলিতেছেন—

বেদাং শ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ

১অ—১পাদ—২৭মন্ত্র।

তত্র শবরস্বামী—পৌরুষেয়াঃ চোদনা ইতি বদামঃ। সন্নিকৃষ্টকালাঃ কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ, তে চ চোদনানাং সমূহাঃ, তত্র পৌরুষেয়াশ্চেৎ বেদাঃ অসংশয়ং পৌরুষেয়াঃ চোদনাঃ। কথং? পুনঃ কৃতকা বেদাঃ ইতি কেচিৎ মন্যন্তে যতঃ পুরুষাখ্যাঃ, পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে বেদাঃ। কাঠকং কালাপকং পৈপ্পলাদকং, মৌদ্গলমিতি।

কেহ কেহ বলেন যে বেদ সকল পুরুষকৃত পিপ্পলাদ ও ইদানীন্তন। কেননা কঠ, নেম, গোপবনও অন্যান্য ঋষিরা ইহার মন্ত্রসমাখ্যাকর্ত্তা। এবং বৈদিক গ্রন্থসমূহও ঐ সকল কারণে কাঠক (কঠকৃত) কালাপক (কলাপকৃত) পৈপ্পলাদক (পিপ্পলাদকৃত) ও মৌদ্গল প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত। বলিতে পার, মনু ত বেদকে সনাতন বা নিত্য বলিয়া গিয়াছেন!

অগ্নিবায়ুরবিভ্যস্তু
ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং
ঋগ্যজুঃ সামলক্ষণং॥ ২৩—১৩

তত্র কুল্লূকভট্টঃ—সনাতনং নিত্যং বেদাপৌরুষেয়ত্বপক্ষ এব মনোরভিমতঃ পূর্ব্বকল্পে যে বেদা স্ত এব পরমাত্মমূর্ত্তে ব্রহ্মণঃ স্মৃত্যারূঢ়াঃ?

হাঁ, মনু ও কুল্লূকাদি এইরূপই বলিতেছেন, কিন্তু ইহাও ভক্তির কথা, পরন্তু যুক্তির কথা নহে। সায়ণ ও তাঁহার ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকায় ঐরূপ বহু অনিদান মতের অবতারণা করিয়াগিয়াছেন। পরমার্থতঃ কোন মন্ত্র বা মন্ত্রসমষ্টি কৃতক ভিন্ন নিত্য বা অপৌরুষ (ঈশ্বরকৃত) হইতে পারে না। কপিলও বলিতেছেন—

ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ।

৪৫—৫অ

তত্র বিজ্ঞানভিক্ষুঃ—স তপঃ অতপ্যত, তস্মাৎ তপস্তেপানাৎ ত্রয়ো অজায়ন্ত ইত্যাদি শ্রুতের্ব্বেদানাং ন নিত্যত্বম্।

আমরা বলিতে চাহি যে, এ শ্রুতিবাক্যও ভক্তির রাজ্যের প্রমাদ। ফলতঃ কাহারও তপস্যা বা চিন্তাতে বেদের জন্ম হয় নাই। ইহা বহুজনের কবিত্বের বিকাশ মাত্র।— কপিল পুনরপি বলিতেছেন যে,—

ন পৌরুষেয়ত্বং তৎকর্তুঃ
পুরুষস্য অভাবৎ। ৪৬—৫অ

অন্যেরা মানুষকে বলেন পুরুষ, কপিলের পরিভাষায় ঈশ্বরের নাম পুরুষ। তিনি বলেন যে তোমরা যে বেদকে অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর প্রণীত বল, উহা ঠিক নহে। কেননা পুরুষ বা ঈশ্বর কোথায়? আমরা বলি, ঈশ্বর আছেন, পরন্তু তিনি বেদপ্রণেতা নহেন। কঠপিপ্পলাদাদিই উহার প্রণেতা।

অতএব পরাশর যে বলিয়াছেন—

ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তারঃ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ

ইহাও অপ্রকৃত সংবাদ। কেননা যুগে যুগে ঋষিরা যে সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল মন্ত্রই সমাহৃত হইয়া বেদচতুষ্টয়ের দেহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এবং যাস্ক যে বলিয়া গিয়াছেন—

"তং যদেনান্ উপাস্যমানান্ ব্রহ্ম-
স্বয়ম্ভু অভ্যানর্ষৎ তে ঋষয়ঃ"

ইহাও অসত্য মনে করিতে হইবে। কেননা কোন ব্রহ্ম বা বেদ মন্ত্রই স্বয়ম্ভু বা স্বপ্রভব নহে, পরন্তু কৃতক। অবশ্য বহু মন্ত্রের প্রণেতার নাম অজ্ঞাত রহিয়াছে, সমাহর্ত্তারা সেই সকল মন্ত্রের সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু তজ্জন্য (ঋষি দর্শনাৎ) তাঁহারা ঋষিপদবাচ্যও হইয়াছিলেন না। অথবা যদি ঋষিশব্দের প্রাথমিক অর্থ ইহাই হয়, তাহা হইলেও কৃতক বেদকে অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না। সায়ণও ঋক্ ও অথর্ব্ববেদের ভাষাভূমিকা বা উপোদ্ঘাত প্রকরণে বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া গিয়াছেন—

"তস্মাৎ অপৌরুষেয়ত্বাৎ নিত্যত্বাৎ ব্যাখ্যেয়তাসিদ্ধিঃ"। ১ম খণ্ড অথর্ব্ব—২৪পৃ।

কিন্তু তাহা স্বীকার্য্য সত্য নহে। তিনি ঋগ্বেদে ও অথর্ব্ববেদের ভূমিকায় যে সকল প্রমাণের সমাহার করিয়াছেন, তৎসমুদায় অদৃঢ়ভিত্তিক। পক্ষান্তরে "ন্যায়মালাবিস্তর" গ্রন্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অতি প্রকৃত কথা।

"বৌধায়নাপস্তম্বাশ্বলায়নকাত্যায়নাদি নামাঙ্কিতাঃ কল্পসূত্রাদিগ্রন্থাঃ নিগম (বেদ) নিরুক্তষড়ঙ্গগ্রন্থা মন্বাদিস্মৃতয়শ্চ অপৌরুষেয়াঃ? নৈবং। কল্পস্য বেদত্বং নাদ্যাপি সিদ্ধং কিন্তু প্রযত্নেন সাধনীয়ং, ন চ তৎ সাধয়িতুং শক্যং ধর্ম্মবুদ্ধিজনকত্বাৎ বেদবৎ"।

অতি সত্য কথা। বৌধায়ন, আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়নপ্রভৃতি কল্পসূত্রাদি, মন্বাদি সংহিতা, কি ষড়ঙ্গ বেদ, ইহার একখানিও অপৌরুষেয় নহে, (মা এবম্)। কল্পসূত্রাদির বেদত্ব অদ্যাপি কেহ সিদ্ধ করিতে পারে নাই ও পারিবে না। তবে লোকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা ভক্তিবশতঃ যেমন বেদসমূহকে অপৌরুষেয় মনে করে, তদ্রূপ অন্ধতাবশতঃ কল্পসূত্রাদিকেও অপৌরুষেয় মনে করিয়া থাকে।

যাহা হউক, বেদ যে অপৌরুষেয় ও নিত্য নহে, তাহা বলা গেল, অতঃপর আমরা বেদের নিত্যত্ব ও অনাদিত্বনিরাসের জন্য আরও দুচার কথা বলিব।

কখন্ জগতে বেদের প্রাদুর্ভাব হইল? অতি আদিমযুগে, যখন মানুষ ভাষা ও বর্ণজ্ঞান বিহীন উলঙ্গ ও বর্ব্বর ছিল, তখন লোকেরা আকারে ইঙ্গিতে একে অন্যের নিকট মনের ভাব অভিব্যক্ত করিত। ঐ সময়ে বহুলোক স্বর্গ হইতে ইতস্ততঃ যাইয়া উপনিবিষ্ট ও অবশিষ্ট লোকদিগের মধ্যে কতক জ্ঞানের

সঞ্চার হইলে তাঁহারা সর্ব্বাদৌ গো ও ছাগ মেষ প্রভৃতির নিকট আংশিক ভাষা শিক্ষা করেন। কালে আরও একটু উন্নতি হইলে দেবগণের পূর্ব্বপুরুষ অদেবতারা ভাষার একটা সামান্য আকার গঠন করিয়া লয়েন। ক্রমে সামাজিকগণ তদানীন্তনকালের সেই অসম্পূর্ণ ভাষাকে চালনী দ্বারা শক্তু ছাকার ন্যায় ছাকিয়া লইয়া উহার কিঞ্চিৎ সংস্কারসংবিধান করেন। তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

দেবীং বাচম জনয়ন্ত দেবাঃ

তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।

দেবতারাই এই দেবীবাণী বা সংস্কৃত-ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা, পৃথিবীর সমুদায় মানবগণ তখন সেই একই সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন করিতেন, তখন লোকের মনে কবিত্বের স্ফুরণ হইলে স্বর্গের লোক সকল মুখে মুখে নানা-বিষয় লইয়া পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে তিন যুগ ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন নরনারী যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রুত হইত বলিয়া শ্রুতিনামে সমাখ্যাত হয়। পরে উহা লিখিত হইয়া গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়া বেদ নামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। সুতরাং এহেন বেদ না নিত্য, না অনাদি, বলিয়া সমা-খ্যেয়। ঋগ্বেদে আছে—

যুগে যুগে বিদথ্যং গৃণদ্ভ্যো

অগ্নে রয়িং যশসং ধেহি নব্যসীম্।

৫—৮সূ—৬ম।

তত্র সায় ভাষ্যম্—হে অগ্নে, যুগে যুগে কালে কালে বিদথ্যং বিদথঃ যজ্ঞঃ তদর্হং স্বামু-দ্দিশ্য নব্যসীং নবতরাং স্তুতিং গৃণদ্ভ্যঃ উচ্চারয়িতৃভ্যঃ অস্মভ্যং রয়িং ধনং যশসং যশশ্চ ধেহি।

হে অগ্নে, আমরা যুগে যুগে নূতন নূতন স্তোত্র রচনা করিয়া তোমার স্তুতি করিতেছি। তুমি আমাদিগকে ধন ও যশঃ দান কর। তথাহি—

সমিধ্যতে বৈশ্বানরঃ কুশিকেভিঃ

যুগে যুগে স নো অগ্নিঃ সুবীর্য্যং দধাতু।

৩—২৬সূ—৩ম।

কুশিকবংশীয় আমরা যুগে যুগে যে অগ্নিকে যজ্ঞার্থ প্রজ্জ্বালিত করিয়া আসিতেছি, সেই অগ্নি আমাদিগকে উত্তম বীর্য্য প্রদান করুন।

বেশ বুঝা গেল, বেদমন্ত্র সকল যুগে যুগে নূতন নূতন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং যে মন্ত্র যে যুগে প্রণীত, তাহার বয়ঃক্রম তৎ-পরিমিত। মনুষ্যসৃষ্টির বহুকাল পরে কবি-ত্বের যুগে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা নিত্য নূতন মন্ত্র বিরচিত হয়, সুতরাং এই সকল মন্ত্রকে নিত্য বা অনাদি বলা যায় না। মীমাংসা দর্শনও বলিতেছেন যে—

অনিত্য দর্শনাচ্চ। ২৮—৪০ পৃঃ।

তত্র শবরস্বামী—জননমরণবন্তশ্চ বেদার্থাঃ শ্রূয়ন্তে ববরঃ প্রাবহণিরকাময়ত, কুসুরুবিন্দঃ ঔদ্দালকি রকাময়ত, ইত্যেবামাদয়ঃ উদ্দালকস্য অপত্যং গম্যতে ঔদ্দালকিঃ। যদ্যেবং প্রাক্ ঔদ্দালকিজন্মনঃ নায়ং গ্রন্থো ভূতপূর্ব্বঃ? এব-মপি অনিত্যতা।

বেদে দেখা যায় যে, প্রবহণতনয় ববর ও উদ্দালকতনয় কুসুরুবিন্দও কোন বিষয়ে কামনা করিয়াছেন। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে যে সকল গ্রন্থে এই ববর, প্রবহণ, কু-সুরুবিন্দ ও উদ্দালকাদির নাম রহিয়াছে, সেই সকল গ্রন্থ, উহাঁদিগের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, না পরবর্ত্তী? যদি পরবর্ত্তীই হয়, তাহা হইলে এহেন অবরজযুগের বেদকে কিছুতেই নিত্য

বা অনাদি বলা যাইতে পারে না। এবং বহু বেদমন্ত্রে যখন তৎপ্রণেতার নামও সংযোজিত রহিয়াছে ও মন্ত্রের অর্থদ্বারাও যখন তৎপ্রণেতাকে ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষ বলিয়াই প্রতীতি হয়, তখন বেদসমূহকে কোন কারণে অপৌরুষেয় বলা যাইতে পারে না।

তবে বহুমন্ত্রের কে প্রণেতা তাহা মন্ত্রে উল্লিখিত না থাকাতেই বেদভক্তেরা উহাতে ঈশ্বরের রচয়িতৃত্ব বা প্রত্যাদেশের বৃথা কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। পরাশরাদি ঐরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং বেদ, মন্ত্রপ্রণেতৃগণের নামনির্দ্দেশ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। দেবগণ যে বেদমন্ত্রের আদিপ্রণেতা তাহাও বেদে উক্ত রহিয়াছে। বেদ স্থলান্তরেও বলিয়াছেন—

ইমোত পৃচ্ছ জনিম কবীনাং
মনোধৃতঃ সুকৃত স্তক্ষত দ্যামিমাঃ।

২—৩৮সূ—৩ম।

হে লোক সকল, তোমরা গুরুজনদিগকে কবিদিগের জন্মের কথা জিজ্ঞাসা কর। যাঁহারা স্বর্গে বসিয়া আপন আপন মন হইতে, কাহারও দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট না হইয়া, এই সকল উৎকৃষ্ট বেদমন্ত্র সকলের প্রণয়ন করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা আমাদিগের কথা বলিলাম, এইক্ষণ প্রবীণগণ সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃত তথ্যের বিনির্ণয় করিবেন। কেহ আমার ভ্রান্তি প্রদর্শন করিলে প্রীত হইব।

মৃত্যুর রোদন।

জীবনের বৈতরণীকূলে এলাইয়া ক্লান্ত-তনুখানি
নীরবে বসিয়া মৃত্যু মনোদুঃখে কাঁদে একাকিনী।
সহসা কে যেন জ্যোতির্ম্ময়
মৃত্যু-পাশে আসি' ধীরে কয়,—
"হেথায় একেলা বসি' বালা, কিবা দুঃখ কাঁদ কি কারণ?"
মরণ, মুছিয়া অশ্রুজল ভগ্ন-কণ্ঠে করে নিবেদন।
"নরে এত ভালবাসি আমি, নর কিন্তু মোরে নাহি চায়
তাহাদের ভ্রান্তি হেরি দুঃখে তাই বসে কাঁদিছি হেথায়।"

বর্ণলিপির আবির্ভাব।

(১ম প্রবন্ধ)

যাঁহারা অল্প একটু সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা সকলেই বিদিত আছেন যে, বৈদিক নিবন্ধসকল শ্রুতিনামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক নিবন্ধ শ্রুতিনামে প্রসিদ্ধ কেন? এতদুপলক্ষ্যে বর্ত্তমান কৃতবিদ্যসমাজ নিম্নলিখিত প্রকার আলোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহারা দ্বীপান্তরবাসী খ্যাতনামা পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের নাম গ্রহণ করতঃ যাহা বলেন, তাহারই সারাসার চিন্তা করা এই পঠ্যমান প্রবন্ধের বিষয়। ইঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বেদ রচনার প্রারম্ভাবধি পাণিনি মুনির সূত্র রচনা পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণলিপির উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং লিপিপদ্ধতি বিদিত না থাকায় তাঁহাদিগের মধ্যে পুস্তকাদি লিখিত পঠিত হইত না। ঋষিরা নিজ রচিত সন্দর্ভ সকল শিষ্যদিগকে কেবল বাগ্‌ব্যাপারের দ্বারা উপদেশ করিতেন, শিষ্যেরা সে সকল শুনিয়া শুনিয়া শিক্ষা বা কণ্ঠস্থ করিত। শুনিয়া শিখিত বলিয়াই বৈদিক নিবন্ধ সকল তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রুতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিষয়ে প্রমাণ বা যুক্তি এই যে, যে দেশে বা যাহাদের মধ্যে লিপিপ্রথা প্রচলিত থাকে, তাহাদের নিবন্ধে নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রসঙ্গে বর্ণলিপির উপকরণ লেখন্যাদি শব্দের অনুপ্রবেশ সংঘটন হইবেই হইবে। অথচ তাহা হয় নাই। অর্থাৎ বৈদিক নিবন্ধের কোনও স্থলে লিপিসম্ভাবের অনুমাপক কথা অনুপ্রবিষ্ট থাকিতে দেখা যায় না। বৈদিক নিবন্ধে কেবল বাগ্‌ব্যাপার বোধক, "গায়ন্তি—গান করিতেছে" "আবোচামঃ—বলিয়াছিলাম" "অধীতে অধ্যয়ন অর্থাৎ গুরুমুখোচ্চারণের অনুরূপ উচ্চারণ করিতেছে" "বাচয়তি—বলা যাইতেছে" এই রূপ কথা আছে, লিপ্যনুমাপক "লিখতি" পাঠয়তি" "অক্ষরাণি" "বর্ণাঃ" "পত্রং" "লেখনী" "মসী" "পুস্তকমং" প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ নাই। অতএব, ও দিকে বৈদিক সূক্তমন্ত্রাদি, এদিকে পাণিনি মুনির ব্যাকরণ সূত্র, অবদান্তমধ্যবর্ত্তী কালের কোনও গ্রন্থে লিপিঘটিত শব্দ সন্নিবিষ্ট না থাকায় আমরা সকলেই বলিতে ও মানিতে বাধ্য যে বেদরচনার প্রারম্ভাবধি পাণিনিমুনির ব্যাকরণসূত্র রচনা পর্য্যন্ত ভারতখণ্ডীয় ঋষিদিগের মধ্যে কোনরূপ বর্ণলিপির সৃষ্টি হয় নাই।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, লিপিপ্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেকগুলি বেদশাখা উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইত না। কেন না, পুস্তকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যাইত। অপিচ, শাখাভেদে পাঠভেদও উৎপন্ন হইত না, সর্ব্বত্র এক রূপ পাঠ লিপির দ্বারা ব্যবহৃত হইতে পারিত।

তৃতীয় যুক্তি এই যে, লিপিপদ্ধতি প্রচলিত থাকিলে কেবলমাত্র শ্রবণ ব্যাপারবোধক শ্রুতিনাম প্রচলিত হইত না, অন্ততঃ দর্শন ব্যাপারবোধক অন্য কোন নাম তৎসঙ্গে প্রচলিত হইত। অতএব, শ্রুতি এই নামদ্বারা তৎকালে লিপিপদ্ধতি না থাকা অনুমিত হইতে পারে।

বেদকালাবধি পাণিনি মুনির সূত্রকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বর্ণলিপির অনুৎপত্তি পক্ষে অভিহিত প্রকারের যুক্তিত্রয় উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। আমাদের মনে হয় যে, উক্ত যুক্তিত্রয়ের মধ্যে শেষোক্ত যুক্তিটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ এই যে, যদি শ্রুতিনাম লিপিপদ্ধতি না থাকার অনুমাপক হয়, তাহা হইলে "স্মৃতি" এই নামও তদুৎপত্তিকালে বর্ণলিপি-না থাকার অনুমাপক হইবে। পরন্তু দেখা যায়, প্রত্যেক স্মৃতিতে অতি বিস্তৃত এক একটি লেখনপ্রকরণ আছে। অতএব, স্মৃতি নাম যেরূপ অনুমাপক, আমাদের বিবেচনায় শ্রুতি নামও সেইরূপ অনুমাপক।

লিপিপদ্ধতি বিদিত থাকিলে বেদশাখা উচ্ছেদপ্রাপ্ত ও পাঠভেদ উৎপন্ন হইত না, এ যুক্তিও তত সারবতী নহে। কেননা, এই অতি বিস্তৃত লিপিপ্রচার কালেও শত শত গ্রন্থ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে ও হইয়াছে এবং পাঠভেদ ও এমন কি বিভিন্ন মুদ্রিত পুস্তকও বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং বেদশাখার উচ্ছেদ ও শাখাভেদে পাঠভেদ দৃষ্টে বৈদিক সময়ে বর্ণলিপির অভাব অনুমান সদনুমান নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রথম যুক্তি কিরূপ। প্রথম যুক্তি কি? না, বৈদিক নিবন্ধে বাগ্‌ব্যাপারবোধক কথা ব্যতীত লিপিব্যাপারবোধক কথা নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বৈদিক নিবন্ধে শত শত লিপিব্যাপারবোধক কথা আছে। সর্ব্বাদিম ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একটি ঋক্ আছে, লিপিপদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে সেটির অর্থ সুসঙ্গত হয় না। যথা—

> উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচং
> উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
> উতো ত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে
> জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

এই ঋক্ পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা অবিদ্বানের ও উত্তরার্দ্ধের দ্বারা বিদ্বানের প্রশংসা করিতেছে। ইহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ এই যে, কোন কোন লোক বাক্যকে দেখে, অথচ দেখেনা। আবার এমন সকল লোক আছে, যাহারা বাক্যকে শ্রবণগত করিয়াও শ্রবণ করিতে পারক হয়না। অতএব বাক্য সকলের নিকট নিজ তনু প্রকটিত করে না, কোন কোন লোকের নিকট করে। জায়া যেমন নিজ পতির উদ্দেশেই নিজ তনু সমর্পণ করে, সকলের উদ্দেশে করে না, সেইরূপ বাক্যও কোন কোন বিশিষ্ট লোকের নিকট ব্যতীত সকলের নিকট নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করে না। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বাক্যকে দেখে অথচ দেখিতে পায় না, এ কথার অর্থ বা তাৎপর্য্য—মূর্খেরা পুস্তক দেখে কিন্তু পড়িতে পারে না, এইরূপ ব্যতীত অন্যরূপ নহে। কেননা, পুস্তকের সহায়তা ব্যতীত স্বরূপে বাক্যের দর্শন অসম্ভব। অতএব উক্ত ঋক্ পাঠে আমাদের মনে হয় যে, বেদপ্রচার কালে দুই শ্রেণীর মূর্খ ও এক শ্রেণীর জ্ঞানী বিদ্যমান ছিল। যাহারা আদৌ লেখাপড়া জানিত না, তাহারা এক শ্রেণীর, এবং যাহারা

মাত্র পড়িতে পারিত, অর্থ বুঝিত না, তাহারা অন্য শ্রেণীর মূর্খ। এতদ্ভিন্ন আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকার দ্বিতীয়খণ্ডে বর্ণবাচক অক্ষর শব্দের প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা—"অষ্টকপাল আগ্নেয়োঽষ্টাক্ষরা বৈ গায়ত্রী" ইত্যাদি। এস্থলে অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী, একথার অর্থ—গায়ত্রী মন্ত্রের প্রত্যেক পাদে আটটি করিয়া অক্ষর থাকে। এই অক্ষরশব্দ বর্ণবাচক, অন্যবাচক নহে। ইহার দ্বারা "বেদনিবন্ধে বর্ণবাচক অক্ষর শব্দের প্রবেশ দেখা যায় না" একথা একদেশদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

যজুর্ব্বেদোক্ত অশ্বমেধ প্রকরণে "সতি অস্য বিষ্টাঃ গতি চাক্ষরাণি" ইত্যাদি মন্ত্রবাক্যে যে অক্ষর শব্দ আছে, সে অক্ষর শব্দও বর্ণবাচক, অন্যবাচক নহে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ছন্দঃ-শব্দের বিশেষণে ক্ষুরভ্রজ শব্দ আছে। এই ক্ষুরভ্রজ শব্দ লেখনীবিশেষের বাচক। তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকার নাম ক্ষুরভ্রজ। ছন্দঃ সকল তদ্দ্বারা লিখিত হইত, সেই কারণে ছন্দও ক্ষুর-ভ্রজ। বেদব্যাখ্যাতৃগণ ক্ষুরভ্রজ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "ক্ষুরেণ তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলা-কয়া ভ্রাজতে প্রকাশতে ইতি ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দঃ।" বলা বাহুল্য যে, অদ্যাপি উড়িষ্যা দেশের লোকেরা "খুন্তী" নামক লৌহশলাকার দ্বারা তালপত্রের পুঁথি লিখিয়া থাকে। অতএব, বেদনিবন্ধমধ্যে লেখনী শব্দ না থাকিলেও লেখনীবোধক ক্ষুরভ্রজশব্দ আছে, এবং তদ্দ্বারা বর্ণলিপি না থাকার পরিবর্ত্তে বর্ণলিপি থাকা অনুমিত হইতে পারে।

যজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে উপাসনা-বিধান প্রসঙ্গে সংবৎসরের সহিত বেদত্রয়ের সাম্য কল্পিত হইতে দেখা যায়। সে কল্পনায় "পঙ্‌ক্তিযুগ্মম্" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই পঙ্‌ক্তিযুগ্মম্ শব্দও লিখিত অক্ষরশ্রেণীর বোধক। যথা—"অষ্টশতাধিক-দশ-সহস্র সংখ্যাকানি সংবৎসরস্য মুহূর্ত্তানি তাবন্ত্যেবচ বেদত্রয়স্য পঙ্‌ক্তিযুগ্মমিতি।" অপিচ "সং-বৎসরস্য সূক্ষ্মোঽবয়বো যথা মুহূর্ত্তস্তথা ত্রয্যা-অপি সূক্ষ্মোঽবয়বঃ পঙক্তিযুগ্মমিতি।" এরূপ সাম্যকল্পনা, লিখিত পুস্তক না থাকিলে হই-তেই পারে না। অনুমান হয়, তৎকালে ক্ষুরভ্রজের দ্বারা তালপত্রাদিতে একুশ হাজার ছয়শত পঙক্তিতে বেদত্রয়ের সংহিতাভাগ লিখিবার প্রথা ছিল, তাই সংবৎসর মুহূর্ত্তের ও বেদত্রয়ের পঙ্‌ক্তিযুগ্ম গণনায় সমান দেখিয়া সংবৎসর প্রজাপতির সহিত বেদত্রয়ের সাম্য প্রোক্তপ্রকারে কল্পিত হইয়াছে। অথবা এরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে যে, ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ৩৬০ অহোরাত্রে এক বৎসর, সুতরাং ৩০ সংখ্যাকে ৩৬০ দিয়া গুণ করিলে উপরিউক্ত সংখ্যা লব্ধ হয়। এ দিকে দেখা যায়, ৪০ অক্ষরে এক পঙ্‌ক্তি, তাহার দ্বৈগুণ্যে পঙক্তিযুগ্ম, তাদৃশ দশ সহস্র অষ্টশত পঙক্তি-যুগ্মে ত্রয়ীবিদ্যার এক সংহিতা। সংবৎসর প্রজাপতি ও ত্রয়ীবিদ্যা প্রোক্তপ্রকারে সমান। শতপথ ব্রাহ্মণের এ কল্পনা লিখিত পুস্তকের সহায়তা ব্যতীত সম্ভবপর নহে। অপিচ, এত-দ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, বেদ প্রচারকালেও আর্য্যদিগের মধ্যে গ্রন্থ লিখিবার প্রথা ছিল। এতদ্ভিন্ন বৈদিকনিবন্ধের মধ্যে আমরা "ইতি হ প্রথমং পটলম্" ইত্যাদিবিধ গ্রন্থাবয়ববাচী পটল প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই।

শতপথ ব্রাহ্মণে সংবৎসর মুহূর্ত্তের গণনা আছে, এতৎপ্রসঙ্গে গণিতবিদ্যার অধিকার অনধিকার বিষয়ক কথা মনে পড়িল। সকলেই জানেন যে, লিপিজ্ঞানের পূর্ব্বে শিশুদিগের মধ্যে গণিতবিদ্যার প্রচার থাকে না। তৎপ্রতি কারণ এই যে, গণিতবিদ্যা অতিগহন, অতি দুর্ব্বোধ্য, লিপিসাহায্য ব্যতীত তাহার শিক্ষা বা অনুশীলন, সম্ভবপর হয় না। কাজেই শিশুরা নিরক্ষর অবস্থাপ্রযুক্ত গণিতক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ থাকে। লিপিজ্ঞদিগের গণিতাধিকার, আর নিরক্ষরদিগের অনধিকার, এতদ্দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি, বৈদিক ঋষিরা যখন গণিত প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তখন আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে অবশ্যই কোন না কোনরূপ লিপিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কেননা, লিপির সাহায্য ব্যতীত গণিতক্রিয়া অনুশীলিত হইতে পারে না। এস্থলে কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, বৈদিকনিবন্ধে গণিতবিদ্যার পরিচায়ক কোন কথা নাই। বহুতর বৈদিক গ্রন্থে গণিতজ্ঞানের পরিচায়ক ভূরি ভূরি কথা আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ১৭ অধ্যায়ে গণিতক্রিয়ার মূলীভূত সংখ্যাসমূহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা—

"একাচ দশচ দশচ শতঞ্চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চাযুতং নিযুতঞ্চ প্রযুতং চার্বুদং চার্ব্বুদং সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চপরার্দ্ধং" ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন ঋগ্বেদের ৪ অষ্টকের ২ অধ্যায়ের ১২ বর্গে একটি ঋক্ আছে। তৎপাঠে জানা যায়, অতি প্রাচীনকালে অত্রিগোত্রীয় ঋষিরা গ্রহণ গণনা করিতেন। যথা—

"যং বৈস্বর্ভানুস্তমসাহবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্বিবিন্দন্ নহি অন্যে অশক্নুবন॥"

ইহার ব্যাখ্যা এই যে, অসুরকুলজাত স্বর্ভানু অর্থাৎ রাহু তমোদ্বারা অর্থাৎ স্বচ্ছায়ার দ্বারা যে-সূর্য্যকে বিদ্ধ করে সে-সূর্য্যকে আত্রেয় ঋষিরাই বিদিত ছিলেন, ঐ রহস্য অন্য ঋষিরা জানিতে পারেন নাই। রাহু দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের বেধ, এ কথার অর্থ—গ্রহণগণনা এবং তাহার রহস্য অর্থাৎ নিয়মাদি আত্রেয় ঋষিরা জানিতেন।

তিথি ও তদ্ঘটিত চান্দ্র মাস, এবং তন্মধ্যে মলমাসাদির ব্যবস্থা, এসমস্ত গণিতপ্রক্রিয়াসাধ্য। বিশেষতঃ মলমাস নির্ণয় গণিতোন্নতির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা তাদৃশ মলমাসের কথা এমন কি ঋগ্বেদমধ্যেও প্রাপ্ত হইতেছি। যথা—

"বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ
প্রজাবতঃ। বেদা চ উপজায়তে।"
ঋগ্বেদ, ১ম অষ্টক, ২ অধ্যায়।

ঋক্টীর অর্থ এই যে, বরুণদেব চৈত্র বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের তথ্য জানেন, এবং উক্ত দ্বাদশ মাসের অন্যতম সমীপে যে মাস জন্মে তাহারাও তথ্য জানেন। এই মাসসমীপে জায়মান মাস এক্ষণে মলমাস নামে প্রসিদ্ধ।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ও শুক্লযজুর্ব্বেদের সোমযাগ প্রকরণে বিশুদ্ধ দ্বাদশ মাস ও দ্বিবিধ মলমাস সকল্প চতুর্দ্দশ মাস স্থিরকরতঃ সেই সকল মাসের ও তদভিমানিনী চতুর্দ্দশ দেবতার উদ্দেশে চতুর্দ্দশ চতুর্দ্দশ সোমপাত্র স্থাপন করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। তদ্দৃষ্টে ইহাও স্থির হয় যে, মলমাসের মধ্যে যে সূর্য্যসংক্রমবর্জ্জিত ও সূর্য্যসংক্রমদ্বয় অনুসারে ক্ষয় ও অধিমাস

নামক ভেদ আছে, সে ভেদও তাঁহারা বিদিত ছিলেন।

সামবেদীয় ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "স যদাদিত্যঃ পুর স্তাদুদেতা পশ্চাদস্তমেতা" ইত্যাদি ক্রমে সূর্য্যের দক্ষিণোত্তরবীথি পরিভ্রমণ, তদনুসারে দেশভেদে উদয়াস্তকালের তারতম্য, দিন পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, শীতাদি অনুভবের তারতম্য ও তদনুসারে ঋতু নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এ সকল দেখিলে কে না বলিবে যে, বৈদিক ঋষিরা উন্নত গণিতবিদ্যা বিদিত ছিলেন। এ স্থলে ইহাও বলা বাহুল্য যে, ঋষিদিগকে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া নিয়মিতকালে নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিথি নক্ষত্র ক্ষণ মুহূর্ত্তাদি নির্ণয় করিতে হইত এবং সে সকল নির্ণয়ের জন্য সূর্য্যাদিগ্রহের মন্দোচ্চ শীঘ্র গতি জানিতে হইত। সে সকল জানা অবশ্যই গণিত-প্রক্রিয়ামূলক। কাজেই আমরা "বৈদিক সময়েও ঋষিদিগের মধ্যে গণিতের অনুশীলন ও লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল" বলিতে বাধ্য।

যাঁহারা বলেন, পাণিনি মুনির ব্যাকরণ-সূত্র রচনাকালেও ভারতে লিপিপদ্ধতি ছিল না, তাহাঁদের সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয়। কেননা, আমরা পাণিনির সূত্রপাঠের তৃতীয়াধ্যায়ে "দিব' বিভা নিশা প্রভা লিপিলিবি" ইত্যাদি প্রকারের একটি সূত্র দেখিতে পাই। ঐ সূত্রটি দিবাকরাদি শব্দের ন্যায় লিপিকরাদি শব্দের সাধুত্ব অবধারণার্থ প্রবৃত্ত। এ বিষয়ে বিশেষ কথা এই যে, ব্যাকরণ যখন অপূর্ব্ব শব্দ উৎপাদন করে না, পূর্ব্ব প্রচলিত শব্দের মাত্র সাধুতা নির্ণয় করে; এতদনুসারে আমরা অবশ্যই বলিব যে পাণিনি মুনির বহু পূর্ব্বে লিপিকরাদি শব্দ প্রচলিত ছিল। পাণিনির কথা দূরে থাকুক, পাণিনির পূর্ব্বে যে শাকটায়ন প্রভৃতি ব্যাকরণ-কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারাও পূর্ব্বসিদ্ধ শব্দের অনুশাসন মাত্র করিয়াছিলেন, অন্য কিছু করেন নাই। অতএব যেমন গণিতবিদ্যার অনুশীলন লিপিসদ্ভাবের অনুমাপক, তেমনি ব্যাকরণের অনুশীলনও লিপিসদ্ভাবের অন্যতম অনুমাপক। ব্যাকরণচর্চ্চা যে বৈদিক সময়েও ছিল, তাহা আমরা বেদনিবদ্ধ মধ্য হইতেও প্রমাণিত করিতে পারি। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ষষ্ঠকাণ্ডগত নবম অনুবাকে লিখিত আছে, পূর্ব্বে মানুষ সকল প্রথমে পশ্বাদির ন্যায় অবিভক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করিত। পরে ইন্দ্র তাহাদের সেই ধ্বনিকে বিভাগ করতঃ তদ্দ্বারা বর্ণ, পদ ও বাক্য নির্ণয় করেন, সেই হইতে তাহারা ব্যাকৃত বাক্য বলিতে শিখিয়াছে। সেই ব্যাকৃত বাক্যের বিবরণ প্রকাশ করাই ব্যাকরণের কার্য্য।

"বাক্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্। ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণে মহ্যং চৈব বায়বেচ সহ গৃহ্যাতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ্যতে। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে। তদেতদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বং।"

সুন্দরবন।

—★—

সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাস সবিশেষ জানা যায় না। খাঁ জাহান বা খাঞ্জাআলি নামক জনৈক মুসলমান পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়াধিপতির নিকট জাইগির পাইয়া খুলনা জেলার বাগেরহাটের সন্নিকটে অনেক আবাদ করেন। তিনি তাঁহার এলাকায় সম্পূর্ণ রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। ইংরাজি ১৪৫৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০০ বৎসর পরে বাঙ্গলার শেষ রাজা দাউদ দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যখন অস্ত্র ধারণ করেন তখন তাঁহার একজন হিন্দু মন্ত্রী সুন্দরবনে রাজত্ব পাইয়া খুলনা জেলার কালিগঞ্জ থানার নিকট ঈশ্বরিপুর নামে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ ঈশ্বরিপুর হইতে যশোহর নামের সৃষ্টি। তাঁহার পুত্র প্রতাপাদিত্য দ্বাদশ ভুঁইয়ার মধ্যে একজন, এবং নামে দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও স্বাধীন নৃপতির ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি বিদ্রোহী হন ও আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া বন্দী হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মগ ও পর্ত্তুগীজ্ দস্যুদের উৎপীড়নে অনেক লোক সুন্দরবন হইতে পলায়। প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমায় খাঁ জাহানের সমাধিমন্দির ও সাত গুম্বজ এবং ঈশ্বরিপুরের ভগ্নাবশেষ, চব্বিশপরগনা জেলার ঝাটর দাদের মন্দির, খুলনা জেলার কালিগঞ্জ থানার নিকট নবরত্নমন্দির আছে। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে ১৭৮২ সালে যশোহর জেলার প্রথম জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হেন্‌কেল্ সাহেব সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া আবাদ করান। ১৭৮৭ সালে তিনি সুন্দরবনের আবাদ কার্য্যের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট নিযুক্ত হন এবং ২১০০০ একুশ হাজার বিঘা জমি তখন আবাদ হয়। বর্ত্তমানে যে হেনকেল্‌গঞ্জ গ্রাম আছে তাহা তাঁহার নাম অনুসারে সৃষ্টি হয়। পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারেরা সুন্দরবনের সীমানা উল্লঙ্ঘন করায় হেন্‌কেল্ সাহেব তদানীন্তন বোর্ড অব্ রেভিনিউতে রিপোর্ট করেন। কিন্তু তাঁহার রিপোর্টে কোনও হুকুম হয় নাই ও সুন্দরবনের আবাদ কার্য্য ১৭৯০ সালে বন্ধ করা হয়। তাহার ফলে আবাদী জমি অনেক স্থলে পুনরায় জঙ্গল হইয়া দাঁড়ায়। ১৮০৭ সালে পুনরায় আবাদের দরখাস্ত পড়ে। ১৮১৬ সালে সুন্দরবনের কমিসনারের পদ সৃষ্টি হয়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ পদ উঠাইয়া জেলার কলেক্টরের হস্তে সুন্দরবনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বরিশাল যাইতে সুন্দরবনের ভিতর দিয়া ৩টি বিভিন্ন পথ আছে। কালীঘাটের নিকট যে আদিগঙ্গা আছে উহার নাম টোলির নালা। মেজর টোলি গবর্ণমেন্টের অর্থসাহায্য না লইয়া ইংরাজি ১৭৭৬ সালে ঐ খাল গভীর করিয়া কাটান। ১৮০৪ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ খাল স্বীয় তত্ত্বাবধানে লন। ১টি পথ ঐ টোলির নালা দিয়া কলিকাতার ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব

সামুকপোতা দিয়া মাৎলা বা পোর্টক্যানিং হইয়া পূর্ব্ব উত্তর দিকে বিদ্যাধরী নদী বাহিয়া গিয়াছে। এই পথে খুব বৃহৎ নৌকা যায় এবং ইহাকে বাহিরের পথ বলে। দ্বিতীয় পথ বা ভিতরের পথ ধাপা হইতে বালিয়াঘাট ও ভাঙ্গর খাল দিয়া শিব্‌সা নদী দ্বারা খুলনা গিয়াছে। তৃতীয় পথ ভাগিরথীর তীরে মাড্‌-পইণ্ট হইতে পূর্ব্বদিকে সগর দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া বড়তলা খাল দ্বারা যাওয়া। এই পথে বড় বড় ষ্টীমার চলে। কলিকাতার যাবতীয় বৈদেশিক ষ্টীমার আসে। সুন্দরবনের ভিতর বহুদিন পূর্ব্বে ২টি বৈদেশিক জাহাজ ভিড়িবার আড্ডা বা পোর্ট করার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ঐ দুই স্থানের নাম মাৎলা বা পোর্টক্যানিং ও মোরেল্‌গঞ্জ। উভয় স্থানই গবর্ণমেণ্ট হইতে পোর্ট বা বন্দর বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৬২ সালে মাত্‌লায় মিউনিসিপালিটি বসান হয়। ১৮৬৫ সালে পোর্টক্যানিং কোম্পানির সৃষ্টি হয়। ঐ কোম্পানি পার্শিগণের তত্ত্বা-বধানে ও উহার অংশীদারগণ বোম্বাইএর লোক। বর্ত্তমানে উহা জঙ্গল আবাদের কার্য্য করে ও জমিকোম্পানি নামে অভিহিত। উভয় স্থানই বৈদেশিক জাহাজের পোর্ট হইবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হইয়া ঐ কার্য্যে নিয়োজিত হয় না। ফ্রেজারগঞ্জে তারহীন টেলিগ্রাফের ষ্টেসন করা হইয়াছে। সকলেই অবগত আছেন ডায়মণ্ড হারবারে পোর্ট করার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ভাগিরথীর মুখে সগর দ্বীপে লাইট্‌হাউস্ বা আলোকমন্দির আছে। এখানে বৃহৎ মেলা বসে।

নয়শত বৎসরের অগ্নি।

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও বসন্তে, বারমাস সম-ভাবে একটা বিশালকুণ্ডে অগ্নি জ্বলে, এক মিনিটের জন্যও নির্ব্বাপিত হয় না—অথবা হইতে পায় না—এমন অদ্ভুত বৈশ্বানরদেবের কথা কোথাও পাঠ, শ্রবণ বা দর্শন করিয়াছ কি? শীতের ভীষণ শৈত্য, নিদাঘের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা, প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, শরতের শিশির এবং তদ্ভিন্ন বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত, বর্ষা,ভূমিকম্প, ঝটিকা, জলকম্প প্রভৃতি উৎ-পাতেও এই কৌতুককর হুতাশন নির্ব্বাপিত হয় না, নয়শত বৎসর ক্রমান্বয়ে সমভাবে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, এমন অপূর্ব্ব স্থান বা অপূর্ব্ব হুতাশনদেবকে কখন দেখিয়াছ কি? ইহা আগ্নেয় গিরির গুহা বা গহ্বর নহে, ভূগর্ভস্থিত দাহ্য পদার্থের খনি নয়, অথবা পঞ্চনদপ্রধৌত পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত জ্বালামুখীর অগ্নিশিখা নহে, অথচ ইহা বার মাস সমভাবে প্রজ্বলিত। ইহার নির্ব্বাণ নাই, হ্রাস বৃদ্ধি নাই। এই

সুপ্রাচীন, পবিত্র ও অত্যাশ্চর্য্য অগ্নিকে দর্শন করিতে হইলে, নীল তরঙ্গমালাউদ্বেলিত মহাসাগর পার হইয়া বাষ্পীয় তরণীযোগে ইউরোপ বা আমেরিকা যাইতে হয় না; ইহা আমাদের স্বদেশ ভারতবর্ষেই অবস্থিত। এই অগ্নি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভক্তপুরুষদিগের দ্বারা মহাযত্নে সুরক্ষিত। যে জাতির অর্থ, যত্ন, পরিশ্রম, চেষ্টা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে ইহা এত সুদীর্ঘকাল সুরক্ষিত আছে, তাহাদের অধ্যবসায় কি প্রবল! ধর্ম্মস্পৃহা কি বলবতী! অগ্নিদেবের প্রতি তাহাদের ভক্তি কি অচলা!

এই অদ্ভুত স্থান ও সুপ্রাচীন অগ্নি সন্দর্শন করিতে যাঁহারা অভিলাষী তাঁহাদের সুবিধার জন্য, বিশেষতঃ তাঁহাদের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, সর্ব্বাগ্রে আমি ঐ পবিত্র স্থানে যাইবার পথের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে আকাঙ্ক্ষা করি। আমি সহজ পথের কথাই উল্লেখ করিব

কলিকাতা রাজধানী হইতে সর্ব্বপ্রথমে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সাহায্যে বোম্বাই নগরে যাইতে হয়। বোম্বাই সহরে যে কয়েকটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে, তন্মধ্যে কোলাবা নামক ষ্টেশনে টিকিট লইয়া বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল রেলওয়ে নামধেয় লাইন দিয়া উদ্‌বাদা (Udvada) নামক ষ্টেশনে অবতরণ করা আবশ্যক। এই প্রশস্ত রেলওয়ে লাইন প্রায় সমগ্র রাজপুতানা, মালোয়া ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বেষ্টন করিয়া আছে। বোম্বাই নগর হইতে উদ্‌বাদা ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এক টাকা দুই আনার অধিক নহে; দূরত্বের পরিমাণ ৭০ ক্রোশের বেশী নয়। সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার কিছু অধিক সময় মধ্যে বোম্বাই হইতে উদ্‌বাদায় পৌঁছিতে পারা যায়। রাত্রি অপেক্ষা দিবাকালে ভ্রমণ অধিকতর নিরাপদ ও সুবিধাজনক। এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ সুরাট জেলার অন্তর্গত।

উদ্‌বাদা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ন্যূনাধিক সার্দ্ধ দুই ক্রোশ (পাঁচ মাইল) পথ গমন করিলে উদ্‌বাদা গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। এই গ্রামেই ঐ অত্যাশ্চর্য্য অগ্নি এবং অগ্নিমন্দির প্রতিষ্ঠিত। গুজরাট প্রদেশের সৌরাষ্ট্র (সুরাট) জেলায় এই গ্রাম অবস্থিত। উদ্‌বাদা সুবৃহৎ গ্রাম; এখানে ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস, স্কুল, হাট, বাজার, দোকান প্রভৃতি দেখা যায়। ঐ গ্রামের নাম অনুসারে রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম হইয়াছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ভোজ্যদ্রব্য সহজে ও সুলভে মিলে। অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই অগ্নি-উপাসক পার্শী জাতি; ইহাদেরই এই মন্দির, এবং মন্দিরাভ্যন্তরে এই সুপ্রাচীন হুতাশন।

মে ও জুন মাসে এবং অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে মন্দিরে অগ্নিদেবের উৎসব হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে বহু পার্শীযাত্রী এখানে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আগমন করে। পার্শীকেরা মে মাসকে "আদার" মাস এবং অক্টোবর মাসকে "আর্দ্দিবেহেস্ত" মাস কহিয়া থাকে। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে উদ্‌বাদা গ্রামে যাতায়াত করিবার জন্য যে পথ আছে তাহা সুন্দর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পার্শীজাতি অনেক টাকা ব্যয়ে, অতি প্রাচীনকাল হইতে, যাত্রীবর্গের সুবিধার জন্য এই পথকে যত্নের সহিত সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে অশ্ব, অশ্বশকট, বলদশকট, পাল্কী এবং

তদ্দেশীয় বাঁশ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত এক প্রকার গুজরাটী গাড়ী বারমাস সকল সময়েই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যানের ভাড়াও অধিক নহে।

উদবাদা গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া নবাগন্তুকেরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই কেবল পার্শি জাতির গতিবিধি দেখিতে পাইবেন। সমস্ত গ্রামটা পার্শি পুরুষ ও রমণীতে গিজ্‌গিজ্‌ করিতেছে। কোন কোন পার্শীর গলায় পৈতা (উপবীত) দেখিতে পাইবেন। ইহারা অগ্নিউপাসক অগ্নি-হোত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়, অগ্নিকে অত্যন্ত পূজ্য ও পবিত্র বিবেচনা করে: তামাকু, চুরট প্রভৃতির ধূম্রপান করে না; অপবিত্র ভাবে অগ্নিকে স্পর্শ করে না এবং কাহাকেও করিতে দেয় না। মৃতদেহ অগ্নিতে দাহ হয় না; শবে অগ্নিস্পর্শ নিষিদ্ধ। ইহারা পৈতের গোচ্ছা কখন সোনার হারের মত গলায় জড়াইয়া রাখে, কখন বা ব্রাহ্মণের মত কাঁধে ঝুলায়। পার্শীদিগের মধ্যে পৈতা গ্রহণ প্রথার নিয়ম ছিলনা; বিগত ৮০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের পার্শীরা কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু ইহা তাহাদের সামাজিক প্রথা নহে। বোম্বাই নগরে কামা নামে সম্প্রতি এক মহা ধনবান পার্শী বণিকের মৃত্যু হইয়াছে, তিনি অপুত্রক থাকায় মরণের কিছু পূর্ব্বে তিন কোটি টাকা সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। যে সকল হিতকর কার্যে ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহার মধ্যে ইহাও একটা, "পার্শী সন্তানদিগকে উপবীতি করার সুবন্দোবস্ত করা।" মন্দ কথা নয়! সাধু সাধু!! যাহারা প্রকৃত উপবীতের অধিকারী এবং সত্যাদি যুগ হইতে যজ্ঞসূত্র (পৈতা) ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা এখন আর পৈতা রাখিতে চাহেন না, পৈতা ফেলিয়া দিতে পারিলে বাঁচেন; কারণ পৈতার এখন আর কোন মান্য নাই। উড়ে দেশের লোকেরা কলিকাতায় আসিয়া মিউনিসিপাল ম্যাথরদিগের সদ্দারী করে, ইহাদের গলাতেও পৈতা; আর যাহারা গরুর গাড়ী চালায়, মাটি খোঁড়ে, রেলওয়ে ষ্টেশনে মোট বয়, তাহাদেরও গলায় পৈতা!! আর পশ্চিম প্রদেশের তো কথাই নাই; সে দেশে যা'র তা'র গলায় পৈতা!! সুতরাং যথার্থ উপবীতাধিকারীগণ আর এখন পৈতার বড় প্রয়োজনীয়তা দেখেন না। সেকালে ভদ্রলোকেরাই শাল, জামিয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করিত; এখন ঢুলি, বাজনদার, কাঁশীওয়ালা ছোক্‌রা, ম্যাথর, মুচি, হাড়ি, ডোম পর্য্যন্ত শাল গায়ে দিয়ে গোঁফ ফুলায়ে বেড়ায়, সুতরাং ভদ্রলোক আর শাল গায়ে দিবে কেন? এখনকার কালে যার খুসী হচ্ছে, সেই পৈতা পরছে, সুতরাং পৈতার আর মান্য কোথায়? তাঁতির ঘরে সুতা সস্তা, পৈতাটাও ওজনে ভারি নয়, বিশেষতঃ গলায় একটা সুতা থাকিলে অনেক সময়ে অনেক কাজের সুবিধা হইতে পারে, সুতরাং পৈতা পরার প্রথা ক্রমে ক্রমে আপামর সাধারণ মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠিবে। ত্রিবাঙ্কোড়, কোচিন, মালাবার উপকূল প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল ব্রাহ্মণসন্তান রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অনেকের গলায় পৈতা আছে, তাহারা বলে "আমরা বামুণ খৃষ্টান; আমরা যা'র তা'র সঙ্গে খাইনা বা সামাজিকতা করি না।" ধন্য ধন্য!!

সাধু সাধু!! এখন বাকী রৈল কেবল পেঁড়োর মোল্লা ও মৌলবী চাচারা!! এঁদের এক একটা কোরে পৈতা হ'লে যেন সোণায় সোহাগা হয়।

যাহাহউক, উন্তাদার সুপ্রাচীন ও সুপবিত্র বৈশ্বানর মন্দির ও তাহার অভ্যন্তরস্থ ঐ কৌতুককর আগুনের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতে হইলে, পারস্য দেশের ইতিহাস ও পার্শীজাতির সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। সে সকল গুরুতর পুরাতন কথার আলোচনা করিবার সময় ও সুবিধা নাই, আপাততঃ প্রয়োজনও দেখি না; যে কয়েকটা কথার নিতান্ত আবশ্যক, এস্থলে তাহাদেরই উল্লেখ করিয়া উন্তাদার অত্যাশ্চর্য্য অগ্নির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

অতি পুরাকালে পারস্য ও তাহার সন্নিকটস্থ সমুদয় দেশের লোকেরা চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির পূজা করিত।

তখন আরব দেশে মহম্মদের জন্ম হয় নাই। পারস্যবাসীদিগের ঐ পূজার পদ্ধতি হিন্দুদিগের ন্যায় ছিল। পার্শীকদিগের শাস্ত্রীয় ভাষার নাম জেন্দ, ইহা অত্যন্ত কঠিন। ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম জেন্দাবস্থা, ইহা অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। পার্শীকেরা জ্যোতিষ্ক পদার্থের পূজা করিতে করিতে অগ্নি-উপাসক হইয়া পড়েন এবং অগ্নিকেই সেই বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর ভাবিয়া পূজা করিতে থাকেন। ক্রমে গ্রীক সৈন্যেরা পারস্যের কিয়দংশ হস্তগত করায় পারস্য দেশে গ্রীশ দেশের ন্যায় মূর্ত্তিপূজা প্রথার প্রচলন হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু ঐ মূর্ত্তি প্রধানতঃ অগ্নির। অনেক কাল পরে আরব দেশে মহম্মদ প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর মুসলমানেরা পারস্য দেশ আক্রমণ করে এবং ছলে, বলে, কৌশলে, প্রলোভনে বহু পার্শীকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লয়। যাহাদিগকে কোন মতেই মুসলমানেরা দমন করিতে বা যবন করিতে পারে নাই, প্রচুর অর্থদণ্ড গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পরিণামে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। এইরূপে সে দেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রবর্ত্তিত হইলেও পার্শীজাতির বংশ থাকিয়া যায়। এখনও পারস্যে অনেক অগ্নি উপাসক পার্শীক আছে, কিন্তু ঐ দেশ এখন প্রধানতঃ ম্লেচ্ছ। যে সকল পার্শীক অর্থদণ্ড দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি যবনেরা পুনঃপুনঃ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে অনেকদল পার্শীক আশিয়া মহাদেশের নানাস্থানে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে ভারতবর্ষে এক সম্প্রদায় আগমন করেন, তাঁহাদেরই বংশধরগণ এক্ষণে ভারতবর্ষে পার্শী জাতি বলিয়া আখ্যাত। পার্শীরা এখন সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসী হইয়া পড়িয়াছেন এবং ভারতবাসী বলিয়াই পরিচয় দেন। সমস্ত ভারতবর্ষের পার্শীদিগের মাতৃভাষা এখন গুজরাটী।

যে সম্প্রদায় পারস্যদেশ হইতে ভারতে আগমন করেন, তাঁহারা ঐদেশ হইতে অগ্নি লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই অগ্নি পারস্য দেশে তাঁহাদের যত্নে রক্ষিত ছিল, কখন নির্ব্বাপিত হইতে পায় নাই। সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁরা "দ্বীপ" নামক স্থানে ভারত মহাসাগরের তটে, গুজরাট প্রদেশে, উত্তীর্ণ হয়েন। তখন অনাবর্ত্ত নামে হিন্দু রাজা ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পার্শীদিগকে

সদাচারী ও অগ্নিহোত্রী দেখিয়া আশ্রয় দেন এবং গুজরাটে বাস করিবার আদেশ প্রদান করেন। গুজরাটের সর্ব্বত্র এখন পার্শীদের বসতি, ইহাদের মাতৃভাষা এখন গুজরাটী; স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষাও গুর্জ্জরদেশীয়া স্ত্রীলোকের ন্যায়। "দ্বীপ" নামক স্থান হইতে কয়েক বৎসর পরে উদ্‌ভাদায় ঐ অগ্নি স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তদনন্তর মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়। ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যাদি করিয়া পার্শীজাতি এক্ষণে অত্যন্ত ধনবান হইয়া উঠিয়াছে এবং ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকে রাজকীয় উচ্চপদও লাভ করিয়াছে। কিন্তু অগ্নিপূজা ইহারা এখনও ছাড়ে নাই। ছাড়ে নাই বলিয়া এখনও জাতীয়ত্ব বজায় আছে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, উদ্‌ভাদার অগ্নি ভারতে আনীত হইবার পূর্ব্বে উহা পারস্য দেশে অবস্থিত ছিল। ভারতবর্ষ এবং পারস্য এতদুভয় স্থানে উহার অবস্থিতিকাল লইয়া হিসাব করিলে উহার বয়ক্রম নয়শত বৎসরের ন্যূন হয় না। পার্শীরাও তাহাই কহেন। যখন উদ্‌বাদায় অগ্নি স্থানান্তরিত হয় তখন মন্দিরের আকার ক্ষুদ্র ছিল, কালে উহা খুব বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। উহার প্রাঙ্গণও খুব বড় হইয়াছে। অনেকের যত্নে ও টাকায় মন্দির ক্রমে ক্রমে সুবৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। কেহ অবিত্রাবস্থায় মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে পারে না। অপার্শীকগণ অগ্নিদেবের কাছে দাঁড়াইতে অধিকারী নহে, কিছু দূর হইতে অগ্নিদেবকে দর্শন করে। স্পর্শ করিবার অধিকার প্রধান পুরোহিত ভিন্ন আর কাহারও নাই। প্রধান পুরোহিতকে দেখিলে বৈদিক ঋষি বলিয়া বোধ হয়। পার্শীক ভিন্ন অগ্নিকুণ্ডের সীমায় কেহ যাইতে পায় না। মন্দিরে চিত্রবিচিত্র অধিক কিছু নাই, কিন্তু ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। সময়ে সময়ে মেরামত ও সংস্কার হয় বলিয়া এই অতি প্রাচীন মন্দিরকে সহজে "পুরাতন" বলিয়া বোধ করা যায় না। মন্দির খুব শক্ত এবং সুরম্য।

বৃহৎ কুণ্ডের ভিতর অগ্নি থাকে। চন্দন, শিমি, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র কাষ্ঠ দ্বারা চব্বিশ ঘণ্টা ইহাকে প্রজ্বলিত রাখা হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তে চৌকি দিবার জন্য দলে দলে বেতনভোগী লোক নিযুক্ত থাকে। ইহারা সকলেই পার্শী। অগ্নিতে কাষ্ঠ দিবার জন্য বহুলোক নিযুক্ত আছে। উপরে আচ্ছাদন, চারিদিকে লৌহের বেষ্টন এবং নিকটে মূল্যবান মর্ম্মর প্রস্তরের "বাঁধ"। ধুঁয়াতে কাহারও কষ্ট নাই, ইহা স্নিগ্ধ ও সুগন্ধ। ভস্মসমূহ হিন্দুদের হোমকুণ্ডের "বিভূতির" ন্যায় ব্যবহৃত হয়। পার্শীরা তাহা রোগ, শোক, গ্রহ, বিপদাদির শান্তিজন্য ভক্তিসহকারে লইয়া যায়। যাহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত না হইতে পায় তজ্জন্য সমগ্র পার্শীজাতি সচেষ্ট। ঘটনাক্রমে নির্ব্বাপিত হইলে তাহা আর পূজ্য বা পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং এই আশ্চর্য্য অগ্নির রক্ষার জন্য পার্শীক জাতির যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়, দেবভক্তি, বিশ্বাস ও উৎসাহ কত প্রবল, তাহা ভাবিয়া দেখ।

অগ্নিদেবের প্রতি পার্শীদিগের ভক্তি ও বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকে তাহারা সমস্ত বিশ্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ বলিয়া বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরকে জ্যোতি বলিয়াই ভাবে। এই জ্যোতির্ম্ময় ভগবানের সম্মুখে

ভক্ত পার্শীরা দাঁড়াইয়া ও উপবেশন করিয়া পূজা করে এবং প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে। ভাগবতের মহর্ষি লিখিয়াছেন "দ্রবীভাব পূর্ব্বিকা মনসো ভগবদাকাররূপা ভক্তি" অর্থাৎ যে বস্তুটি প্রেমানলে মানবাত্মাকে গলাইয়া তাহাকে ঈশ্বরভাবে পরিণত করে তাহাকেই ভক্তি কহে। পার্শীগণের ভক্তি ঠিক সেইরূপ।

পার্শীরা সহজে কাহারও শত্রু হইতে চায় না। ইহারা জগৎকে মিত্ররূপ দেখিতে চায় এবং ইহাদের ইচ্ছা এই, সমস্ত জগৎ ইহাদিগকে মিত্রভাবে দেখুক। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র জেন্দাবস্ত গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ আছে। আমাদের যজুর্ব্বেদও এই কথা বলেন।

ওঁ ধৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য চক্ষুষা সর্ব্বাণি।
ভূতানি সমীক্ষে, মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে।
ওঁ ধৃতে দৃংহ মা জ্যোক্ তে সন্দৃশি জীব্যাসং।
(যজুর্ব্বেদ)

ফলতঃ পার্শীজাতির নিরীহতা, ঈশ্বরভক্তি, স্বজাতিপ্রেম, পরিশ্রমপরায়ণতা, ও কার্য্যকুশলতা যেরূপ প্রশংসনীয়, স্বধর্ম্ম ও শাস্ত্রের প্রতি তাহাদের অটল বিশ্বাস তেমনি অনুকরণের যোগ্য।

উদ্ভিদ-তত্ত্ব।

(১)
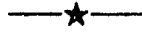
উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাদৃশ্য ও বৈষম্য।

পাশ্চত্য কোন কোন বৈজ্ঞানিকদিগের মতে পদার্থ দ্বিবিধ; জড় ও চেতন। উভয়ের মধ্যে একটা গভীর নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, তরু লতাদির বেলায় তাঁহারা এক সমস্যায় উপনীত হয়েন। উভয়বিধ পদার্থের সহিত কোন কোন অংশে সমধর্ম্মা, অথচ ভূমি ভেদ করিয়া ইহাদের উৎপত্তি, এই কারণে তাঁহারা ইহাদের স্বতন্ত্র' উদ্ভিদ' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু এক শ্রেণীর দার্শনিকগণের মতে চেতনাহীন জড়ের অস্তিত্ব নাই। বৃক্ষ, লতা, কুসুম, এমন কি প্রস্তর খণ্ডেও যে আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, ইহাই বৈদান্তিক ও আধুনিক বিবর্ত্তবাদীর (Evolutionist) মত। আমরা সহজ জ্ঞানে যাহাকে জড় বলিয়া থাকি তাহাতেও আত্মার অবস্থিতি আছে। জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন এই যে মনুষ্য, ইহাতেও যে আত্মা, সম্মুখে পরিদৃশ্যমান ঐ যে অভ্রভেদী

গিরিশৃঙ্গ, উহাতেও সেই আত্মার অবস্থিতি; তবে অবস্থাভেদ মাত্র। আজ আমরা ক্রমবিকশিত হইয়া আমাদের স্বগোত্র প্রস্তরখণ্ড, তরুলতা, কীটপতঙ্গ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র মনে করিতেছি, সৌভাগ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া এই সকল আত্মীয় স্বজনকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতেছি, কিন্তু আমাদিগকে যে কত কোটী বৎসর ঐ সকল অবস্থায় অতিক্রম করিতে হইয়াছে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? স্বাভাবিক নিয়মে আজ আমরা মনুষ্যাখ্যাধারী উন্নত জীব, কিন্তু এমন এক দিন ছিল যে দিন আমরাই উদ্ভিদরূপে বসুন্ধরাকে শ্যামল সজ্জায় ভূষিত করিতাম। আমাদের কোমল পল্লবের মধ্য হইতে নিদাঘের তপ্ত নিশ্বাস প্রবাহিত হইত। মলয় মারুতসংস্পর্শ আমাদের শীতক্লিষ্ট শীর্ণদেহে যৌবন সঞ্চার করিয়া দিত। কুসুমপেলব বাহুবারা লতিকা যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিত তখন আমাদের প্রত্যেক শিরা এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে ভরিয়া উঠিত। আজ আমরা প্রকৃতির সামান্য উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষায় কত আয়োজনে ব্যস্ত। আমাদের সারাজীবন কেবল এই চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে, কিন্তু এমন একদিন ছিল যে দিন আমরা ভক্ত প্রজার ন্যায় প্রকৃতির সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতাম। আমাদের মস্তকের উপর দিয়া কত ভীষণ বাত্যা বহিয়া গিয়াছে, আষাঢ়ের জলদজাল অবিরাম জলধারায় আমাদিগকে সিক্ত করিয়াছে, কিন্তু আমরা নীরবে সমস্তই সহ্য করিয়াছি। জ্ঞানের ক্রমোন্নতির সহিত আমাদের অহমিকারও যে ক্রমোন্নতি হইয়াছে, ইহা হইতে তাহাই সপ্রমান হয়।

উদ্ভিদ যে প্রাণীজগৎ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ইহাই আমাদের প্রতিপাদ্য। এক্ষণে স্থূল চক্ষে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে উদ্ভিদের সহিত আমাদের কতটুকু সৌসাদৃশ্য ও কতটুকু বিভিন্নতা। প্রথমতঃ দেখা যাউক, বিভিন্নতা কোন্ পরিমাণে ও এই বিভিন্নতার কারণ কি?

মোটামুটি উদ্ভিদের সহিত প্রাণীজগতের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে প্রথমেই একটি প্রধান বৈষম্য লক্ষিত হয়। প্রাণীমাত্রেই গতিশীল, কিন্তু উদ্ভিদ গতিহীন। কিন্তু এ বৈষম্যের এক প্রধান কারণ রহিয়াছে। সৃষ্টির পরমুহূর্ত্ত হইতেই প্রাণীজগতের মধ্যে আহার্য্য সংগ্রহের একটা প্রবল চেষ্টা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। এবং এই চেষ্টার ফলে জীব গতিবিশিষ্ট হইয়াছে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে প্রাণী আহার্য্য সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল। এক দিকে এই ব্যাকুলতা ও অপরদিকে বিনা চেষ্টায় আহার্য্য প্রাপ্তির অসম্ভাব্যতা। এই দুই কারণে প্রাণী বিধাতার বিধানে গতিশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উদ্ভিদ বা অচেতন প্রতীয়মান জড়ের নিকট এই চেষ্টার আবশ্যকতা নাই। অচেতনসংজ্ঞক জড়ের আহার্য্যের আবশ্যকতা আছে কি না, বা থাকিলে কিরূপে তাহা সংগৃহীত হয়, তাহা আমার আলোচ্য নহে। উদ্ভিদ যে এক স্থানে স্থির থাকিয়া পত্র ও মূল সাহায্যে স্বীয় ভক্ষ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতেছে ইহা কাহারও অগোচর নহে। শরীরধারণের নিমিত্ত আমাদের যে যে উপকরণগুলি প্রয়োজনীয়, উদ্ভিদেরও তাহাই প্রয়োজনীয়। Carbon, Nitrogen, Hydrogen, Sulphur, Potassium প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি উদ্ভিদের শরীর গঠনের যেমন

সহায়তা করে, আমাদেরও তদ্রূপ করিয়া থাকে। যে সকল দ্রব্যে উক্ত পদার্থগুলি বর্ত্তমান তাহাই আমাদের ভক্ষ্য, কিন্তু উদ্ভিদ এই বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা উন্নত।

ইহারা মূল পদার্থগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা কিন্তু তাহা পারিনা। Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen ও Sulphur লইয়া উদ্ভিদ Protaplasm প্রস্তুত করে এবং এই Protaplasm দ্বারা ইহাদিগের শরীর গঠিত হইয়া থাকে। আজ আমরা বিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা যাহাতে মূল পদার্থগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারি সেই চেষ্টায় মস্তিষ্ক আলোড়ন করিতেছি। Protaid না খাইয়া যাহাতে Nitrogen, বা Vegetables না খাইয়া যাহাতে স্বতঃই Corbo-Hydrates সংগ্রহ করিতে পারি সেই চেষ্টাতেই আমাদের বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তির অনুশীলন করিতেছেন।

ইহাই উদ্ভিদের গতিহীনতার কারণ, ও আমার অনুমান, অন্ততঃ এই এক বিষয়ে উদ্ভিদ আমাদের অপেক্ষা উন্নত।

২। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে আর একটা পার্থক্য সাধারণ চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অনেকে অনুমান করেন, উদ্ভিদের প্রাণ থাকিলেও Consciousness বা বোধশক্তি নাই। ইহা সম্ভবপর কিনা ভবিষ্যতে বিচার্য্য। মন নামক একটা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ প্রাণীজগতের মধ্যে একটা বিষম তোলপাড় উপস্থিত করিয়া থাকে। যদি মনুষ্যপ্রভৃতির ন্যায় উদ্ভিদের উপর ইহার প্রভাব থাকিত, তাহা হইলে যে ইহারা এত সহজে আমাদের আধিপত্য স্বীকার করিত, ইহা অনুমান হওয়া দুষ্কর হইতে পারে।

কিন্তু এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ মীমাংসা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌গণ আজিও করিতে সমর্থ হন নাই, সুতরাং আমরাও এ সম্বন্ধে এক্ষণে নীরব থাকিব।

এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে দেখাইব যে আমাদের সহিত উদ্ভিদের কতদূর সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

১। জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, Struggle for existence and Survival of the fittest :—

প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ সপ্রমাণ করিয়াছেন যে জীবনসংগ্রামে যে সকল প্রাণী যোগ্যতম বা যাহারা পারিপার্শ্বিকের সহিত (Environments) সর্ব্বপ্রকারে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ তাহারাই স্থায়িত্বলাভ করে, এবং অপরে ক্রমশঃ তিরোহিত হয়। আফ্রিকাবাসী নিগ্রো, আমেরিকার আদিম নিবাসী, বা প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীগণ, আধুনিক সভ্যতার পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীর সংসর্গে আসিয়া ক্রমশঃ ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার একমাত্র কারণ Natural Selection বা প্রকৃতিক নির্ব্বাচন। জগতে যত জীবের বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক জীব জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং Struggle for life বা জীবনসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী। এই সংগ্রামে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য বা পারিপার্শ্বিকের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সামঞ্জস্য রাখিতে সক্ষম, প্রকৃতি দেবী তাহাদিগকেই নির্ব্বাচিত করেন। ইহারই নাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা Natural

Selection. যদি সুসভ্য অসভ্য সকল জাতিই সমপরিমাণে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকিত, তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে এক মানবজাতিরই বাসস্থান কুলাইত না এবং তাহা হইলে বসুন্ধরার ভার লাঘবের নিমিত্ত ভগবানকে বহুবার সশরীরে অবতীর্ণ হইতে হইত।

উদ্ভিদজগতেও তাহাই। সকলেই লক্ষ্য করিতে পারেন, এক বৃক্ষে কত সহস্র বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি সকলগুলি হইতেই উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করিত ও তাহাদের প্রত্যেকটির প্রত্যেক বীজ যদি নূতন বৃক্ষে পরিণত হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে এক এক উদ্ভিদেরই স্থান সংকুলান হইত কি না সন্দেহ। উদ্ভিদজগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত পরস্পরের মধ্যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাহারা জয়লাভ করিতেছে কেবল তাহারাই স্থায়ী হইতেছে ও অপরগুলির লোপ সাধিত হইতেছে। উদ্ভিদের প্রত্যেক শাখা, প্রত্যেক পত্রে আলোক ও উত্তাপ লাভের কেমন প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে, তাহা দেখিলে ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। এই অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কেহ অতি ক্ষুদ্র আকারে মানব নয়নের অদৃশ্য থাকিয়া জীবনধারণ করিতেছে, কেহ বা তৃণ হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ লতিকারূপে প্রবলতর কাহারও কণ্ঠলগ্না হইতেছে, আবার যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তাহারা বিশাল মহীরুহরূপে ধরাপৃষ্ঠ সুশোভিত করিয়া সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া রহিয়াছে।

২। আহার ও পানীয়ের প্রয়োজনীয়তা। প্রাণীমাত্রেরই যে আহার্য্য ও পানীয়ের একান্ত আবশ্যকতা আছে ইহা কাহারও অবিদিত নাই, কিন্তু উদ্ভিদও যে আহার্য্য ও পানীয় ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না ইহা সহজেই সকলের উপলব্ধি হইবে। উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য Carbon. এই খাদ্য উদ্ভিদ পত্রদ্বারা বায়ু হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। যদি কোন উদ্ভিদকে কোন আবরণের মধ্যে রক্ষা করা যায়—যাহার মধ্যে কোনরূপে বায়ুপ্রবেশ পথ না থাকে—তাহা হইলে সে উদ্ভিদ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। উচ্চ শ্রেণীর উদ্ভিদের জীবনধারণ নিমিত্ত Carbon ছাড়া আরও অনেক পদার্থ প্রয়োজনীয় ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই গুলি ইহারা মূলদ্বারা মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং এ সকল উদ্ভিদের মূল ছেদন করিয়া দিলে আর ইহারা জীবনধারণে সমর্থ হয় না। আহারের ন্যায় পানীয়ও উদ্ভিদের অতি প্রয়োজনীয়, জলের অভাবে উদ্ভিদ যে জীবনধারণ করিতে সমর্থ হয় না ইহা সকলেই অবগত আছেন।

৩। সন্তান-জনন—সন্তানজনন দ্বারা বংশবৃদ্ধি প্রাণী মাত্রেরই যেমন সাধারণ ধর্ম্ম, উদ্ভিদেরও তাহাই। পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই উদ্ভিদের পুষ্পোদ্গম হয়। এই পুষ্প হইতে ফুল ও ফলে বীজ উৎপন্ন হয়। কালক্রমে এই বীজ সুপরিপক্ক হইলে তাহা হইতে স্বতন্ত্র বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর উদ্ভিদ আছে তাহারা সন্তান উৎপাদন করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ধান্য, গোধুম ইত্যাদি ইহার উদাহরণ স্থল। ইহাদিগকে বর্ষপরিমিতায়ু বা annuals বলিয়া থাকে। সন্তান উৎপাদনই যেন ইহাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাই বীজ পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইবামাত্রই ইহাদের জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

আমরা উচ্চ শ্রেণীর জীব, পুত্র পৌত্র বর্ত্তমানেও পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া সংসার ভোগে আসক্ত হই। কিন্তু যতদিন সন্তানজনন কার্য্য সম্পন্ন না হয় তত দিনই এই সকল ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকে। তাহার পরই কালের অনন্ত গর্ভে কোথায় চলিয়া যায়।

এইরূপ আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয়ে উদ্ভিদের সহিত প্রাণীগণের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। একপ্রকার উদ্ভিদ আছে তাহাদের পত্রগুলি সূর্য্যাস্তের সময় হইতেই মুদিত হইতে থাকে। আবার প্রভাতের সূর্য্যালোক তদুপরি পতিত হইলেই সেগুলি বিকশিত হইয়া উঠে। ইহারা আমাদেরই ন্যায় রাত্রিকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাতের অরুণালোকে জাগরিত হইয়া দৈনন্দিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমাদেরই ন্যায় রাত্রিকালই ইহাদের সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময়। ইহারা যে খাদ্য গ্রহণ করে, সূর্য্যালোকসাহায্যে তাহা পরিপাক করিয়া থাকে। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে ইহাদের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

এক্ষণে দেখা গেল যে উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে। বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র।

মরণ।

জানি আমি, হে মরণ, জনম-অবধি তুমি
চিরসঙ্গী মম,
দুঃখে সুখে শোকে ত্রাসে তুমি আছ মোর পাশে
প্রিয় বন্ধু সম।

গভীর নিশীথে যবে নিদ্রা আসে নেত্রযুগে
ধীরে-ঝিল্লিস্বরে,
তুমি মোর'পরে রাখি' মেলি' নির্নিমেষ আঁখি
জাগিয়া শিয়রে।

উৎসবের কোলাহল— কত হাসি গল্প গান—
আনন্দ উচ্ছ্বাস,
মিলন বাঁশরী বাজে,— তুমি আছ তার মাঝে
চির-অপ্রকাশ।

জানি না সে কোন্ ক্ষণে কোন্ বেশে এসে তুমি
দিবে মোরে দেখা,
খেলা ভাঙ্গি' এ জগতে মুছে দিবে আঁখি হ'তে
শেষ আলোরেখা।

জানি, শিশিরের অন্তে বসন্ত আসিবে লয়ে
মধুর মলয়,
তমিস্রা রজনীশেষে উষা জ্যোতির্ম্ময় বেশে
উদিবে নিশ্চয় ;

উত্তাল তরঙ্গায়িত দিগন্ত-চুম্বিত সিন্ধু
তারো আছে কূল,
জীবন-সাগর-তা'র আছে, আছে পরপার,
কভু নহে ভুল।

হেথা যে মুকুলগুলি ঝরিয়া পড়েছে—সেথা
ফুল হ'য়ে ফুটে,
অসমাপ্ত যত গান লভি' পরিপূর্ণ তান
সেথা বেজে উঠে।

হেথা যে পেয়েছে জ্বালা তা'র তরে আছে সেথা
স্নিগ্ধ শান্তি-ধারা,
সেথায় বিরাম লভে যে জন আছিল ভবে
শ্রান্ত পথহারা।

সেই পরপারযাত্রী তরণীর ওগো মৃত্যু
তুমি কর্ণধার,
নাহি ঘৃণা নাহি দ্বেষ সবা'পরে নির্ব্বিশেষ
করুণা তোমার।

পদে পদে ভুল ত্রুটি যত করি, জাগে মনে
তবু এ সান্ত্বনা,
হে মৃত্যু তোমার করে সর্ব্ব অপরাধ তরে
লভিব মার্জ্জনা।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

—★—

আর্য্য-নারী। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীকালিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম,এ, ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা।

এই পুস্তকের প্রথম ভাগে বৈদিক, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের কয়েক জন মনস্বিনী ও পুণ্যবতী আর্য্য নারীর চরিত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। সমালোচ্য এই দ্বিতীয় ভাগে ঐতিহাসিক কালের কতিপয় মহীয়সী মহিলার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আদর্শস্থানীয় চরিত চিত্রিত হইয়াছে। প্রথম ভাগের আমরা প্রসন্নচিত্তে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলাম। এই ভাগও সর্ব্বথা তেমনই প্রশংসার্হ হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা প্রসাদগুণবিশিষ্ট, বিষয় মনোজ্ঞ এবং যাহাদের জন্য বিশেষরূপে লিখিত তাহাদের পক্ষে ইহা নিঃসন্দেহ শুভঙ্কর। এই পুস্তক বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবার এবং তরুণীগণকে উপহার দিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। ইহার যথাযথ আদর দেখিলে আমরা প্রীত হইব।

গ্রন্থকারদ্বয়কে আমাদের কেবল একটা কথা বলিবার আছে। পরোক্ষভাবেও কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নহে—বিশেষতঃ আমাদের দেশে। বহু শতাব্দী ধরিয়া কুসংস্কারের বেড়া-আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া আমরা প্রায় ভস্মাবশেষ হইয়া পড়িয়াছি; সে অনলে ইন্ধনসংযোগ আর কেন? অহল্যাবাই এবং রাণী ভবানী-চরিতে যে সকল অলৌকিক উপকথার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এমন উপাদেয় পুস্তকে না দেখিতে পাইলেই ভাল হইত। বিশেষতঃ রাজসাহীর কালেক্টর শোর সাহেবের স্বপ্নবৃত্তান্ত যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধিমান্ গ্রন্থকার মহাশয়েরা নিজেদের মুখরক্ষা করিয়া চলিয়াছেন; তাঁহারা এরূপ আভাস দিতে ভুলেন নাই যে এই সকল অলৌকিক উপকথা কুসংস্কারদুষ্ট কল্পনাসমুদ্ভূত। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে এই কৈফিয়ৎটুকু বড় একটা আমলে আসিবে না; উপকথাগুলি কিন্তু মূর্ত্তিমান্ সত্য বলিয়া সাগ্রহে গৃহীত ও মুখে মুখে প্রচারিত হইবে। সেই জন্যই বলিতেছি যে, বিশেষরূপে স্ত্রীপাঠ্য এমন পুস্তকে এ সব অলৌকিক রহস্যের সন্নিবেশ না হইলেই ভাল ছিল। ভরসা করি গ্রন্থকার মহাশয়দ্বয় উদার ভাবেই আমাদের কথার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এবং এই পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে এই সামান্য ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিবেন। এমন পুস্তকের যে আরও সংস্করণ হইবে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে।
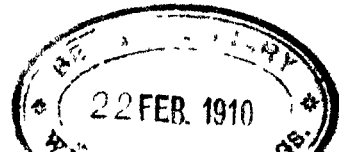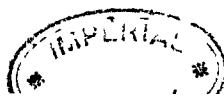
উপাসনা।

কর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচার।

(৭)
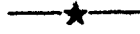
যোগ ও সগুণোপাসনা তত্ত্ব।

(চতুর্থ অংশ)

৫৯। অনেকদূর পূর্ব্বে মনুবচন, শারীরক-সূত্র ও তন্ত্রবাক্যদ্বারা দেখান গিয়াছে যে, পরমাত্মাই স্বয়ং হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি সর্ব্ব দেবতা; এবং সকল দেবতার উপাসনাই তাঁহার। এক্ষণে সর্ব্ব দেবদেবীর সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল প্রদর্শিত হইতেছে।

রজোগুণময়ং চান্য-
রূপং তস্যৈবধীমতঃ।
চতুর্ম্মুখঃ স ভগবান্
জগৎ সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে॥
সৃষ্টঞ্চ পাতি সকলং
বিশ্বাত্মা বিশ্বতো মুখঃ।
সত্ত্বং গুণমুপাশ্রিতা
বিষ্ণু বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ং॥
অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ
সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরঃ।
তমো গুণমুপাশ্রিত্য
রুদ্র সংহরতে জগৎ॥

"(বিষ্ণু পুঃ ক)।

পরমাত্মা যখন জগৎ সৃষ্টিতে প্রবর্ত্ত হন, তখন রজোগুণ ধারণ করেন এবং তাঁহার চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নাম হয়। যখন সত্ত্বগুণ ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বসৃষ্টকে পালন করেন তখন তাঁহার নাম বিষ্ণু হয়। প্রলয়কালে তমোগুণ আশ্রয়পূর্ব্বক যখন জগৎ সংহার করেন, তখন তাঁহার নাম রুদ্র হয়।

তথাচ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে।

রজোভাবোস্থিতো ব্রহ্মা
সত্ত্বভাবোস্থিতো হরিঃ।
ক্রোধভাবোস্থিতো রুদ্র
স্ত্রয়োদেবাস্ত্রয়ো গুণাঃ॥

ব্রহ্মা, রজোভাবে, হরি, সত্ত্বভাবে, রুদ্র, ক্রোধভাবে স্থিত। এই তিন দেবতা এই

তিন গুণ অর্থাৎ প্রকৃতির গুণত্রয়োপলক্ষিত মাত্র।

নতুবা—
"একোমূর্ত্তিস্ত্রয়োদেবা
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবং মনো যস্য
তস্য মুক্তি র্ন জায়তে॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতা এক ব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহার মনে নানাভাব হয়, তাঁহার মুক্তি হয় না। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের অবতার এবং পরমাত্মার সহিত অভেদ, আগম ও পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। বিশেষতঃ গৃহস্থালয়ে এবং তীর্থ স্থানে তাঁহাদের নিত্য পূজা ঐরূপ অভেদ ভাবেই হইয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে।

এতাবতা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ যাঁহাদের নিত্য পূজা আমরা করিয়া থাকি, তাঁহারা সকলে অভেদে একমাত্র ব্রহ্ম, এবং আমরা ব্রহ্ম, পরমাত্মা, বিষ্ণু, ভগবান ইত্যাদি সংজ্ঞায় তাঁহাদের অর্চ্চনা করি। এখন দেখাইব যে, ঈশ্বরের মহাশক্তিস্বরূপিণী পরমা-প্রকৃতির রূপবিশেষ যত মহাদেবী আছেন তাঁহারাও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী এবং তাঁহাদেরও অর্চ্চনা ঐরূপ অভেদ দৃষ্টিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি মহাশক্তিগণের যে অল্প অল্প বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে, তাঁহারা সকলেই পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপিণী। তন্মধ্য হইতে দুর্গা-প্রকৃতির বিবরণটি এ স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) নারায়ণী বিষ্ণুমায়া
পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপিণী।
ব্রহ্মাদি দেবৈর্ম্মুনি-
ভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা॥
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা
সর্ব্বরূপা সনাতনী।
ধর্ম্ম সত্য পুণ্য কীর্ত্তি
যশো মঙ্গল দায়িনী॥
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধরূপা
সিদ্ধিদা সিদ্ধিদেশ্বরী।
বুদ্ধি নিদ্রা ক্ষুৎপিপাসা
ছায়াতন্দ্রাদয়াস্মৃতি॥

(২) এই সকল বচন শ্রীদুর্গার ব্রহ্মত্বকে সংপূর্ণরূপে স্থাপন করিতেছে।

(২) শ্রীশশিভূষণ সিদ্ধান্ত মহাশয় মহা-মহোপাধ্যায় বেদান্তিপ্রবর ৺শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত বিরচিত রুদ্রাধ্যায়ের ভূমিকায় রুদ্রযামলের শক্তিস্তোত্রের যৎকিঞ্চিৎ যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন আমি এস্থানে তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম।

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতী পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতি চ। অতস্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্।"

এই স্তোত্রটি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, যিনি শক্তিদেবী তিনি জগতের জননী, পালয়ত্রী ও সংহারকর্ত্রী; অতএব তিনিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর শশিভূষণ সিদ্ধান্ত মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "কৃষ্ণ, হরি, দুর্গা, কালী, শিব প্রভৃতি

শব্দসকল এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞামাত্র।

(৩) তথাচ মুণ্ডমালাতন্ত্রে মহাদেবের প্রতি ভগবতী পার্ব্বতীদেবীর উক্তি।

"গোলকে চৈব রাধাহং
বৈকুণ্ঠে কমলাত্মিকা।
ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী
ভারতী বাক্‌স্বরূপিণী॥
কৈলাসে পার্ব্বতী দেবী
মিথিলায়াঞ্চ জানকী।
দ্বারকায়াং রুক্মিণী চ
দ্রৌপদী নাগসাহ্বয়ে॥
গায়ত্রী বেদজননী
সন্ধ্যাহঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
যোগ মধ্যে পুষাহঞ্চ
পুষ্পে কৃষ্ণাপরাজিতা॥
পত্রেমাম্বুর পত্রঞ্চ
পীঠে যোনি স্বরূপিণী।
হরিহরার্চ্চিতা বিদ্যা
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা॥
যত্র কুত্র স্থলে নাথ
শক্তিস্তিষ্ঠতি শঙ্কর।
তত্রৈবাহং মহাদেব
নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥"

(৪) মহাশক্তি পার্ব্বতীদেবীর এই উক্তি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তিনিই রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, সরস্বতী, সীতা, রুক্মিণী, দ্রৌপদী, গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত শক্তিস্বরূপিণী। এতদ্ব্যতীত উপরি উক্ত "নারায়ণী বিষ্ণুমায়া" প্রভৃতি বচনে কহিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী, সর্ব্বরূপা, সনাতনী, ধর্ম্ম, সত্য, পুণ্য, কীর্ত্তি, যশোমঙ্গলদায়িনী এবং বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুৎ, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি।

এই প্রকারেব অদ্বৈতবুদ্ধি যে কেবল শাস্ত্রেই প্রচার করিয়াছেন এমন নহে; কিন্তু ধন্য পুরাণ এবং আগম শাস্ত্রের প্রচার! প্রচারক কুলগুরু, অধ্যাপক ও পৌরাণিক কথকঠাকুরদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ, ধন্য তাঁহাদের শিষ্য ও শ্রোতৃমণ্ডলী, ঐ অদ্বৈতবুদ্ধি গৃহস্থের অন্তঃপুর হইতে বহির্ভবন পর্য্যন্ত এবং বিদ্যালয় হইতে দেবালয়ের নাটমন্দির পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে দ্বিধাশূন্যরূপে সুপ্রচারিত হইয়াছে। ষষ্টিবর্ষপূর্ব্বে দেবোৎসবে, চণ্ডীমণ্ডপের নাটমন্দিরে যাত্রার বালকের ও অন্য প্রকার গায়কগণের মুখে আমরা ঐরূপ অদ্বৈতবুদ্ধিপ্রকাশক অনেক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছি। তাহার একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপে এখানে বলিতেছি। ফলে কথাগুলি ঠিক মনে আছে কিনা বলিতে পারি না।

"কালি কে জানে তোমারি অন্ত অনন্তরূপিণী। তুমি মহাবিদ্যা অনাদ্যার আদ্যা ভবভয়বারিণী॥ কেগো শারদে বরদে শুভদায়িনী, সুখদে মোক্ষদে যশোদানন্দিনী, জ্ঞানদে অন্নদে কামখ্যে কামদে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহৃদে বিলাসিনী।

অতএব আমাদের দেশে এই নিশ্চয়াত্মিকা মহা অদ্বৈতযোগবুদ্ধিদ্বারা প্রচলিত দেব ও দেবীগণ চিরকাল হইতে অর্চ্চিত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। এ বুদ্ধিতে যোগ করিবার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। ইহা হইতে ব্যতিরেক করিবারও কিছু নাই।

(৯) মহামায়া।

৬০। অনেকের জানা আছে যে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীগণ প্রকৃতি ও মায়া মাত্র এবং তাঁহাদের পূজা কেবল প্রকৃতির ও মায়ার

পূজা। অনেকের ইহাও জানা আছে যে, জ্ঞানাধিকারে প্রকৃতি ও মায়া পরিত্যাজ্য। অথবা আত্মজ্ঞান জন্মিলে প্রকৃতি ও মায়া জ্ঞানীকে আপনা হইতে ত্যাগ করিয়া যান। এমত অবস্থায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মসনাতনী, নারায়ণী, মহামায়া, পরমা প্রকৃতি নামে সেই প্রকৃতি ও মায়ার এত ঘটা করিয়া পূজা কি নিমিত্তে।

৬১। এ কথার উত্তর এই যে, দর্শনশাস্ত্রে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে মায়া ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত দার্শনিক বিচার আছে তাহা "অবিদ্যা প্রকৃতি"-বোধক, তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিয়া উক্ত ভ্রম ও সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমার বোধ হয় এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের অভাব রহিয়াছে। অতএব যথাশক্তি নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ মীমাংসা প্রদানে যত্ন করিতেছি।

৬২। সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক ও বেদান্তে সৃষ্টিরূপ কার্য্যটি সিদ্ধির নিমিত্ত মায়া ও প্রকৃতির প্রয়োজন, এবং মুক্তির অধিকারে বর্জ্জন, এই প্রান্তদ্বয় ধরিয়া লইয়াছেন। তাহাতেই তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি, আগম ও পুরাণশাস্ত্রের ন্যায়, ধর্ম্মবিধি ও কর্ম্মযোগ বিধান করা তাঁহাদের আবশ্যক ছিল না। অতএব উপরিউক্ত সন্দেহের মীমাংসা এই যে, ভারতবর্ষে দুর্গা, কালী প্রভৃতি নামে যে মহাশক্তির মহাউৎসব সকল অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তিনি ষড়দর্শনের অতিক্রান্ত তত্ত্ব। তিনি বেদস্মৃতিআগমপুরাণবিহিত মহামায়া ও পরমা প্রকৃতি স্বরূপিণী মহাদেবী। জগৎ-কারণস্বরূপিণী যে অবিদ্যাশক্তি, বা সাংখ্য-পরিকল্পিত উপাদানময়ী জড় প্রকৃতি, সেই প্রকৃতির তিন আধার-শক্তি। তিনি ব্রহ্ম হইতে অভিন্না এবং সৃষ্টির বিবর্ত্তকারণ। তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণুশিবাত্মিকা, ব্রহ্ম হইতে অবতীর্ণা, পরমার্থ-শক্তি। দার্শনিক বিচারের অতীতরূপে বেদাগমাদিশাস্ত্রে সেই মহাদেবীর নানামূর্ত্তির বিবিধ মন্ত্রময় পূজায় বৈদিকী, তান্ত্রিকী ও পৌরাণিকী . পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছে। তদনুসারে দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার পূজা হইয়া আসিতেছে। এতাবতা এই সিদ্ধান্ত ধারণ করা উচিত যে, আমরা দর্শনশাস্ত্র বা পুরাণাদি শাস্ত্রের :দার্শনিক প্রকরণের বিবৃত অবিদ্যা প্রকৃতির পূজা করি না; কিন্তু বেদাগম ও পুরাণের বিধান ও মন্ত্র অনুসারে নারায়ণীশক্তির পূজা করিয়া থাকি। সেই সমস্ত মন্ত্র নিত্য এবং গুহ্যাতিগুহ্যতম। তাহার শক্তি ও প্রভাব নরবুদ্ধির অগম্য। এই জন্য ষড় দর্শনের মধ্যে কোন দর্শনকার তৎপ্রতিকূলে হস্তক্ষেপণ করেন নাই। তাঁহারা সকলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও দেবদেবীগণের অর্চ্চনার অনুষ্ঠানকে অপরিহার্য্য কহিয়াছেন।

৬৩। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর। উক্ত দর্শনে সৃষ্টি ও মোক্ষরূপ-আত্মজ্ঞান এই দুইটি প্রধান তত্ত্ব। তাহার আদ্যোপান্তে অচেতন প্রকৃতিরই প্রধানত্ব ও কর্ত্তৃত্ব॥ আত্মজ্ঞান তদতিক্রান্ত। তাঁহা পুরুষ অর্থাৎ আত্মার প্রকৃতি-সম্বন্ধ-ব্যবচ্ছেদক জ্ঞানস্বরূপ কৈবল্য মাত্র। যদিও নিরীশ্বর, তথাপি, সাংখ্যদর্শন বেদস্মৃতি-পুরাণবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম মানিয়াছেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদেতে দেবতা, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল বিষয়ে যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তৎসম্বন্ধে উক্ত দর্শনে কহেন যে, "যোগ্যাযোগ্যেষু প্রতীজন-

কর্ম্মাৎ তৎসিদ্ধিঃ" (কঃ সূঃ ৫। ৪৪)। যদিও বৈদিকগণ, বৈদিক কর্ম্ম ও ফলশ্রুতি ইন্দ্রিয়ের অতীত, তথাপি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য কোন প্রকার বৈদিক জ্ঞান নিরর্থক নহে। তাহার অনুষ্ঠানে আত্মার মঙ্গলার্থে কোন না কোন প্রকার সুকৃতি উৎপন্ন হইবেই। "আনুশ্রবিকোঽহিবেদবিহিতত্বাৎ মাত্রয়াদুঃখাপঘাতকত্বাচ্চ প্রশস্তঃ। সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়োঽপি প্রশস্তঃ। তদনয়োঃ প্রশস্তয়োর্মধ্যে সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয়ঃ শ্রেয়ান্। (বাচস্পতিমিশ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ২য় কারিকা ১৫)। 'আনুশ্রবিক' অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রশস্ত। কেননা তাহা বেদবিহিত। অতএব তদনুষ্ঠান ফলে কিয়ৎপরিমাণে পুরুষের দুঃখনিবৃত্তি হইয়া সুখবৃদ্ধি হইতে পারে। অধোগতির পরিবর্ত্তে স্বর্গভোগ হইতে পারে। অতঃপর প্রকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র এরূপ বিবেকজ্ঞানও প্রশস্ত। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত জ্ঞানই শ্রেয়ঃ।

৬৪। বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা আত্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা শ্রুতিসিদ্ধ। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয়েই তাহা কহেন। ফলে আত্মজ্ঞানের অধিকার সমুৎপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। সেই সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ, পূজা, অর্চনা ইত্যাদি শব্দে কথিত হয়। সাংখ্যমতে, যদিও প্রকৃতি অচেতন এবং তাঁহার পূজা নাই, যদিও ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অসিদ্ধ এবং যদিও পুরুষের আত্মজ্ঞান লাভরূপ কৈবল্যই সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু স্বর্গসাধন বিদ্যাস্বরূপ বৈদিক দেবগণ, কর্ম্মকাণ্ড, ও ফলশ্রুতিজ্ঞাপক তত্ত্বজ্ঞান ও তদনুযায়ী অবান্তর অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা মহাসম্ভ্রমে গৃহীত হইয়াছে। অতএব উমা, মহেশ, লক্ষ্মী, নারায়ণ, সাবিত্রী, ব্রহ্মা, গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা প্রভৃতি যজ্ঞীয় দেবদেবীগণ, যাঁহারা সাধারণতঃ কর্ম্মকাণ্ডে বরণীয় হন, সাংখ্যমতে তাঁহারাই যে পূজনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতঃপর প্রাচীন যজ্ঞাদির স্থলে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, রাধাকৃষ্ণের পর্ব্বোৎসবসমূহ প্রভৃতি দেবদেবীর অর্চনা ও যাহা প্রচলিত আছে, সাংখ্যশাস্ত্রাবলম্বিগণের মধ্যে সে সমস্ত অমান্য হইবার কোন কারণ নাই। অতএব তাঁহাদের মতে অচেতন ও জড় বিধায় প্রকৃতির পূজা না থাকিলেও, বন্ধনহেতু বিধায় তিনি বর্জনীয়া হইলেও এবং মোক্ষকালে কুহকিনীর ন্যায় তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেও, মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত, মহাবিদ্যারূপিণী উমা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, রাধিকা প্রভৃতি মহাশক্তিগণ, এবং মহেশ্বর, নারায়ণ ও হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি দেবগণ অর্চনীয় হইতেছেন। যদি ইহাঁদের প্রতি সাংখ্যমত প্রয়োগ করা যায় তবে এই সকল শক্তিগণ ব্রহ্মশক্তি, এবং সেই সকল দেবগণ ব্রহ্মস্বরূপ, হইতে পারেন না; কেননা, সাংখ্যমতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নাই। কিন্তু ইঁহারা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও আগমবিহিত মন্ত্রময় অনাদি যজ্ঞীয় দেবতা; ইহাই গৌরব। সাংখ্য নিরীশ্বর ও অচেতন প্রকৃতিনিষ্ঠ হইয়াও এবং একমাত্র কৈবল্যসাধনের দর্শন হইয়াও, জীবের আন্তর নিস্তারার্থে উক্ত গৌরবকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার প্রমাণস্বরূপ সাংখ্যসূত্রের ও তত্ত্বকৌমুদীর উক্তি উপরে দর্শাইয়াছি। এই অবান্তর মঙ্গল, পৃথিবী হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্বর্গরাজ্যে উপভোজ্যমান। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হই-

তেই কর্ম্মকর্ত্তা উক্ত ফল লাভ করেন। ইহা কর্ম্মের স্তুতিবাদ মাত্র নহে। কর্ম্মই দেবদেবী এবং মন্ত্রসমবায়ী। তাহাতে এক্ষেত্রে, দেব-দেবীর ও মন্ত্রের স্বতন্ত্র শক্তির বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক। যাহা হউক, ইহা মনে রাখা উচিত যে, যাঁহারা সাংখ্যের প্রকৃতিবর্জ্জন উপলক্ষ করিয়া, বেদপুরাণ-আগমাদিবিহিত পরাৎপরা পরমা প্রকৃতিস্বরূপিণী মহাশক্তি ও সেই শক্তিসমন্বিত ঈশ্বরগণের অর্চ্চনা বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত দর্শনের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে পারেন নাই। সাংখ্য-দর্শন শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড অনাহত রাখিয়া, (ব্রহ্মময়ী মহামায়ার আশ্রিত) প্রকৃতিরূপ উপাদান হইতে সৃষ্টির প্রবাহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদতিক্রান্ত তত্ত্বস্বরূপ আত্মজ্ঞান সংস্থাপন করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত শ্রুতি-বিহিত। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বর্জ্জন, পুজনীয়া মহাশক্তির বর্জ্জন, এবং দেবগণের বর্জ্জন, উক্তদর্শনের সিদ্ধান্তাংশ নহে। অতঃপর ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি কোন দর্শনই দেব-দেবীগণের মন্ত্রময় পূজার প্রতি হস্তক্ষেপণ করেন নাই। তাঁহারা প্রায় সকলেই আত্ম-জ্ঞানকে প্রশস্ততর বলিয়াও কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানকে অনাহত রাখিয়াছেন।

৬৫। বাচস্পতিমিশ্রের অনুমোদিত "আনু-শ্রবিক" অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ড যদি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগ হয় এবং ব্রহ্মা-র্পণ-ন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাই চিত্ত-শুদ্ধির যোগে ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের কারণ হয়। তাদৃশ অবস্থায় কর্ম্মকাণ্ড বন্ধনের হেতু নহে, কিন্তু জ্ঞানের সহ পরম্পরাসম্বন্ধে সমফল-জনক। "একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ" আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মযোগ একই ফলের জনক। হিন্দুসমাজে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা আদি যত প্রকারে শক্তিপূজা হইয়া থাকে, সে সমস্তই ব্রহ্মবুদ্ধিতে ও ব্রহ্মার্পণ-ন্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং তৎসমস্ত আত্মজ্ঞানরূপ মহামোক্ষের পরম্পরা-হেতু।

৬৬। যাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া, যোগস্থ হইয়া, শাস্ত্রবিহিতরূপে দুর্গা, কালী, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি নামাবলম্বিত মহামায়া-স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতির মন্ত্রময় ও দ্রব্যময় মহা-পূজার আচরণ করেন, তাঁহাদের চিত্তে ক্রমে অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্মবুদ্ধির উদয় হয়। এ কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পরেও আব-শ্যকমতে বলিব। ইহা মনে রাখা উচিত যে, অন্তে ব্রহ্মজীবনে সাধককে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

মুদ্রা।

(১)

পুরাকালে মুদ্রা রাজ-সরকার হইতে তৈয়ার হইত না, সাধারণ লোকে ইচ্ছামত মুদ্রা তৈয়ার করিত। প্রাচীন মুদ্রা চতুষ্কোণ, একদিকে কিছু লেখা নাই, অন্য দিকে এক বা একাধিক দাগ দেওয়া। ঐ দাগে মনুষ্য, জন্তু, বৃক্ষ, সূর্য্য প্রভৃতির প্রতিকৃতি আছে। ঐ মুদ্রা শতকরা ২০ ভাগ খাদ মিশান; রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ব্যাবিলনের মুদ্রার অনুকরণে ঐ মুদ্রা গঠিত। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৭ম শতাব্দীতে ব্যাবিলনের লোক সমুদ্র-পথে বাণিজ্য করিতে ভারতবর্ষে আইসে এবং তাহারা মুদ্রা আনয়ন করে। ঐ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রৌপ্য সমধিক প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্ববিধ গঠনের তাম্র-নির্ম্মিত মুদ্রাও ছিল। রৌপ্যমুদ্রা ওজনে ৩২ রতি। গ্রীক-আক্রমণনিবন্ধন ভারতবর্ষে মুদ্রার চলাচলের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ১ম শতাব্দীর শেষ ভাগে রোমীয় মুদ্রার অনুকরণে রাজপ্রতিকৃতিযুক্ত তাম্রমুদ্রা ও পরে স্বর্ণমুদ্রা ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম দেশসমূহে চলিত হয়। স্বর্ণমুদ্রার একদিকে বৃষারূঢ় শিব আঁকা ও তাহাতে এক দিকে গ্রীক্‌ভাষায় ও অন্য দিকে প্রাকৃত ভাষায় রাজার নাম ও উপাধি লেখা আছে। এই সময় হইতে রাজমূর্ত্তি-অঙ্কিত মুদ্রা ভারতবর্ষে চলিতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক রাজা অনেক স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। মুদ্রার একদিকে রাজা দাঁড়াইয়া অগ্নিপূজা করিতেছেন; অন্য দিকে অনেক দেবদেবী আঁকা; যথা সূর্য্য, চন্দ্র, বুদ্ধদেব; গ্রীক-দেবতাও তাহার ভিতর আছে। গ্রীক্ ভাষায় ও প্রাচীন পারস্য ভাষায় "রাজরাজেশ্বর" কথা লেখা। অন্য কথা গ্রীক্ ভাষায় লেখা। পরে হুভিষ্ক রাজার স্বর্ণমুদ্রায় রাজার কোমর পর্য্যন্ত আঁকা। পিতল মুদ্রায় হস্তীর উপর বা সিংহাসনে আসীন রাজমূর্ত্তি। অন্য বিষয়ে কনিষ্ক রাজার মুদ্রার ন্যায়। পরে রাজা বসুদেবের স্বর্ণমুদ্রায় একদিকে রাজা দাঁড়াইয়া অগ্নিপূজা করিতেছেন, অন্য দিকে বৃষারূঢ় শিব আঁকা। অন্য দেবদেবী কিছু নাই। গ্রীক্ অক্ষর লেখা আছে। চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্তের বংশধরগণ ভারতবর্ষের সম্রাট্ হন এবং এই সময়ে সংস্কৃত ভাষার খুব উন্নতি হয়। এই সময়ের স্বর্ণ মুদ্রায় এক দিকে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন ও অন্য দিকে পদ্মপুষ্পারূঢ়া দেবীমূর্ত্তি। লেখা সংস্কৃত ভাষায় ও ব্যাকরণ-শুদ্ধ। হুনজাতি কর্ত্তৃক গুপ্তবংশ ধ্বংস হওয়ার পর হিন্দু-রাজগণের মধ্যে একদিকে পদ্মপুষ্পারূঢ়া দেবী মূর্ত্তি ও অন্য দিকে মাত্র রাজার নাম ও উপাধিযুক্ত মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়, এবং তাহার পরে একদিকে অশ্বারোহী ও অন্য দিকে বৃষযুক্ত মুদ্রার প্রচলন দেখা যায়। সপ্তম শতাব্দীতে দামস্কাসের খলিফা উভয় দিকে ধর্ম্মকথা লিখিয়া মুদ্রা বাহির করেন। ইহাই মুসলমান-

দিগের প্রথম মুদ্রা। এই মুদ্রা ভারতবর্ষেও আইসে। গজনির মামুদ একাদশ শতাব্দীতে আরবী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় লেখা মুদ্রা বাহির করেন। তাঁহার পুত্র মাসৌদ ও প্রপৌত্র মৌদৌদ হিন্দুদিগের অনুকরণে এক দিকে বৃষ ও অন্য দিকে অশ্বারোহী আঁকা মুদ্রা বাহির করেন। সাহাবুদ্দিন বা মহম্মদঘোরী দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পূর্ব্বপ্রকার মুদ্রা চালাইতে থাকেন, কিন্তু তাহাতে উভয় ভাষায় অর্থাৎ নিজের ও দেশীয়গণের ভাষায় লেখাইয়া দেন। আরও হিন্দুগণের লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা তিনি বাহির করেন। ইহার পরে আকবর বাদসাহের রাজত্বের পূর্ব্বে মুসলমানদিগের সময়ে যত মুদ্রা বাহির হয় তাহার কোনওটিতে প্রতিমূর্ত্তি নাই, কেবল আরবী ভাষায় লেখা। কখনও দেশীয় ভাষায় কোনও কোনও অংশের তর্জ্জমাও আছে। আকবর বাদসাহ অনেক প্রকার মুদ্রা বাহির করেন। তাঁহার ৭০টি টাকশাল ছিল। কেবলমাত্র তিন প্রকার স্বর্ণ মুদ্রায় তিনি প্রতিমূর্ত্তি দেন। অন্য গুলিতে কেবল লেখা আছে। ১৫৮৪ সাল হইতে আকবর একরূপ মুদ্রা বাহির করেন তাহাতে আল্লাহু আকবর লেখা। আরবী মাস না লিখিয়া পারস্য মাসের নাম লেখা। সাল তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে গণিয়া লেখা। জাহাঙ্গির বাদসাহের মুদ্রায়, মদের পাত্র হস্তে সিংহাসনে উপবিষ্ট বাদসাহের মূর্ত্তি আছে। তিনি পারস্য মাস ও বৎসর লিখেন। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগের মুদ্রায় তাঁহার নিজের ও নুরজাহানের নাম আছে। কখনও মাসের পরিবর্ত্তে রাশি আঁকা, কিন্তু ইহা খুব অল্প। আওরঙ্গজেবের মুদ্রায় কেবল নাম লেখা, বিধর্ম্মীতে স্পর্শ করিবে বলিয়া ধর্ম্মকথা লেখা নাই। ১৭১৭ সালের জানুয়ারী মাসে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই সহরে মুদ্রা তৈয়ার করার ক্ষমতা পান। ১৭৪২ সালে মাদ্রাজের নিকট আর্কটের মুদ্রা তৈয়ার করায় ক্ষমতা তাঁহারা পান এবং ১৭৫৭ সালে কলিকাতায় টাকশাল বসান হয়। পরে বেনারস, ফরুক্কাবাদ এবং অন্যান্য স্থানে টাকশাল বসান হয়। এই সকল টাকশালে মোগলদিগের বিভিন্ন মুদ্রার অনুকরণ করা হয়; কেবল সিংহ ও পাঁচটি দলযুক্ত প্রস্ফুটিত ফুল যোগ করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন মুদ্রার অনুকরণ না করিয়া ১৭৯৩ সালে কলিকাতার টাকশালায় সাহআলম বাদশাহের রাজত্বের ১৯ বৎসরের প্রচলিত মুদ্রা শিক্কা মুদ্রা গণ্য করিয়া অনুকরণ করা হয় এবং ফরক্কাবাদ টাকশালায় ঐ বাদসাহের রাজত্বের ৪৫ বৎসরের প্রচলিত মুদ্রা অনুকরণ করা হয়। ১৮৩৫—৩৬ সালে আইন দ্বারা ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ উইলিয়মের মুখযুক্ত মুদ্রা প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া প্রচার করা হয়। সেই সময় হইতে মোগল বাদসাহদিগের নামযুক্ত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করা হইয়াছে। পণ্ডিচেরিতে ফরাসীগণের প্রচলিত মুদ্রায় মোরগ ও "লিলি" পুষ্প আছে। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন মুদ্রা তথাকার কলঞ্জ ও মঞ্জাদি ফলের ওজনে গঠিত। তাহাতে বরাহমূর্ত্তি খোদিত।

বাহনতত্ত্ব।

—★—

আমরা যে আদিম্বর্গ মঙ্গলিয়ার ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, আমরাই যে ভূতপূর্ব্ব দেবতা, ইহা বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গেলে, এবং উপনিষদ্-যুগের অত্যুন্নতির পরে একটা অবসাদ আসিয়া ভারতকে আঁঠি সমেত আস্ত গিলিয়া ফেলিলে, অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিলোপ ঘটিলে, নানা কুসংস্কার, নানা অন্ধবিশ্বাস ও ভুলভ্রান্তি আসিয়া ভারতবাসীকে অধঃপাতের দিকে লইয়া গেল, আমরা মানুষ-হনুমানে লেজের সংযোজনা করিলাম, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বানরের কক্ষে পৃথিবী অপেক্ষাও চৌদ্দ লক্ষগুণ বৃহৎ সূর্য্যমণ্ডলটাকে পূরিয়া দিলাম, আর ব্রহ্মার বাহন হাঁস, শিবের বাহন বলদ, যমের বাহন মহিষ, কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর, গণেশের বাহন ইন্দুর গড়াইয়া অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতচন্দ্র গাইলেন—

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া।
ত্রিলোক ভ্রমেন অন্ন চাহিয়া চাহিয়া॥
বড় পুত্র গজানন চারি হাতে খান।
তাঁহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর।
ছোট পুত্র কার্ত্তিকের ছয়মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥

কেবল ভারতচন্দ্র নহেন, স্বয়ং সাক্ষাৎ শঙ্কর শঙ্করাচার্য্যও স্তোত্রে তাল ধরিলেন—

ইদানীঞ্চেৎ ভীতো মহিষগলঘণ্টাঘনরবাৎ।

বস্তুতই কি ব্রহ্মা হাঁসে চড়িয়া বেড়াইতেন, শিবের একটা বুড়া বলদ, কার্ত্তিকের ময়ূর ও গণেশের বাহন ইন্দুর ছিল? বস্তুতই কি যম মহিষে চড়িয়া বাড়ী বাড়ী মড়া কুড়াইয়া ফিরিতেন? সর্ব্বৈব অলীক, সর্ব্বৈব মিথ্যা, সর্ব্বৈব অনিদান ও সর্ব্বৈব অমূলক!

তবে প্রকৃত কথা কি? প্রকৃত কথা ইহাই যে পূর্ব্বকালে মনুষ্যদিগের মধ্যে বানর, ঋক্ষ, হংস, গো, ময়ূর, মূষিক, মহিষ, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, বিদ্যুৎ ও অশনি প্রভৃতি বলিয়া শ্রেণীগত নাম ছিল। একালেও পাবনা অঞ্চলে ভেড়া ও পাঁঠা শব্দ মানুষের সম্প্রদায় বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তথায় "ভেড়া মহাশয়" "পাঁঠা মহাশয়" প্রভৃতি পরিভাষার প্রচলন রহিয়াছে। কায়স্থ ও কৈবর্ত্ত জাতিতে বাঘ ও হাতী উপাধিও প্রচরদ্রূপ। বহুজাতির মধ্যে সিংহ উপাধি প্রচলিত। বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণের মধ্যে মহিষ উপাধি বর্ত্তমান। রঙ্গপুরে শিয়ালু, মৈশালু প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। পাশ্চাত্যজগতেও ফক্স (Fox), হগ (Hog) ও পার্ট্রিজ (Partridge) প্রভৃতি নামের প্রচলনও উক্ত আদিম প্রথার সংসূচনা করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা বহুকাল হইতে যে হংসাদি বাহনে ব্রহ্মাদিদেবতামূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিয়া আসিতেছি, ইহা ভ্রান্তি হইতে সমাগত। মানুষ যুক্তির সাহায্যেও বুঝিতে পারেন যে বস্তুতই স্বয়ং পরমেশ্বরের কোন হাঁসের পিঠে চড়িয়া বেড়ান সম্ভবপর বটে কি না।

আমাদিগের শাস্ত্রে তিন ব্রহ্মার সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মভূ ব্রহ্মা, লোক পিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেষ্ঠী বা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। আত্মভূ বা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিরাকার পরব্রহ্ম, সুতরাং তাঁহার আধারাধিকরণ নিষ্প্রয়োজন। তৎপরে দ্বিতীয় ব্রহ্মা লোকপিতামহ ব্রহ্মা, তিনি আদি মানব, সুতরাং তাঁহার যে কোন ঐতিহ্য তত্ব অনধিগম্য।

কো দদর্শ প্রথমং জায়মানং?

বেদ।

কোন্ ব্যক্তি প্রথমজাত আদিমানবকে দেখিয়াছেন? ন কোপি? সুতরাং তিনি হাঁসে চড়িতেন, কি আর কিছুতে চড়িতেন, তাহা জানিবার বিষয় নহে। তৃতীয় ব্রহ্মা, দেবগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠতম স্বয়ং সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। তিনিও দেবতাখ্য নরই ছিলেন। এমন হাঁস জগতে দেখা যায় না, বা ছিল না, যাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া মানুষ যাতায়াত করিতে পারে। সুতরাং কোন ব্রহ্মারই কোন হাঁস বাহন ছিল না, ইহা ধ্রুবই। তবে আমরা যে হংসবাহন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা গড়াইয়া অর্চনা করিয়া থাকি, ইহার কি কোন মূল নাই? আমরা ত আমাদের আরাধ্য দেবগণের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি, ব্রহ্মার ইহা কোন কল্পিত মূর্ত্তিও হইতে পারে।

না, ইহার একটিও কল্পিত ব্যাপার নহে। সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা চারিবেদে মূর্ত্তিমন্ত ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার উপাধি "চতুর্ম্মুখ" ছিল, কিন্তু আমরা তাহা না জানিয়া তাঁহাকে মুখচতুষ্টয় সংবলিত করিয়া গড়িয়া পূজা করি। ইহা প্রমাদ। তাঁহারও শিবের ন্যায় পাঁচখানি মুখ ছিল, পরে কোন পাপবশতঃ একখানি মুখ খসিয়া যায়, ইহাও ষোল আনা উদ্ভট গল্প। এবং আমরা যে হংসবাহন ব্রহ্মা গড়াইয়া অর্চনা করিয়া থাকি, ইহাও পৌরাণিক ভ্রান্তি হইতে সমাগত। তবে শাস্ত্র ও অমরকোষাদিতে ব্রহ্মার "হংসবাহন" বিশেষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে কেন? "হংস এব বাহনং যস্য স হংসবাহনঃ" ব্যুৎপত্তি কি এইরূপই নহে?

না, ঐ ব্যুৎপত্তি প্রমাদদুষ্ট। প্রকৃত কথা এই যে, উত্তরকুরুপতি সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা হংসাখ্য দেবগণের বাহন বা নেতা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সকলে হংসবাহন বলিয়া বিশেষিত করিতেন।—

হংসান্ হংসাখ্যান্ দেবান্
বাহয়তি চালয়তীতি হংসবাহনঃ।

দেবগণের যে হংস আখ্যা ছিল, শাস্ত্রে কি তাহার কোন প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

বিষ্ণুং কপিলরূপেণ
হংসং নারায়ণং প্রভুং।

এখানে স্বয়ং বিষ্ণু বা নারায়ণকে হংস বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাগবতও বলিতেছেন—

তামাখ্যায় জগৎস্রষ্টা
কুমারৈঃ সহ নারদঃ।
হংসো হংসেন যানেন
ত্রিধামপরমংযযৌ॥ ২০

২৪অ—৩স্কন্ধ।

উপাসতে তপোনিষ্ঠা
হংসং মাং মুক্তকিল্বিষাঃ। ১৮

১৭অ—১১স্কন্ধ।

উদাহৃত শ্লোকদ্বিতয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা "হংস" বিশেষণে সমলঙ্কৃত হইয়াছেন। তবে ভাগবৎ প্রণেতা বোপদেব যে এখানে এই হংসযান

মানুষ-ব্রহ্মাকে জগৎস্রষ্টা ও নারদ (পাপঘ্ন) বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন তাহা সমীচীন হয় নাই। যাহা হউক, তৎকালে দেবগণের মধ্যে যে হংস আখ্যা প্রচলিত ছিল, তাহা ইহাদ্বারাই অনুমিত হইতেছে। কেন দেবগণের মধ্যে হংসাখ্যার প্রচলন হইয়াছিল? সায়ণের বিবৃতি অনুসারে মনে হয়, তদানীন্তন ক্ষমাবান্ শান্তদান্ত দেবগণ হংস উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইতেন। সামবেদ বলিতেছেন—

প্রহংসাস স্তৃপলা বগ্নুমচ্ছ
অমাদস্তং বৃষগণা অযাসুঃ॥ ৬০৩পৃ

তত্র সায়ণভাষ্যং—হসান্ শত্রুভির্হন্যমানা হংসাইব আচরন্তো বা বৃষগণা এতন্নামকা ঋষয়ঃ অমাং শত্রূণাং বলাৎ ত্রাসিতাঃ সন্তঃ অস্তং যজ্ঞগৃহং প্রায়াসুঃ প্রগচ্ছন্তি।

অর্থাৎ যাঁহারা শত্রুকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াও তাহা হংসের ন্যায় সহ্য করিয়া থাকেন, কোন প্রকার প্রতিহিংসা বা অপকার করেন না, তাঁহাদের নাম হংস। ঋষিগণের মধ্যে ঐরূপ পরপীড়াসহিষ্ণু ঋষিগণও "বৃষ" নামের বিষয়ীভূত ছিলেন। এই হংসগণই গুণোৎকর্ষে পরমহংস প্রখ্যাতি লাভ করিতেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি বহু দেবতা এই হংসোপাধিমান্ ছিলেন। ঋগ্বেদ বলিতেছেন—

হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ।

৫-৪১সূ ৪ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—শুচৌ দ্যুলোকে সীদতীতি শুচিষৎ—

অর্থাৎ হংসগণ দ্যুলোক বা স্বর্গে বাস করিতেন। কিন্তু আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়া পিতৃলোক নামে প্রখ্যাপিত হইলে একমাত্র উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকই স্বঃ বা দ্যুলোক বলিয়া সংসূচিত হইত। এবং তাহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ ব্রহ্মার উত্তরকুরুবাসী সাধ্যাদি দেবগণই শুচিষৎ হংস বলিয়া পরিচিত হইতেন, সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁহাদের নেতা (Leader) বা বাহন ছিলেন বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র "হংসবাহন" নামে প্রখ্যাত হয়েন। উক্তঞ্চ ছান্দোগ্যে

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং
তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি
ব্রহ্মণা মুখেন। ১ ৩প্রপা-১০খণ্ড

তিব্বত হইতে উত্তরকুরু পর্য্যন্ত সমুদয় স্বর্গভূমি পাঁচটি অমৃত বা Sanatorium এ বিভক্ত ছিল। সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে উক্ত পঞ্চম অমৃত উত্তরকুরুতে বসবাস করিতেন। সুতরাং আমরা যে হাঁসে-চড়ান চতুর্মুখ ব্রহ্মা গড়াইয়া পূজা করিয়া থাকি, তাহা হিন্দুর শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতেছে।

বলিবে, তবে ভাগবত কেন ব্রহ্মাকে হংসযানে গমন করার কথা বলিলেন? হাঁ, তাহা বলিয়াছেন, এবং উহাতে কোন দোষও হয় নাই। কেন না এ

হংসেন যানেন

কথাটার তাৎপর্য্য ইহাই যে, হংসেন উপলক্ষিতেন যুক্তেন যানেন হংসচিহ্নাঙ্কিত বিমানেন। পূর্ব্বকালে সকল দেবতারই এক একখানি বিমান ছিল। এবং যে দেবতা হংস বৃষাদি যে দলের নেতা ছিলেন, তাঁহাদিগের বিমানে সেই সকল হংস বা গোমূর্ত্তি অঙ্কিত করা থাকিত। তাই ভাগবত ব্রহ্মাকে হংস-

যুক্ত যানে গমনের কথা বলিয়াছেন। ঐ কারণে চণ্ডীতেও ব্রহ্মাণীর হংসযুক্ত যানে গমনের কথা বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়।

যস্য দেবস্য যদ্রূপং
যথা ভূষণবাহনং।
তদ্বদেব হি তচ্ছক্তি
রসুরান্ যোদ্ধুমযযৌ॥ ১৩
হংসযুক্তবিমানাগ্রে
সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি
র্ব্রহ্মাণী যাভিধীয়তে॥ ১৪ ৮৮ অ।
মার্কণ্ডেয়পুরাণ।

যে দেবতার যেরূপ রূপ, যেরূপ ভূষণ ও যেরূপ বাহন, তাঁহাদিগের পত্নীগণ সেইপ্রকার রূপ ও বাহনাদি সমারূঢ় হইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার পত্নী ব্রহ্মাণী অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক হংসচিহ্নিত বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন।

ইহাদ্বারা বেশ জানা গেল যে, ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাণী কোন পাটনাই বড় হাঁসে চড়িতেন না, তাঁহারা বিমান বা ব্যোমযানে চড়িয়া যাতায়াত করিতেন, উহাতে হ স বা হাঁসের মূর্ত্তি মাত্র অঙ্কিত থাকিত। কেন? হংসচিহ্ন দেখিলেই জানা যাইত এই বিমান ব্রহ্মার, পরন্তু অন্য কাহারও নহে। তৎপরেই বলা হইয়াছে—

কৌমারী শক্তিহস্তা চ
ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যান্
অম্বিকা গুহরূপিণী॥ ১৬
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া
ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা
চন্দ্ররেখাবিভূষণা॥ ১৫
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তি
র্গরুড়োপরিসংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ
খড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ॥১৭-৮৮ অ।

অর্থাৎ শক্তিহস্তা কার্ত্তিকেয়পত্নী ময়ূরে, ত্রিশূলধারিণী, মহাহিবলয়া, চন্দ্ররেখাবিভূষণা ভগবতী বৃষে এবং শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ খড়্গহস্তা বিষ্ণুপত্নী গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিলেন।

এই ময়ূর, বৃষ ও গরুড় কি কার্ত্তিক, শিব ও বিষ্ণুর বাহন নহে? না, এই সকল জীবজন্তু তাঁহাদের বাহন ছিল না, কার্ত্তিক ময়ূরাখ্য দেবগণের বাহন বা নেতা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার বিমানে ময়ূরচিহ্ন অঙ্কিত থাকিত। কার্ত্তিকেয়পত্নী সেই ময়ূরচিহ্নযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছিলেন। আমাদিগের ভারতবর্ষেও যে ময়ূরবংশীয় রাজগণ এক সময়ে রাজত্ব করিতেন, ইতিহাসে তাহার সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"এই সময়ে নাস্তিকমতের অত্যন্ত প্রাবল্য হওয়াতে বৈদিকধর্ম্ম উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল। তাহার পর ময়ূরবংশীয় ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ৯ জনেতে ৩১৮ বৎসর। তাহার পর শকাদিত্যনামে পার্ব্বতীয় রাজা এক জনেতে ১৪ বৎসর।" ৫ পৃষ্ঠা রাজাবলী।

সুতরাং বুঝা গেল, কার্ত্তিকের এ ময়ূর বনের পেক্ষমধরা পক্ষী ময়ূর নহে, পরন্তু ময়ূরাখ্য মানবশ্রেণী। কার্ত্তিক তাঁহাদের নেতা (Leader) বা বাহন ছিলেন। ঐরূপ তপোলোক বা মধ্য সাইবিরিয়ানিবাসী—বিষ্ণু,

পক্ষিসমাখ্যের মানবকুলের নেতা ছিলেন। এ পক্ষিগণ বনের পাখী ছিলেন না, জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ ও গরুড়ের চঞ্চুবিস্তারপূর্ব্বক নিষাদ-ভক্ষণের কথা পুস্তীয় গল্প। ফলতঃ বিনতা, দেবগণের মাতৃস্বসা, তাঁহার গর্ভে পক্ষী জন্মিতে পারে না। পক্ষিখ্যাতিবিশিষ্ট দেবগণের মধ্যে গরুড় সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। বিষ্ণু তাঁহারও নেতা ছিলেন বলিয়া বিষ্ণুর খ্যাতি গরুড়ধ্বজ বা গরুড়বাহন। বিষ্ণুপত্নী গরুড়-চিহ্নযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। ঐরূপ শিবপত্নী ভগবতীও বৃষঅঙ্কিত বিমানে চড়িয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন। আমাদের এই মতের সমর্থন জন্য আমরা এখানে রামায়ণ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

> ততো বৃষভমাস্থায়
> পার্ব্বত্যা সহিতঃ শিবঃ।
> বায়ুমার্গেণ গচ্ছন্ বৈ
> শুশ্রাব রুদিতস্বনম্॥ ২৭-৪সর্গ।
> উত্তরকাণ্ড।

অনন্তর শিব পার্ব্বতীর সহিত বৃষভ আরোহণপূর্ব্বক গগনমার্গে গমন করিতে করিতে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

এখানেও শিবের বৃষভ দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইহা হালের গরু নহে—পরন্তু গো বা বৃষভমূর্ত্তি সমলঙ্কৃত শিববিমান। বিমান ভিন্ন শৃঙ্গপুচ্ছসমন্বিত আস্ত গরু বায়ুমার্গে চলিয়া থাকে না। শিবেরও যে বিমান ছিল, তাহা বায়ুপুরাণের বচন বিনির্দ্দেশ করিতেছে।

> তত্রেশানস্য দেবস্য
> সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং।
> মহাবিমানং স্বৈনৈব
> মহিম্না বর্ত্ততে সদা॥ ৭৩-৩৪ অ।

সেই মেরুপর্ব্বতের উর্দ্ধতলে মহাদেব শিবের সহস্রসূর্য্যসঙ্কাশ মহাবিমান আপনার মহিমাদ্বারা সমুদ্ভাসিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

> তত্র তৎ পুষ্পকং নাম
> নানারত্নবিভূষিতং।
> মহাবিমানং রুচিরং
> সর্ব্বকামগুণৈর্যুতং॥ ৬
> মনোজবং কামগমং
> হেমজালবিভূষিতং।
> বাহনং যক্ষরাজস্য
> কুবেরস্য মহাত্মনঃ॥ ৭-৪১ অ।

সেই কৈলাসধামে যক্ষরাজ কুবেরের সেই প্রখ্যাতনামা পুষ্পকরথ বিরাজমান। উহা মনের ন্যায় তীব্রগামী, কামগামী এবং উহার জানালা সকল সুবর্ণখচিত।

বেশ বুঝা গেল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কুবের প্রভৃতি সকল দেবগণেরই একালের বাই-শিকলের ন্যায় একখানি করিয়া বিমান ছিল। শিব বৃষ বা গো আখ্যাধারী মনুষ্যদিগের বাহন বা নেতা ছিলেন, তাই তাঁহার বিমানে বৃষভ ধ্বজ বা চিহ্ন প্রদত্ত ছিল। উক্ত বিমানে আরোহণ করিয়াই শিব যাতায়াত করিতেন, তাই তাঁহার বিশেষণ বৃষভধ্বজ বা বৃষভবাহন। তোমরা অকারণে তাঁহাকে বুড়া বলদে চড়াইয়া খাট করিয়া থাক।

পৃথিবীতে যে গো-আখ্যাধারী মানুষ ছিল, তাহার কোন প্রমাণ আছে? সাম ও ঋগ্-বেদ ত পূর্ব্বেই হংস ও বৃষাখ্যাধারী মানুষের কথা বলিয়াছেন। হবিবংশ প্রভৃতি প্রামাণ্য

শাস্ত্রসমূহও গো-আখ্যাধারী মনুষ্যদিগের সত্তা অবগত ছিলেন। যথা—

দাদৌ স দশ ধর্ম্মায়
কশ্যপায় ত্রয়োদশ।
শিষ্টাঃ সোমায় রাজ্ঞেঽথ
নক্ষত্রাখ্যা দদৌ প্রভুঃ॥ ৪৮
তাসু দেবাঃ খগা নাগা
গাবো দিতিজদানবাঃ।
গন্ধর্বাপ্সরস শ্চৈব
জজ্ঞিরেঽন্যাশ্চ জাতয়ঃ॥ ৪৯-১অ।

প্রজাপতি দক্ষ, আপনার ষাট কন্যার মধ্যে সাধ্যা প্রভৃতি দশটি কন্যা প্রজাপতি ধর্ম্মকে; অদিতি ও দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশটি কন্যা কশ্যপকে এবং নক্ষত্রনামা অবশিষ্ট সাতাইশ কন্যাকে চন্দ্রবংশের আদি বীজী মহারাজ সোম বা চন্দ্রকে সম্প্রদান করেন। তাঁহাদিগের গর্ভেই দেব, দানব, দৈত্য, খগ বা পক্ষী, নাগ বা সর্প, গো বা বৃষভ আখ্যাধারী দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর নাম কি কি?

দিত্যাদিতী দনুঃ কালা
অরিষ্টা সুরসা তথা।
সুরভি র্বিনতা চৈব
তাম্রা ক্রোধবশা ইরা॥
কদ্রুর্ম্মুনিশ্চ ধর্ম্মজ্ঞ
তদপত্যানি মে শৃণু॥ ১২৬
১৫অ ১ম অংশ-বিষ্ণুপুরাণ।

দিতি, অদিতি, দনু, কালা, অরিষ্টা, সুরসা সুরভি, বিনতা, তাম্রা, ক্রোধবশা, ইরা, কদ্রু ও মনু। এতন্মধ্যে সুরভিতনয়গণ গো, কদ্রুতনয়গণ নাগ বা সর্প এবং বিনতানন্দনগণ পক্ষী বা পতঙ্গনামের বিষয়ীভূত। এই সর্প বা নাগগণ বিষধর সাপ নহে; পরন্তু সর্পাখ্য মানুষমাত্র। পরিক্ষিৎকে এই নাগ জাতীয় লোকেরাই নিহত করিয়াছিল। তাঁহাকে তক্ষক বা সাপে কামড়াইয়া ছিল না। জরৎকারু মুনি কি সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন? ব্যাসদেবই মহাভারতে লিখিয়াছেন যে—

পুত্রোয়ং মম সর্প্যাং জাতঃ
মহাতপস্বী স্বাধ্যায়সম্পন্নঃ।

আমার এই পুত্রটি আমার সর্পজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে সমুৎপন্ন। এ অতি মহাতপস্বী ও অতীব স্বাধ্যায়সম্পন্ন। বলা বাহুল্য যে সাপের পেটে মনুষ্যের তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদজ্ঞ সাপ জন্মিয়া থাকে না। অবশ্য ভাগবতে বোপদেব লিখিয়াছেন যে—

ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭
৩১ অ-৭ স্কন্ধ।

কিন্তু এই বর্ণনা পৌরাণিকভ্রান্তিভূমিষ্ঠ। "গিয়া কালীদহের কালজলে ভুজঙ্গ জয় করেছ।" এই কবিগানের ভুজঙ্গও বিষধর সাপ নহে। পরন্তু কালিয় নামক নাগবিশেষ। এই নাগজাতীয় লোকেরাই অনেকে পাতাল বা আমেরিকায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে নাগ, সর্প, দৈত্য, দানব, অসুর ও রাক্ষস, সর্ব্বজাতীয় লোকই রহিয়াছেন। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন—

ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ
কেশরের্নগরোত্তমম্। ৩৮
তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ
শত শীর্ষো মুদাবৃতঃ।

কস্তপাত্মজঃ শ্রীমান্
বাসুকির্নাম নাগরাট্॥ ৩৯
এবং পুরসহস্রাণি
নাগদানবরক্ষসাং। ৪০
সপ্তমে তু তলে জ্ঞেয়ং
পাতালে সর্ব্ব পশ্চিমে।
পুরং বলেঃ প্রমুদিতং
নরনারীসমাকুলম্॥ ৪১
অসুরাশীবিষৈঃ পূর্ণং
উদ্ধতৈ র্দেবশক্রভিঃ। ৪২
তথৈব নাগনগরৈ
র্ঋদ্ধিমদ্ভিঃ সহস্রশঃ ৪৩-৫০ অ।

পাতালের ষষ্ঠতলে (গায়না অঞ্চলে) দৈত্যপতি কেশরির উত্তম নগর অবস্থিত। তথায় সুরসাতনয় কশ্যপাত্মজ শতশীর্ষ নাগরাজ বাসুকি বাস করেন। ষষ্ঠ তলে নাগ, দানব ও রাক্ষসদিগের এইরূপ আরও সহস্র সহস্র নগর আছে। সপ্তম তলে অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্ব পশ্চিমে দৈত্যরাজ বলির বলিভূমি বা বলিভিয়া রাজ্য। তথায় বহু নর নারীর বসবাস। তথায় বহু দেবশক্র উদ্ধতস্বভাব অসুর ও নাগজাতীয় মনুষ্য বাস করে। এবং তথায় নাগগণের সমৃদ্ধিসম্পন্ন বহু নগর বিদ্যমান।

পুরাণের এই "শতশীর্ষ" বিশেষণের অর্থ এমন নহে যে মানুষ-বাসুকির এক শত মাথা ছিল; উহা তাঁহার উপাধিবিশেষ। এবং পুরাণকর্ত্তা যে "আশীবিষ" শব্দদ্বারা মানুষনাগগণকে সংসূচিত করিয়াছেন, উহা তাঁহাদের তৎকালোচিত ব্যবহারগত দোষমাত্র। ঐ সকল বিশেষণ দর্শন করিয়াই অগদ্দর্শীরা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। একজন কবি বলিয়াছেন যে—

খগচর নগধর ফণধরশয়ন

এই কবিবচনেও বিষ্ণুর খগচরদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে বিষ্ণু, তাঁহার মাতৃস্বস্রের বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গরুড়ের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন। আর ভগবান্ বিষ্ণু যে অনন্ত শয়নে শায়ী ছিলেন, উহাদ্বারাও বুঝিতে হইবে না যে পরমেশ্বর সর্পশয্যাশায়ী বটেন। উহাও অলঙ্কারগর্ভ কথামাত্র। অপিচ যদি মনুষ্যদিগের মধ্যে সর্প ও গোজাতীয় লোক না থাকিত, তাহা হইলে শ্রুতিতে—

সর্পা বৈ এতৎ সত্র মাসত
গাবো বৈ এতৎ সত্র মাসত।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

এই সকল বাক্য পরিদৃষ্ট হইত না। অবশ্য সায়ণাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় এই সকল মন্ত্র তুলিয়া দিয়াছেন—

ননু বেদে ক্বচিৎ এবং শ্রূয়তে বনস্পতয়ঃ সত্র মাসত, সর্পাঃ সত্র মাসত, ইতি। তত্র বনস্পতীনাং অচেতনত্বাৎ সর্পাণাং চেতনত্বেপি বিদ্যারহিতত্বাৎ ন তদনুষ্ঠানং সম্ভবতি।

কিন্তু বস্তুতঃ এই বনস্পতি অর্থ বটবৃক্ষাদি নহে, পরন্তু বনের অধিবাসী রাজা এবং সর্প অর্থও বিষধর নহে, পরন্তু মানুষ (নাগারা)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণধৃত বচনের অর্থ এই যে, গোআখ্যাধারী মনুষ্যেরা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বাবুদের Haug সাহেবের অনুবাদে কিন্তু এই "গাবঃ" "cows"এ পরিণত হইয়াছেন!! বস্তুতঃ ইঁহারাই গো-আখ্যাধরী মনুষ্য, শিব ইঁহাদের বাহন বা নেতা ছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম বৃষবাহন বা

বৃষভধ্বজ। বলিবে, তবে বায়ুপুরাণে শ্বেত গোবৃষবাহনের কথা রহিয়াছে কেন?

অনন্যমনসো ভূত্বা
প্রপন্না যে মহেশ্বরং।
তৈর্লব্ধং রুদ্রসালোক্যং
শাশ্বতং পদমব্যয়ং ॥ ৩১৪
ভবস্য রূপসাদৃশ্যং
নীতা শ্চৈব হ্যনুত্তমং।
বৈশ্বানরমুখঃ সর্বে
বিশ্বরূপাঃ কপার্দ্দিনঃ ॥ ৩১৫
নীলকণ্ঠাঃ সিতগ্রীবা
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা স্ত্রিলোচনাঃ।
অর্দ্ধচন্দ্রকৃতোষ্ণীষা
জটামুকুটধারিণঃ ॥ ৩১৬
সর্বে দশভুজা বীরাঃ
পদ্মান্তর সুগন্ধিনঃ।
পিনাকপাণয়ঃ সর্বে
শ্বেতগোবৃষবাহনাঃ ॥
৩১৭—৩৯অ—উত্তর খণ্ড।

এই কথা গুলি, আদি-বায়ুপুরাণের নহে। শিবভক্ত কেহ পরে কোন সময়ে উহাতে এই আবর্জ্জনারাশির প্রবেশ ঘটাইয়াছেন। লোক শিবারাধনা করিলে তাহার দশটি হাত হয়, তিনটি চক্ষু জালায় ও তাহারা শ্বেত বৃষভে চড়িয়া বেড়াইয়া রুদ্রসালোক্য প্রাপ্ত হয়, ইহা বিশ্বাস করিবার যুগ আর নাই। যাহা হউক, শিবের একটা বুড়া বলদ ছিল না, অতঃপর তোমরা ইহাই বিশ্বাস করিও।

অতঃপর আমরা যমের মহিষ বাহনের কথা বলিব। যম কে? তিনি বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আমাদের পিতৃভূমি মঙ্গলিয়ার রাজা ছিলেন। দৈত্যদানবগণ নরক হইতে পাতালে নির্বাসিত হইলে নরকও শেষে যমের শাসনাধীন হইয়াছিল। যমও মর নর ছিলেন ও তিনিও মরিয়া কবে যমের বাড়ী গিয়াছেন। তিনি মহিষাখ্য নরগণের বাহন বা নেতা ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম মহিষবাহন। শঙ্করাচার্য্য পৌরাণিক ভ্রান্তিতে পড়িয়া তাঁহাকে গলঘণ্ট মহিষে চড়াইয়া ছিলেন। বরিশালে এখনও মহিষোপাধিক মানুষ রহিয়াছে। হরিবংশও বলিতেছেন—

শকা যবনকম্বোজাঃ
পারদাশ্চ বিশাম্পতে।
কোলিসর্পা মহিষাশ্চ
দার্দাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ ॥ ১৮
সর্বে তে ক্ষত্রিয়াস্তাত
ধর্ম্ম স্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠবচনাৎ রাজন্
সগরেণ মহাত্মনা ॥ ১৯—১৪ অ।

হে মহারাজ! শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, কোলি, সর্প, মহিষ, দরদ, চোল, ও কেরলগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। মহারাজ সগর বশিষ্ঠের বচনানুসারে ইহাঁদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করেন। এই মহিষবংশেই পৌণ্ড্রকনামে এক রাজা ছিলেন, যম তাঁহারই নেতা বা বাহন ছিলেন, পরন্তু বনের শৃঙ্গপুচ্ছধারী মোষ তাঁহার বাহন বা যান ছিল না। উক্তঞ্চ পুরাণেন—

পৌণ্ড্রকো নাম মহিষো ধর্ম্মরাজস্য নারদ।

হে নারদ, পৌণ্ড্রনামক মহিষ যমের বাহন ছিল। আমরা ইহা হইতে ভ্রান্তি বাদ দিয়া বুঝিতে চাহিব, যম, মহিষাখ্য জাতীয় মনুষ্য পৌণ্ড্রের বাহন বা নেতা ছিলেন।

বলিবে, পুরাণকারগণ ত ঋষি ছিলেন, তাঁহাদেরও এত ভ্রম? ভ্রম ত বেদের মধ্যেও অসংখ্য রহিয়াছে। পড়, অবশ্যই চক্ষে পড়িবে। দেবীযুদ্ধের দৈত্যসেনাপতি মহিষাসুর কি আমেরিকাবাসী মানুষ ছিলেন না?

ষষ্ঠে তলে দৈত্যপতেঃ
কেশরে নগরোত্তমং।
সুপর্বণঃ সুলোমশ্চ
নগরং মহিষস্য চ॥ ৩৮—৫০ অ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

এই মহিষাসুরের একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল, তিনি সেনাপতি ছিলেন, কিন্তু তোমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণে শেষে কি প্রবেশ করাইলে? সেই মানুষ-মহিষে লেজ দিলে, পুচ্ছ দিলে, শৃঙ্গ দিলে। কেবল ইহাই নাই, দেবীর খড়্গাঘাতে সেই পুরুষ মহিষটার পৃষ্ঠদেশ দ্বিধা বিছিন্ন হইলে তাহারই জরায়ুশূন্য উদর হইতে একটি ধনুর্ব্বাণধারী জরায়ুজ মনুষ্যবালক বহির্গত হইল। এখন বুঝিয়া দেখ, প্রকৃত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রকৃত দুর্গতি কাহারা ঘটাইয়াছেন!!! ঐরূপ কুকুরাখ্য মনুষ্য সরমাকেও তোমরা কুত্তী বানাইয়া মহাভারতের পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিয়াছ। বেদে কিন্তু এই দেবশুনী সরমা,' গাভীর সন্ধান বলিয়া দিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে পুত্রের জন্য জায়গীর লইয়াছিলেন। এই মানুষ সরমাশব্দ হইতে আজি কুকুরার্থক সারমেয় শব্দ উৎপাদিত, ফলতঃ স্ত্রীকুকুরের নাম সরমা নহে, ভেউ-ভেউ-করা কুকুরগুলিকে যে তোমরা সারমেয় বল, উহাও তোমাদের ষোল আনা প্রমাদ।

ন্যায়দর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডন।

বৌদ্ধমত যে প্রাচীন, এবং এক সময়ে যে আর্য্যভূমিতে বহু প্রসারিত হইয়াছিল, আর্য্যদিগের প্রাচীন গ্রন্থে ঐ মতের নিরাকরণই তাহা বুঝাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে, ঐ মত যে সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অপরাপর উপধর্ম্মের ন্যায় কল্পনাভিত্তিক ছিল না, ইহাও ঐ নিরাকরণ হইতে বুঝা যায়। অবশ্যই আর্য্য ঋষিদিগের অনুভূত নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মকে বৌদ্ধযুক্তির প্রবল বাত্যায় টলায়মান বা ম্লান হইতে দেখা যায় না; তথাপি ইহা সত্য যে, উহা হইতে বৈদিক মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, আর্য্যজাতির মধ্যেও অগ্নি প্রদক্ষিণের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে চৈত্যবন্দনার ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধযুক্তি "নেতি নেতি" তত্ত্বের অন্তর্ব্যূহ ভেদ করিয়া মৌলিক স্বরূপ তত্ত্বের দিকে যে উপনীত হইতে পারে নাই, ইহা চিন্তাশীল দার্শনিককে স্বীকার করিতেই

হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধদর্শনের আনুপূর্ব্বিক যুক্তিসমূহ আয়ত্ত করার পক্ষে বড়ই অসুবিধা। কেন না, অদ্যাপি বৌদ্ধমতের কোন বিশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অতি সংক্ষেপে বৌদ্ধমত প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং উহা দ্বারা জিজ্ঞাসুর মন পরিতৃপ্ত হয় না। যাহা হউক, যুক্তি-বিপিনের অদ্বিতীয় কেশরী মহর্ষি গোতম যে বৌদ্ধমতের উৎসাদনকল্পে যুক্তির প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

সাঙ্খ্যমতে যে বুদ্ধিকে স্থায়ী ও জ্ঞানকে তাহার সহিত একই ভাবাপন্ন তদীয় বৃত্তিরূপ মানা হইয়াছে—উহার খণ্ডন ৩য় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের আরম্ভ হইতেই চলিয়াছে। সাঙ্খ্যবাদীর আশঙ্কা সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যেরূপ জবা পুষ্পের সহযোগে ধবল স্ফটিকও রক্তিমাভ প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বকীয় বৃত্তিরূপ জ্ঞান হইতে যাহা ভিন্ন নহে, সেই বুদ্ধিকেও বিষয়সংশ্রবে বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। ইহার উপরে বৌদ্ধমতাবলম্বী ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী আপত্তি করিতেছে—

"স্ফটিকেপ্যপরাপরোৎপত্তেঃ
ক্ষণিকত্বাদ্ব্যক্তীনা মহেতুঃ।
৩অ। ২অ। ১১সূ।

স্ফটিকের রক্তিমাভ্রান্তিকে দৃষ্টান্তে রাখিয়া বুদ্ধিকে স্থায়ী ও স্বকীয় বৃত্তির সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায় না, যেহেতু ক্ষণে ক্ষণে অভিনব বিভিন্ন স্ফটিকের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতে বাহ্য বস্তু স্বীকৃত হয় নাই, যাহাদিগকে আমরা বাহ্য বস্তু বলিয়া মনে করি, ঐ সমস্তই ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ অন্তর্ব্বস্তু। নৈয়ায়িক ও অন্যান্য দার্শনিক মতে যেরূপ রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় হইতে জ্ঞানকে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করা গিয়াছে, সেরূপ এই মতে নহে। এই মতবাদীরা বিষয় ও বিষয়ীকে অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয়কে অভিন্ন জিনিষ বলিয়া জানিয়াছিলেন। এই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীরাই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যোগাচার নামে অভিহিত হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

"নিয়মহেত্বভাবাদ্ যথা
দর্শনমভ্যনুজ্ঞা।" ঐ ঐ ১২ সূত্র।

বস্তুমাত্রই যে ক্ষণিক এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, সুতরাং যে স্থলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়, সেই স্থলেই বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার্য্য, কিন্তু সর্ব্বস্থলে নহে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শরীর প্রভৃতির উপচয় ও অপচয় প্রমাণিত বলিয়া কেবল ঐ স্থলেই ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা উচিত, স্ফটিক ও পাষাণ প্রভৃতি পদার্থের উপচয় ও অপচয়ের কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় তাহাদিগকে ক্ষণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু ভৌতিক পদার্থ মাত্রই যে ক্ষণ-পরিবর্ত্তনীয়, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রতিক্ষণেই প্রতি পদার্থ হইতে এক শ্রেণীর অণুপুঞ্জ নির্গত হইতেছে,

এবং উহাতে অপর শ্রেণীর অণুপুঞ্জ আসিয়া নিঃসৃত অণুপুঞ্জের স্থান পূরণ করিয়া লইতেছে।

পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—

"নোৎপত্তি বিনাশ
কারণোপলব্ধেঃ"।

ঐ ঐ ১৩সূত্র।

স্ফটিকাদি পদার্থকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে না, যেহেতু বল্মিকাদি দ্রব্যের উৎপত্তির কারণরূপে অবয়বের উপচয়কে এবং ঘটাদি দ্রব্য নাশের কারণরূপে অবয়বের বিভাগকে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্ফটিকাবয়বের উপচয় বিভাগ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বপক্ষ সূত্র—

"ক্ষিরবিনাশে কারণানুপলব্ধিবদ্দ-
ধ্যুৎপত্তিবচ্চ তদুৎপত্তিঃ।"

ঐ ঐ ১৪।

যেরূপ দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইবার সময়ে দুগ্ধ বিনাশ ও দধ্যুৎপত্তির কারণটা উপলব্ধ না হইলেও অবশ্য স্বীকার্য্য, তদ্রূপ পূর্ব্ববর্ত্তী স্ফটিকের বিনাশ ও পরবর্ত্তী স্ফটিকের উৎপত্তিতে যদিও কারণটাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, তথাপি পূর্ব্ববর্ত্তী স্ফটিকের বিনাশ ও পরবর্ত্তী স্ফটিকের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার করা উচিত।

সিদ্ধান্ত সূত্র—

লিঙ্গতো গ্রহণান্নানুপলব্ধিঃ।

ঐ ঐ ১৫ সূত্র।

দুগ্ধ বিনাশ ও দধ্যুৎপত্তির কারণ যে উপলব্ধির বিষয় নহে ইহা তুমি বলিতে পার না, কেন না প্রত্যক্ষসিদ্ধ দুগ্ধনাশ ও দধ্যুৎপত্তিকে হেতু করিয়া ঐ কারণের অনুমিতি হইয়া থাকে। স্ফটিকের সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে না, কেন না পূর্ব্ববর্ত্তী স্ফটিকের নাশ ও পরববর্ত্তী স্ফটিকের উৎপত্তি কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। অনুমিতির আকারটা এইরূপ—দুগ্ধনাশ ও দধ্যুৎপত্তি সকারণক, যেহেতু উহারা কার্য্য। ইহার উদাহরণে ঘট প্রভৃতিকে রাখা যাইতে পারে।

সাংখ্য মত অনুসারে আপত্তির অবতারণা হইতেছে—

"ন পয়সঃ পরিণাম
গুণান্তর প্রাদুর্ভাবাৎ"।

ঐ ঐ ১৬ সূত্র।

দুগ্ধ হইতে দধি উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যাইতেছে যে, দুগ্ধের নাশ হয় না, কিন্তু উহার পরিণাম বা গুণান্তরের আবির্ভাবই হইয়া থাকে। পরিণামের অর্থ—বিদ্যমান যে ধর্ম্মী, তদীয় পূর্ব্ব ধর্ম্মের নিবৃত্তির পরে অপর ধর্ম্মের উৎপত্তি।

সূত্রকারের মতে আপত্তি ভঞ্জন—

"ব্যূহান্তরাদ্ দ্রব্যান্তরোৎপত্তিদর্শনং
পূর্ব্বদ্রব্য নিবৃত্তেরনুমানং।" ঐ ঐ ১৭।

দুগ্ধ হইতে দধির অন্যরূপ অবয়ববিন্যাস দেখিয়া দধ্যুৎপত্তি ও দুগ্ধ-ধ্বংসের অনুমান হইয়া থাকে।

দুগ্ধনাশ এবং দধ্যুৎপত্তি কারণশূন্যই বটে এইরূপ মানিয়া লইলেও যে স্ফটিকাদির উৎপত্তি বিনাশকে অকারণক বলা যাইতে পারে না, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

"কচিদ্বিনাশ কারণানুপলব্ধেঃ
কচিচ্চোপলব্ধেরনেকান্তঃ।"

ঐ ঐ ১৮ সূত্র।

দুগ্ধ হইতে দধি-উৎপত্তিসম্বন্ধে দুগ্ধনাশ ও

দধ্যুৎপত্তিকে নিষ্কারণক দেখিয়া যে তুমি স্ফটিকাদির উৎপত্তি-বিনাশকেও নিষ্কারণক মানিয়া লইবে তাহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না, কেন না কোন স্থলে উৎপত্তি-বিনাশের কারণ অনুভূত না হইলেও অপর স্থলে অনুভূত হয়, এই জন্য উৎপত্তি-বিনাশের যে কোন কারণ নাই, এ কথাটা ব্যভিচার দোষে কলঙ্কিত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধবিনাশে অম্লসংযোগ, আর দধ্যুৎপত্তিতে অম্লরসযুক্ত পরমাণুসমূহ কারণ।

দার্শনিকাগ্রণী গোতম ঋষি যে, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে সাঙ্খ্য মত নিরাকরণপ্রসঙ্গে ক্ষৌণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহা দেখান গেল। এক্ষণে তিনি যে, ৪র্থ অধ্যায়ের ২য় আহ্নিকে বিশিষ্টভাবে বাহ্যার্থভঙ্গবাদের উৎসাদনপ্রসঙ্গে অপূর্ব্ব যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন তাহা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। আশা করি তাঁহারা ইহার অমিয় রস আস্বাদনের সুখে বঞ্চিত হইবেন না। দার্শনিকসমাজে যে, মহামুনি গোতম উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা দর্শনিক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার আবিষ্কৃত যুক্তিগুলি অতি গম্ভীর ও অভেদ্য। সূত্রসমূহের রচনা-পরিপাটীও অতুলনীয়। যাঁহারা আম্বিক্ষিকী বিদ্যাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক ঐ যুক্তি সমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ অবজ্ঞাটা ভক্তিতে পরিণত হইয়া পড়িবে। মহামহোপাধ্যায় গদাধর ভট্টাচর্য্য সম্বন্ধেও এইরূপ বৃত্তান্ত। অনেকে বৃথাই, তিনি কেবল কথার তর্ক করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর অন্যায় অভিযোগ আনিয়া স্বকীয় অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। আর কথার তর্কও যে নরদামায় ফেলিয়া দিবার জিনিষ নহে, পরন্তু আবশ্যকীয়, ইহা কি তর্ককুশল বর্ত্তমান ব্যবহারজীবী হইতে আমরা বুঝিতে পারি না? পক্ষান্তরে এইক্ষণে যেরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রতি লোকের অনাদর হইয়াছে, গদাধরের সময়ে সেরূপ ছিল না। ঐ সময়ে সাধারণ্যে সংস্কৃতই বিজ্ঞমণ্ডলীর ভাষা বলিয়া গণ্য হইত। আর ইংরাজি ভাষায় কথার তর্কের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় নহে, এই সিদ্ধান্তটাকেই বা কে আদর করিয়া মাথায় তুলিয়া লইতে পারে? তবে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, যাঁহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম বিষয় ধরিতে পারে না তাঁহাদের জন্য আম্বিক্ষিকী বিদ্যা নহে। তাঁহারা "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয় সমীরে" বিশ্রাম করুন বা "অর্কাগ্রং ন ভুক্তিত" লইয়া ধীশক্তির পরিচালনায় প্রবৃত্ত হউন।

আশঙ্কা সূত্র—

"বুদ্ধ্যাবিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্তপকর্ষণে পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ।"

ঐ ঐ ২৬।

যেরূপ বস্ত্র হইতে প্রত্যেক তন্তু টানিয়া বাহির করিলে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা পদার্থ মাত্রের অভেদ উল্লেখ করিলে ঐগুলি যে জ্ঞান হইতে ভিন্ন ইহা প্রতিপন্ন হয় না।

তাৎপর্য্য এই যে, "অয়ং ঘটঃ অয়ং পটঃ" এইরূপই যখন জ্ঞানের আকার হইয়া থাকে, তখন ঘটাদির সহিত জ্ঞান-তাদাত্ম্যই সিদ্ধ

হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা এই যুক্তিটাকে মূল ভিত্তি করিয়া জ্ঞান ও ঘটাদি বিষয়ের একাত্মভাব সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। ফলতঃ জ্ঞানকে বিষয় হইতে পৃথক করিয়া বুঝিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

সমাধান সূত্র—

ব্যাহতত্বাদহেতুঃ। ঐ ঐ ২৭।

বুদ্ধি দ্বারা অভেদ উল্লেখ করাকেই তুমি বিষয়মাত্র যে জ্ঞানতাদাত্ম্যসম্পন্ন, ইহার সাধক বলিতে পার না। কেন না বুদ্ধি দ্বারা অভেদ উল্লেখ করিলেও পটকে তন্তু বলিয়া ধরিতে পারা যায় না, কিন্তু তন্তু হইতে পট হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়। আর আবরণাদি কার্য্য পটদ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, উহা কোন প্রকারেই তন্তু হইতে হয় না। ইহাও বলিতে পার না যে, "অয়ং পটঃ" জ্ঞানটা পটের সহিত স্বকীয় তাদাত্ম্যকেও বিষয় করিয়া লয়, কেন না জ্ঞান কখন আপনাকে আপনি বিষয় করিতে পারে না।

আশঙ্কানিবারক সূত্র—

তদাশ্রয়ত্বাদপৃথক্ গ্রহণং।

ঐ ঐ ২৮ সূত্র।

যদি তন্তু হইতে পটকে পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করা যায়, তবে "অয়ং পটং" জ্ঞানটা তন্তুকেও বিষয় করিতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কায় উত্তর হইতেছে—

তন্তু পটের আশ্রয় হওয়াতে এই জ্ঞানটা অপৃথক্‌ভাবে তন্তুকেও গ্রহণ করিয়া লয়।

আশঙ্কানিবারক সূত্র—

"প্রমাণতশ্চার্থ প্রতিপত্তেঃ।"

ঐ ঐ ২৯।

জ্ঞান পদার্থটা যখন উভয়বাদিসম্মত, তখন লাঘবতঃ কেবল উহাকেই মানা যাউক; তদতিরিক্ত বিষয় স্বীকার করিলে গৌরব হয়, এইরূপ আশঙ্কায় উত্তর হইতেছে—

বস্তুসিদ্ধি প্রমাণাধীন হয় বলিয়া প্রামাণিক পদার্থ স্বীকারে গৌরবকে বাধক বলা যাইতে পারে না।

আশঙ্কানিবারক সূত্র—

"প্রমাণানুপপত্ত্যুপপত্তিভ্যাং"।

ঐ ঐ২৮ সূত্র।

তুমি যে বাহ্য বস্তুর লোপ সাধন করিবে তাহাও অসম্ভব, কেননা বাহ্য বস্তু নাই এইরূপ বলিলে প্রশ্ন উঠে যে, এই বিষয়ে কোন প্রমাণ আছে কি না? ইহার উত্তরে প্রমাণ আছে যদি বলা যায়, তবে প্রমাণরূপ বাহ্যবস্তু সিদ্ধ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে যদি বলা যায় প্রমাণাভাব, তবে প্রমাণ নাই এই কথাটাই অসঙ্গত হইয়া পড়িল। সুতরাং প্রমাণের স্বীকার ও অস্বীকার উভয় পক্ষেই জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যবস্তু প্রতিপন্ন না হইয়া রহিল না।

এইস্থলে ইহা বিবেচ্য যে, বিজ্ঞানবাদী যখন জ্ঞান মাত্রকে স্বপ্রকাশ স্বীকার করে, তখন বাহ্যবস্তু নাই এইরূপ বলিলে প্রমাণানুসন্ধানের আবশ্যকতা আছে কিনা।

আশঙ্কা সূত্র—

"স্বপ্ন বিষয়াভিমানবং
প্রমাণ প্রমেয়াভিমানঃ।

ঐ ঐ ৩১।

স্বপ্নে যেরূপ অলীক বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেইরূপ মিথ্যাভূত প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতির ব্যবহার মানিলেই হয়।

আশঙ্কা সূত্র—

"মায়াগন্ধর্ব্বনগর মৃগতৃষ্ণিকাবত্ৰা।"

ঐ ঐ ৩২।

অথবা মায়ারচিত গন্ধর্ব্বনগর ও মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় মিথ্যাই প্রমাণ-প্রমেয়াদি ব্যবহার হইয়া থা.ক।

সমাধান সূত্র—

"হেত্বভাবাদসিদ্ধিঃ"। ঐ ঐ ৩৩।

স্বপ্ন ও গন্ধর্ব্ব-নগরাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যেরূপে তুমি প্রমাণাদি ব্যবহারকে অসত্য বলিতেছ, সেইরূপে জাগ্রৎ অবস্থার দৃষ্টান্তে আমি উহাদিগকে সত্য বলিতে পারি। সুতরাং প্রমাণের অভাবে প্রমাণ প্রমেয়াদি ব্যবহারকে অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায় না।

স্বমত দৃঢ়ীকরণার্থ সূত্র—

"স্মৃতিসঙ্কল্পবচ্চস্বপ্নবিষয়াভিমানঃ"।

ঐ ঐ ৩৪।

স্মৃতি ও মনোরথ যেরূপ পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে বিষয় করিয়া আবির্ভূত হয়, সেইরূপ স্বপ্নপ্রতীতিও পূর্ব্বানুভূত বিষয়কে অধিকার করিয়া হইয়া থাকে।

এই স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, আপনাকে আপনি খাইয়া ফেলা ও নিজের ছিন্ন মুণ্ড নিজে দেখা ইত্যাদি অদ্ভুত স্বপ্নও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এইরূপ স্থলে বিষয় গুলা কোন প্রকারে পূর্ব্বানুভূত হইতে পারে না। ইহার সমাধানে বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ স্থলেও বিষয়সমূহ পূর্ব্বানুভূত বটে। কেবল উহাদের সম্বন্ধটাই উল্টা-পাল্টা হইয়া থাকে।

স্বমত দৃঢ়ীকরণার্থ সূত্র—

"মিথ্যোপলব্ধি বিনাশস্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্ন বিষয়াভিমান প্রণাশবৎ প্রতিবোধে।"

ঐ ঐ ৩৫।

ভ্রান্তিজ্ঞানও যদি সদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহার নিবৃত্তি কি প্রকারে হইবে এইরূপ আশঙ্কার সমাধান হইতেছে—

যেরূপ স্বপ্নঅবস্থায় বস্তুপুঞ্জের মিথ্যা উপলব্ধি হইয়া থাকে এবং জাগ্রৎ অবস্থায় উহার বিলোপ হয়, সেইরূপ গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতির ভ্রান্তিও তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ অনারোপিত বস্তুর জ্ঞান দ্বারা বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

শূন্যবাদীর মত খণ্ডন—

"বুদ্ধেশ্চৈবং নিমিত্ত সদ্ভাবোপলম্ভাৎ"। ঐ ঐ ৩৬।

যেরূপ বাহ্যার্থভঙ্গবাদী যোগাচার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা বুদ্ধিকে বাদ দিয়া বাহ্যবস্তুর বিলোপ সাধন করে, সেইরূপ শূন্যবাদী মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধেরা অন্যান্য সমস্ত বস্তুর সহিত বুদ্ধিকেও অসত্য বলিয়াই জানে, সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে ইহাদেরও মত নিরাকৃত হইতেছে—

বাহ্যবস্তুর ন্যায় বুদ্ধিরও প্রতিরোধ হইতে পারে না, যেহেতু উহার সদ্ভাব প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূত এবং উহার কারণটাও অবিদিত নহে। কেন না "ঘটমহং জানামি" ইত্যাদি অনুব্যবসায় ঘট, জ্ঞান ও তাহার সমবায়ী কারণ আত্মাকে বিষয় করিয়া থাকে।

শূন্যবাদীর মত খণ্ডন—

"তত্ত্বপ্রধান ভেদাচ্চ মিথ্যা-বুদ্ধে দ্বৈবিধ্যোপপত্তিঃ"।

ঐ ঐ ৩৭।

ভ্রান্তিজ্ঞানকে দৃষ্টান্তে রাখিয়া জ্ঞান মাত্রই যে অসদ্বিষয়ক ইহা বলিতে পার না, কারণ ভ্রান্তিজ্ঞানেরও ধর্ম্মী বা অধিষ্ঠান-অংশে প্রমাত্ব এবং আরোপ্য রজত অংশে ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ।

পাঠক, বৌদ্ধমত নিরাকরণ বিষয়ে গোতম ঋষির যুক্তি দেখান গেল। এই নিরাকরণ হইতে আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়েরই মহত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেরূপ বৌদ্ধ মনীষিরা সূক্ষ্ম যুক্তির অবতারণা করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠাপিত করিতে ধীর অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, তদ্রূপ আর্য্য মহর্ষিগণ সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নৈপুণ্যের সহিত ঐ মতের নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়া উহা হইতেও সূক্ষ্মতর যুক্তিরাশির উদ্ভাবন করিয়াছেন। এই উভয়-সংঘর্ষে যে জগতে অপূর্ব্ব জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ফলতঃ আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়ই সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয় ধর্ম্মের যুক্তিগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, এমত যুক্তি এক্ষণ পর্য্যন্তও অপর কোন ধর্ম্মে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি জৈনধর্ম্মকে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্রই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাপি উহার যুক্তি আর্য্যধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের নিকটেও ম্লান হইয়া পড়ে। খ্রীশ্চিয়ান ও ইস্লামধর্ম্ম যে, একমাত্র বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এই কথা ঐ উভয় ধর্ম্মবাদীরা স্বীকার করেন। সুতরাং তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করা অনাবশ্যক। আর যে ধর্ম্ম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা যে বুধমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না, এ কথার উল্লেখ করাও অনাবশ্যক।

ভারতবর্ষীয় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বেনারস কমিশনরীর মধ্যে

বেলিয়া জেলার ইতিবৃত্ত।

★

১। ইহার সদর স্থান বেলিয়া সহর গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত; ইহা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জেলা। জজ ও সবজজ ভিন্ন, অন্য সমুদায় কোর্ট অবস্থিত। জজ আদালতের মোকদ্দমা গাজিপুরে হয়। এই জেলার উত্তর সীমা সরযূ নদী এবং দক্ষিণ সীমা গঙ্গা নদী। এই দুই নদী পূর্ব্বদিকে ছাপরা সহরের নিকট মিলিতা। উত্তর দক্ষিণ দুইটি নদীদ্বারা এই ভূভাগ বেষ্টিত বলিয়া পার্শিতে ইহার নাম 'দোয়াবা'। দো-অর্থে দুই, এবং আব-অর্থে

জল। এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। গবর্ণমেন্টের রাজস্ব ৬ লক্ষ টাকা। "বেলিয়া" সহর নামে অভিহিত হইলেও চাক্ষুষ গোচরে অতিহীন পল্লীগ্রাম বলিয়াই অনুমিত হয়। গঙ্গাতে প্রাচীন সহর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ষ্টেশনের উত্তরদিকে মাঠের মধ্যে নূতন সহর স্থাপিত হইয়াছে। তথায় ইংলিশ কোয়াটার ও গবর্ণমেন্টের জেল আদি বর্ত্তমান। এখানে প্রতি বৎসর রাসপূর্ণিমার দিবস হইতে ১৫ দিন যাবৎ একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। দেশপ্রচলিত সমুদয় পণ্যদ্রব্যই আমদানি হয়। অশ্ব, বলদ, গাভী, মহিষ প্রভৃতি পশ্বাদি বহুসংখ্যায় ক্রয় বিক্রয় হয়। ঐ পূর্ণিমার দিবস লক্ষাধিক নরনারী গঙ্গাস্নানার্থে সমাগত হয়। ইহা "দাদড়ী মেলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই যে, মহামুনি ভৃগু গোহত্যাজনিত পাপ এই স্থানের গঙ্গাস্নানে ক্ষালন করেন। সেই বিশ্বাসে ঐ দিবস স্নানার্থে এত অধিক লোকসমাগম হয়। এখানে প্রস্তরে অঙ্কিত ভৃগু মুনির পদচিহ্ন স্থাপিত আছে। সেজন্য এই স্থানকে "ভৃগুক্ষেত্র"ও কহে। বাল্মীকি মুনির স্থাপিত বলিয়া বালেশ্বর নামক শিবমন্দির আছে তাহাও এখানকার প্রসিদ্ধ।

২। কয়েক বৎসর হইতে "বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্ট" নামক রেলপথ হয়া এই জেলার উপর দিয়া গাজিপুর-বেনারস ও গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত পথ সুগম হইয়াছে।

৩। স্থানীয় অধিবাসিগণ অধিকাংশই অশিক্ষিত। লেখাপড়া শিখিবার বাসনা অতি কম। অতি অল্পসংখ্যক লোকে হিন্দী ও পার্শি শিক্ষা করে। ইংরেজি শিক্ষার্থে জেলায় কেবলমাত্র একটি এণ্ট্রান্স স্কুল আছে।

৪। ইংরেজি শিক্ষার চলন ক্রমশঃ হইতেছে। এখনও আশাপ্রদ হইতে বহু বিলম্ব। এখনও জেলার হাকিম ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটও ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ; পার্শিতেই রায় লিখিয়া থাকেন, তবে কখন কখন ২। ১টি ইংরেজিশিক্ষিত হাকিমের আগমন হয়।

৫। জেলা ও তদধীন তহশীলে (মহকুমাতে) সরকারী দাতব্য ঔষধালয় ব্যতিরেকে জেলার কোন গ্রামে কোন ডাক্তার বা ঔষধালয় নাই। সুদূর পল্লীগ্রামে গরীব বা ধনীলোক রোগগ্রস্ত হইলে ঔষধাভাবে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করে। আবার কোন চিকিৎসক আসিলেও অর্থ প্রদানে খুবই কৃপণতা করে; বরং রোগে প্রাণ যায় তাহাও সহ্য করে তথাপি অর্থ বাহির হয় না।

৬। এই দেশবাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ভূমিহার, কায়স্থ প্রভৃতি হিন্দুজাতিগণই শ্রেষ্ঠ, এবং ইহারা নিতান্ত দরিদ্র হইলেও জাত্যভিমান বিলক্ষণ রাখে। সাধারণতঃ ইহারা কৃষিজীবী। আচার ব্যবহার অনেকটা মুসলমানী ধরণের। এক বৎসরের বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুনামধারী (ডোম পর্য্যন্ত) ব্যক্তির মস্তকে শিখা বিদ্যমান, এবং টুপি বা পাগড়ি সকলেই শিরে ধারণ করে। শিখাধারণ না করিলে তাহাদের স্পৃষ্ট জল অপবিত্র ও তাহাদিগকে অহিন্দু বলিয়া সকলে হেয় জ্ঞান করিবে। সেইরূপ মস্তকের পাগড়ি বা টুপি না থাকিলেও অসম্মান জ্ঞান করে। সর্ব্বজাতির পুরুষই গাত্রে পিরাণ বারমাস ব্যবহার করে। ইহারা অশিক্ষিত বলিয়া স্বাভাবিক কোপনস্বভাব। সামান্য কারণে মারামারিতে ভীত হয় না। নানাবিধ মোক-

জমা করিতে ইহারা বিলক্ষণ পটু। অন্যান্য নীচ জাতিগণ ইহাদের পদানত। এমন কি একটি উচ্চবর্ণের ১২ বৎসরের বালক যদি কোন ইতর জাতির যুবককে প্রহার করে তবে অম্লানবদনে সে তাহা সহ্য করে। প্রাণ গেলেও তাহাকে মারিবার জন্য হস্তোত্তোলন করে না। ইতর জাতির প্রতি ইহারা অনেক অন্যায় ব্যবহার করে। দয়া ইহাদের শরীরে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কৃষির অবস্থা আশাপ্রদ না হওয়ায় আর্থিক অবস্থা ইহাদের খারাপ।

৭। পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠজাতি ব্যতিরেকে আর যত প্রকার জাতি আছে, সকলেই নীচ বর্ণের। উহাদের স্ত্রীলোকের স্বামি-বিয়োগ ঘটিলে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার পর্য্যন্ত পতিপরিগ্রহ করিয়া থাকে। আবার দেবর থাকিলে তাহার সহিতও বিবাহ হইয়া থাকে (যদি দেবর অবিবাহিত থাকে), ইহাতে পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত সন্তানসহ নবস্বামীর গৃহে যায়। তথায় সেই সন্তান "কাঠপুৎয়া" এবং পিতা "কাটংবাবা" নামে অভিহিত হয়।

৮। উচ্চজাতির বিবাহ প্রথা এইরূপ—পুরুষের বিবাহ জন্য পাত্রীর অনুসন্ধান করে না। কন্যাপক্ষ হইতে পাত্রের অনুসন্ধান হয়। কন্যা বয়স্থা হইয়া বিবাহ হইলেও কোন দোষাবহ নহে। ১২ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা অনেক কুমারী দেখিতে পাওয়া যায়। পরে তাহাদের বিবাহ হওয়ার বিধি দেখা যাইতেছে। পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স অনেক বেশী হইলেও সমাজে দোষের মধ্যে গণ্য নহে। বালক ও অশীতিপর বৃদ্ধও আনন্দে বিবাহ করে। অবস্থাপন্ন লোকে ২। ৩টি বিবাহও করে, সপত্নীগণ পরস্পর কলহ বড় করে না। পুত্র না হইলে বংশলোপ আশঙ্কায় একাধিক বিবাহ করে। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রপক্ষ হইতে পাত্রী দেখিবার নিয়ম নাই। সেজন্য কাণা কুব্জা প্রভৃতি পাত্রী কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া যায়। অবস্থানুযায়ী কন্যাপক্ষ বিবাহের পণ ও যৌতুক প্রদান করিয়া থাকে। অনেক স্থানে কন্যা বিক্রয়ের প্রথাও বহুল দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ পুত্রের বিবাহোৎসবে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। হস্তী, অশ্ব, বাদ্যভাণ্ড, নৃত্যগীত, এ সকলই চাই। কিন্তু পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে সেরূপ কিছুই করে না। ইহাদের পুরোহিতগণও অতি মূর্খ।

৯। কোন মহামারী সময়ে লোকসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তৎসময়ে তাহাদিগকে দাহ করে না ও শ্রাদ্ধ করে না এবং অশৌচ আচরণও করে না। মৃত দেহ কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ করে, পরে ৬ মাস ১ বৎসর অথবা ২। ৪ বৎসর পরে সুবিধামত কুশপুত্তল করিয়া দাহ করে, ও সেই দিন হইতে অশৌচ গ্রহণ ও অশৌচান্তে অবস্থামত শ্রাদ্ধাদি করে। মৃতাশৌচ সম্বন্ধে এক জাতির মধ্যে এক প্রকার নিয়ম নাই। যথা কায়স্থ জাতির—কোন গ্রামের কায়স্থগণের একাদশ দিনে, কোন গ্রামের পনর দিনে, কোন গ্রামের বা মাসান্তে অশৌচান্ত হয়। আবার একটি বিসদৃশ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, উপযুক্ত একাধিক পুত্র থাকিতেও তাহাদের জননীর মৃত্যু হইলে পুত্রগণ দাহ বা শ্রাদ্ধাদি করে না। তাহাদের

পিতা সেই কার্য্য সম্পাদন করে। দাহাদি কার্য্য এবং অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক কাচা পরিধান করিয়া মস্তকাদি মুণ্ডনপূর্ব্বক স্বীয় শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

১০। কায়স্থ, স্বর্ণকার প্রভৃতি জাতিগণও উপবীত ধারণ করে। ব্রাহ্মণাদি জাতির বালক উপবীত না হওয়া পর্য্যন্ত নীচ জাতির অন্নভক্ষণে জাতিভ্রষ্ট হয় না। এমন কি অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পুত্রগণ কায়স্থাদি নিম্নবর্ণের অন্ন ভক্ষণ ও অন্যান্য নীচবর্ণের বালক মুসলমানের অন্ন (উচ্ছিষ্ট) ভক্ষণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতি ভিন্ন হিন্দুনামধেয় জলাচরণীয় সর্ব্বজাতিতেই শূকর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে ক্বচিৎ কোন জাতি খায় না। ইহাদের অন্ধ বিশ্বাস অতি প্রবল। মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনায় ভীত নহে।

১১। সাধারণতঃ ইহাদেব উচ্ছিষ্টজ্ঞান একেবারেই নাই। মলমূত্রস্পর্শেও কোন দ্রব্য অস্পৃশ্য হয় না। বালক ও অধিকাংশ স্ত্রীলোক মলত্যাগান্তে জলশৌচ করে না। অধিকাংশ স্ত্রীলোক বৎসরে ৩।৪ বারের বেশী স্নান করে না। একবস্ত্রে বহুদিন থাকিয়া যখন তাহা জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন হয়, তখন তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র ধারণ করে। ইহাও বৎসরে এক বা দুইবার। মলিন বস্ত্রে থাকিতে মনে বোধ হয় কোন ঘৃণা হয় না। পুরুষগণের পরিচ্ছদ অনেকাংশে পরিষ্কার। তাহারা রীতিমত স্নানও করে। উক্ত জাতীয় স্ত্রীলোকগণ নীচজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত মেশামিশি করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

১২। মঙ্গলকার্য্য মাত্রেই এবং পর্ব্ব-উপলক্ষে জলাশয়ে স্নানার্থে গমনকালে স্ত্রীলোকগণ একত্র সর্ব্বসমক্ষে গীত গাহিয়া থাকে। তাহাতে জনসমাজে কোন লজ্জার কারণ নাই। এই সময়ে বাহিরে গমনকালে প্রত্যেক স্ত্রীলোকই ওড়না বা চাদর দ্বারা সর্ব্বশরীর আবৃত করে। লালরঙ্গ ও ছিট ইহাদের অতি প্রিয়। ইহারা স্বভাবতঃ অতি মোটা কাপড় পরিধান করে। গাত্রে সর্ব্বদা ঝুলানামক পিরাণ সর্ব্বজাতীয় স্ত্রীলোকেই ব্যবহার করে। এই ব্যবহারটি খুব ভাল।

১৩। ইতরজাতীয় স্ত্রীলোকগণ উভয় হস্তে এক প্রকার গহনা ধারণ করে; তাহা কাংস্য বা রঙ্গ নির্ম্মিত। তাহার নাম 'মাঠী'। হস্তের কনুই হইতে কব্জা পর্য্যন্ত ক্রমনিম্নভাবে ধারণ করে, আবার পদদ্বয়ে ঐ ধাতু নির্ম্মিত /৮ সের হইতে /৯ পর্য্যন্ত ওজনের একরূপ অলঙ্কার ধারণ করে, তাহার নাম পৈরী। ইহা পরিধানকালে এরূপ কষ্ট পাইতে হয় যে স্ত্রীলোকগণ ঐ সময় মল মূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে। পরিধানকালের ক্ষত বহুদিন যাবৎ থাকে। ইহা ধারণ করিয়া দ্রুতগমনে সমর্থা হয় না। যদি ইহা ধারণ না করে তবে নিঃস্ব অনুমানে পুত্রাদির বিবাহ হওয়া কঠিন হয়।

১৪। উচ্চজাতীয় স্ত্রীলোকের ভূষণ অনেকটা বঙ্গদেশের প্রাচীন প্রথানুযায়ী। বঙ্গদেশে আজকাল যেমন নিত্য নূতন ফ্যাসন উঠিতেছে এদেশে তেমন নহে। ইহারা প্রাচীন প্রথা ত্যাগ করিতে পারে নাই।

১৫। বিবাহের বর, হস্তে বালা ও কণ্ঠে হার প্রভৃতি ধারণ করে। পরিচ্ছদ, পাতলা

কাপড়ের ২০ গজে নির্ম্মিত 'জামা' নামক রঙ্গিন পোষাক পরিধান করে। গলা হইতে কোমর পর্য্যন্ত পিরাণের অবয়ব, তৎপরে তৎসংলগ্ন কোমর হইতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত লম্বমান থাকে। ইহা না হইলে বরের সজ্জা হয় না। বলা বাহুল্য উহা লালরঙ্গের হয়।

১৬। শ্রেষ্ঠ জাতীয়া সধবা বিধবা সকল স্ত্রীলোকেই অলঙ্কার ধারণ করে। এমন কি বিধবা স্ত্রীলোক মধ্যে অতি স্থবিরা, যে যষ্টি ব্যতীত চলিতে অসমর্থা, সেও আপাদমস্তকে অলঙ্কার ধারণ করে। সধবা বিধবা বেশভূষায় জানা কঠিন। তবে বিধবাদের সিঁথিতে সিন্দূর থাকে না।

১৭। এখানকার কৃষিজাত প্রধান ফশল, ইক্ষু, যব, গোধূম, অড়হর, আফিং ও তামাক। চিনি প্রস্তুতের অনেক কারখানা আছে. উহা যথেষ্ট পরিমাণে ও উত্তম প্রস্তুত হয়। এই জেলার সেকেন্দরপুর নামক স্থানে গোলাপজল ও ফুলেল তৈল এবং আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং বঙ্গদেশে ও পশ্চিমদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে মাঠে কদাচিৎ নীলগাই নামক এক প্রকারের হরিণ দৃষ্ট হয়। উহাতে শস্যাদির, বিশেষতঃ ইক্ষুর, অনেক ক্ষতি করে। আমরা প্রত্যাগমনকালে এক স্থানে ২। ৩টি দেখিয়াছি। আকার অনেকটা অশ্বের মত ও অতি দ্রুতগামী, বর্ণ শ্বেতমিশ্রিত ধবল। আমাদের জনতা দেখিয়া এত বেগে চলিয়া গেল যে অশ্বের সামর্থ্য নাই যে তেমন যাইতে পারে। ঐ স্থানে আসার কালে বামভাগে একটা প্রকাণ্ড নদীর মত দীর্ঘ ও পরিসর খাল দেখা গেল, তাহার চতুঃপার্শ্বে নানারূপ শস্য ও বৃক্ষরাজী থাকায় বড়ই সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করিতেছে।

১৮। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে জমির আদর বেশী। সচরাচর ভূমিতে জল সেচন না হইলে ফশল উৎপন্ন হয় না। সে জন্য ক্ষেত্রমধ্যে কূপ ও ইন্দারা বহুল পরিমাণে প্রস্তুত রাখিতে হয়। ধান্য খুব কম উৎপন্ন হয়। যাহা হয় তাহাও অতি মোটা। ইহাদের প্রধান খাদ্য ছাতু, রুটী ও ভাত। গরীবের ভাগ্যে রুটী ও ভাত দুষ্প্রাপ্য। যবচূর্ণ দ্বারা এবং মটর খেসারি প্রভৃতি চূর্ণ দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া ভোজন করে। সাধারণঃ স্বাস্থ্য খুব ভাল। নরনারী বেশ বলিষ্ঠ, তবে অন্নাভাবে দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে। চৈত্র বৈশাখে অনেক স্থানে পানীয় জলের অভাব যথেষ্ট লক্ষিত হয়।

১৯। এখানে চলিত গ্রাম্য ভাষাকে ঘেট ভাষা কহে। প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সেই গ্রাম্য ভাষা কিঞ্চিৎ লিখিলাম।

প্রশ্ন।	উত্তর।
রাউর ঘর কাঁহা (তোমার বাড়ী কোথায়) ?	ভুবৌলী।
রৌর। কে হোই (তুমি কোন্ জাতি) ?	ছত্রি।
রাউর নাম কা হ (তোমার নাম কি) ?	রামভঞ্জন।
কা আইলি হঁ (কি জন্য আগমন) ?	কুছ কাম বা (কোন কার্য্য আছে)।
কোন্ কাম ? (কি কার্য্য) ?	কহবনু (পরে বলিব)।

তৎপরে সে বলিতে লাগিল,—হমারা একগো ভঁইস ও পাড়ি রহল হা, আজ ৩। ৪ রোজ. ভইল, এক দিন বিহান খাটিয়াসে উঠিকে দেখতানি কি যো খুঁটামে ভঁইস রহলহা, উহমে নই থে। তব্ ভরদিন খোজত

খোজত হয়রাণ হোকে যব নহি মিলল, তব্ থানামে ইত্তিলা করেকে যাইব, এই ঘড়ি রাউর গাঁওকে দুখিত ভড় হমারা পাছ আকে কহল কি হমারা বাবুকে উখিমে কেকারা ভঁইস পরল রহলহা। বাবু উহ বাঁধকে রাখলবা। উহ ভঁইস হমারহ, অব্ হমার ভঁইস রৌয়াঁ দে দি।

অর্থাৎ, আমার একটি গাই মহিষ ও তাহার বৎস ছিল। অন্ত ৩।৪ দিবস অতীত হইল, একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখি যে, যে খুঁটাতে উহা বন্ধন করা ছিল, তাহাতে মহিষ নাই। তখন আমি সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া ক্লান্ত হইয়া যখন তাহা পাইলাম না, তখন থানাতে এত্তেলা করিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলে আপনার গ্রামের দুঃখিত ভড় আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, যে আমার বাবুর ইক্ষুক্ষেত্রে কাহার একটি মহিষ পতিত হওয়ায় বাবু তাহা বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ঐ মহিষ আমার। অতএব এক্ষণে উহা আমাকে প্রদান করুন।

আরও কয়টি কথা এই— চলনে কাহোতো, চলিতে কি হইতেছে! এ গাড়ীয়া নিকল্ যাই—এ গাড়ী চলিয়া যাক্। চল্ তব্ জুয়া নেব্ খোল—চল তবে জুয়া খুলিয়া লইব। এক্ষিটে ভুক্ লাগবা—এখনি ক্ষুধা লাগিল? আরে হেই গিয়ে—ওরে এ দিকে লইয়া আয়। কাহে দাবুবে—কেন দাবিতেছিস্।

এখানকার আচার ব্যবহার রীতি নীতি দেখিয়া এবং কয়দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া আমরা পূর্ব্বকথিত নানাবিধ যানযোগে ৯ই ফাল্গুন বেলা ১০টাতে রওনা হই। অপরাহ্ণের ট্রেনে উঠিয়া রাত্রি ১১টায় পবিত্র কাশীধামে সিগরার বাসায় উপস্থিত হওয়া যায়।

১০ই ফাল্গুন সধবা ও কুমারীর ভোজনোৎসব সম্পন্ন করিয়া ১৩ই ফাল্গুন একেবারে কাশী হইতে, মথুরা পর্য্যন্ত স্পেশেল ট্রেনে অযোধ্যা রওনা হই।

ভারতের তিনটি স্থান যেন প্রত্যক্ষ তিনটি যোগের স্থান। কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। গয়াক্ষেত্রে নিরন্তর শ্রাদ্ধ পিণ্ড, ব্রহ্মলোক কামনা, ইন্দ্রত্ব কামনা ইত্যাদি রূপে পুরোহিতের মৌখিক মুহুর্ম্মুহু নানাবিধ কামনার জ্বালায় যেন প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। যেখানে যাই সেই খানেই সঙ্কল্প আর কামনা ছাড়া কথা নাই। ইহার পর আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা নির্ব্বাণের রাজধানী কাশীপুরীতে ৬ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৩ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৩ মাস ৭ দিন কাটাইলাম। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা হাসিকান্নামাখা সংসারে সুখ দুঃখ সবই ভুগিলাম। আমাদের প্রতি না জানি কি বিধিলিপি প্রবল ছিল, তাহা অন্ত র্যামীই বলিতে পারেন। কাশী আসার বার দিন পূর্ব্বে গয়া হইতেই এ বাসাতে ১টি বৃহৎ চৌর্য্যের সংবাদ পাওয়া যায়। সেই চৌর্য্যে প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা ক্ষতি হয়। তদ্ভিন্ন তথায় অনুসন্ধানে এবং পুলিশাদির পূজাতেও কম ক্ষতি হয় নাই। আমাদের অভিভাবকের চিরপীড়িত জামাতা জলপথে পূর্ব্ব হইতেই এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সেই পীড়িতাবস্থাতেই তাঁহার কক্ষ হইতে বহু মূল্যের ভূষণ ও রৌপ্য বাসন অপহৃত হয়।

যাহা হউক সাঙ্খ্য বেদান্তের জ্ঞান, ছাত্র অধ্যাপকের জ্ঞানালোচনা, উপনিষদ্পাঠ, নির্ব্বাণ, মোক্ষ, ব্রহ্ম, চৈতন্য, আত্মা ইত্যাদি শব্দবহুল জ্ঞানিগণের জ্ঞানপুরী কাশী হইতে আমরা মহাদেবী হরিভক্তির পবিত্রধামে ভক্তিস্রোতস্বিনীর শীতল বিন্দুস্পর্শ লালসায় অযোধ্যা ও হরিদ্বার হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিলাম।

পরচিত্ত।

'পরচিত্ত অন্ধকার' এই কথাটি সকল লোকেই জানে। পৃথিবীর সুখদুঃখ সব পরচিত্ত বুঝিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সে ক্ষমতা কিসে পওয়া যায়, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। তুমি একজন চাকুরিয়া—পরের দাসত্ব করিতে আসিয়াছ। তোমার মনিবের মনে কি ভাবনা তাহা তোমার জানা দরকার। তোমার মনিব তোমার প্রতি খুসী না হইলে তোমার উন্নতির আশা নাই। একদিন প্রাতঃকালে মনিবের নিকট যেমন যাইলে, অমনি মনিব কতকগুলি তীব্র কথায় তোমাকে সমাদর করিলেন, এবং তুমি মনিবের উপর আন্তরিক চটিলে। তুমি কিন্তু কি জন্য মনিবের মনে ভাবান্তর হইয়াছে তাহা বুঝিলে না, এবং এইরূপ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবার জন্য অবসর খুঁজিতে থাকিলে। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি মানবকে অনেক দুষ্কর্ম্মে নিয়োজিত করে, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় বুঝিবার ভুলে সেই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির সৃষ্টি। সংসারে মানবের নিত্যপালনের কতকগুলি নিয়ম আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে; যথা, গুরুজনকে ভক্তি করিবে এবং কখনও তাঁহাদের সহিত সমান উত্তর করিবে না, বয়োজ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা করিবে, কাহাকেও ঘৃণা করিবে না ইত্যাদি। ঐ সকল নিয়ম থাকিতেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের আবশ্যকতা কি? যদি ঐ নিয়মগুলি সব লোকে পালন করিত, তবে এই পৃথিবী চরম সুখের স্থান হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা আদর্শ পৃথিবীর কথা চিন্তা না করিয়া বর্ত্তমানে যে নিয়মে পৃথিবী চলে সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিয়াছি। পৃথিবীর লোক খারাপ, কিন্তু কি জন্য খারাপ এবং কি করিলে ভাল হয়, তাহার চিন্তায় পৃথিবীর উন্নতি হইবার সম্ভব। পৃথিবী পরিত্যাগ অর্থাৎ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে কেহ যাইবে না। যদি কেহ যায়, তবে পৃথিবীর লোকজনের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকিল না এবং সমাজের হিতাহিত

লইয়া যুক্তিতর্ক করা তাহার পক্ষে ঈপ্সিত না হইবারই কথা। আমরা সে লোকের কথা ধরিব না। পৃথিবীতে আমাকে এই সব পরিজন ও প্রতিবাসী লইয়া বাস করিতে হইবে। আমি জানি আমি নিজে মন্দ এবং তাহারা মন্দ, কিন্তু এই মন্দের ভিতর তালি দিয়া সুখ আবদ্ধ করিতে হইবে। সুখ দুঃখ যে কি, তাহার আলোচনা করিতে আমরা বসি নাই। আমি যাহাকে সুখ বলি, তুমি তাহাকে দুঃখ বলিবে, আমার যাহাতে সুখ, তোমার তাহাতে দুঃখ। সুতরাং সুখদুঃখের হিসাব করিতে না বসাই ভাল। তবে মোটামুটি বুঝা যায় যে, পৃথিবীর যত লোকের সহিত তোমার কোন না কোন প্রকারে সংশ্রব আছে, তাহাদের কাহারও অন্তরে যদি স্বেচ্ছাক্রমে কখনও আঘাত না দেও তবে তুমি সুখী হইতে পার। তুমি হয়তো আঘাত পাইবে, কিন্তু প্রতিঘাত দিতে পারিবে না। যখনই আঘাত পাইবে তখনই নীরবে বিবেচনা করিবে, যে ব্যক্তি তোমার চিত্তে আঘাত করিল, তাহার মানসিক বিকৃতি কি জন্য ঘটিয়াছে। যদি ধীরে সেই চিন্তা কর, তবে প্রতিঘাত না করিয়া দয়ার উদ্রেক হইবে। দেখিতে পাইবে, কোনও অপরিহার্য্য কারণে সেই ব্যক্তি আপনা-হারা হইয়াছে এবং জ্ঞান-শূন্য হইয়া তোমার চিত্তে আঘাত করিয়াছে। হয়তো বহুদিন পরে সেই ব্যক্তি সুস্থ হইয়া আপনার ভ্রম ও অন্যায় বুঝিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু তুমি তাহার জন্য লালায়িত হইবে না। কিসে মানবের পাপতাপ-কলুষিত প্রাণে এইরূপ ঐশ্বরিক গুণের উদ্রেক হয় তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়, এই গুণের উদ্রেকের জন্য পরচিত্ত বুঝিবার দরকার। অন্ধকার পরচিত্তের ভিতর বৈজ্ঞানিক আলোক ঢুকাইতে হইবে। পরের চিত্ত বুঝিতে হইলে পরের অবস্থা, সুখ, দুঃখ বুঝিতে হইবে। জগৎ কেবল তোমার নিজের জন্য নহে, সকলের জন্য; এবং তুমি নিজে ভাল খাইয়া ভাল পরিয়া বেড়াইবে ও অপরে কি খাইল না খাইল তাহা একবার দেখিবে না? তাহা তুমি দেখ না বলিয়া তুমি পরের চিত্ত বুঝ না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, মানব বিবেচনা করে যে পৃথিবীতে তাহার নিজের কার্য্য করিতে সে আসিয়াছে। সে যখন যাহা করিতে চাহে, তখন যদি তাহা না করিতে পারে, তবে সে বিশেষ বিরক্ত হয়। এইরূপ সব মানুষেই ভাবে। সুতরাং স্বার্থ-পরবশ হইয়া এক মানবের সহিত অপর মানব কলহ করে। আমরা দুইজন চাকরিয়া এক মনিবের অধীন কাজ করি। আমি চাহি, মনিবের নিকট আমার কাজ লইয়া অগ্রে যাইব, অপর ব্যক্তি চাহে সে অগ্রে যাইবে। ইহা কলহের কারণ। বিবেচনা করিলে দেখিবে, ইহা স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছু নহে। অধুনা আমরা বাঙ্গালী জাতি ইংরাজের সহিত একত্রে মিলিত হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করি। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর চিত্ত যখন বুঝিতে ভুল করে তখন ইংরাজের চিত্ত যে আদৌ বুঝিবে না তাহাতে আশ্চর্য্য কি? পরচিত্ত বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মনে রাখিবে যে, অপরের কোনও কথায় বা কার্য্যে একটি কুভাব আছে বলিয়া ধরিয়া লইবে না। তুমি

রাস্তা দিয়া যাইতেছ, অপর একজন তোমাকে দেখিয়া হাসিল ও অঙ্গভঙ্গী করিল। তুমি তখনই সেইরূপ কাজের একটি কু-অর্থ কল্পনা করিও না। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাহার ঐ কাজের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা কর, কিন্তু হঠাৎ কোনও কু অর্থ ধরিয়া লইও না। তোমার মনিবের কোনও কথায় বা লেখায় ঐরূপ একটি কুভাব ধরিও না। তোমার গুরুজনের বা স্নেহের পাত্রদের সম্বন্ধেও ঐরূপ। তোমার বন্ধুর সম্বন্ধেও ঐরূপ। বঙ্গমহিলাদের আচার-ব্যবহার মনোযোগের সহিত দেখিলে জানা যায় যে, এইরূপ কুভাব ধরার ফল কি। মহিলারা বিনা কারণে একে অপরের সহিত ঝগড়া করে এবং তাহাদের অভ্যাস, কথার কুভাব লওয়া। কোনও লোক সম্পূর্ণ নির্ম্মলচিত্তে কোনও কথা বলিল, মহিলাগণ সে কথার কুভাব লইয়া ঝগড়া বাধাইবে। এরূপ অনেক সময়ে দেখা যায়, আমোদ করিয়া কেহ কোনও কথা বলিল, কিন্তু যাহাকে বলা হইল সে ঐ কথার কুভাব লইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কাহাকেও তুমি কোনও চিঠি লিখিলে, সে ব্যক্তি হয়তো তোমার চিঠির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তোমার প্রতি প্রত্যুত্তরে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিল—তখন তুমি তাহার ভ্রম বুঝাইয়া না দিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিলে। মাতৃভাষায় কথা কওয়া বা লেখা যত সহজ, ইংরাজিভাষায় তাহা অপেক্ষা অনেক কষ্টকর। যদি মাতৃভাষায় একের কথা অপরে বুঝিতে ভুল করে তবে, বাঙ্গালী ইংরাজের ভাষা বা ইংরাজ বাঙ্গালীর ভাষা লিখিতে বা কহিতে বা বুঝিতে যে ভুল করিবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অথচ বাঙ্গালী-ইংরাজে যখন কলহ করে তখন এই কথাটি একেবারে বিস্মৃত হয়। অনেক সময়ে তোমার ইংরাজ মনিব তোমাকে যাহা লিখিবেন তাহা তুমি ভাল করিয়া না বুঝিয়া তাঁহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলে। যদি লেখালেখি না করিয়া একবার সাক্ষাৎ করিতে, তবে হয়তো কলহ আদৌ জন্মিত না। তুমি কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাটীতে অতিথি হইয়া আছ—হয়তো বন্ধু কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে তোমার কথা আদৌ না ভাবিয়া কোন কথা বলিতেছেন। তুমি তাহাদের কথোপকথন হইতে অন্তরে ধরিয়া লইলে যে তোমার বন্ধু বা আত্মীয় তাঁহার বাটী হইতে তুমি চলিয়া গেলেই খুসী হইবেন। হয়তো সেইরূপ ধারণার বশে তুমি তোমার বন্ধু বা আত্মীয়ের বাটী হইতে তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলে। দ্বিতীয় কথা, পরচিত্ত বুঝিতে হইলে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে, অর্থাৎ নিজের কাজের ব্যাঘাত করিয়া কতক সময় ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে। পরের প্রতি ঘৃণা থাকিলে তাহার চিত্ত তোমার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। সর্ব্বদা আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিলে পরচিত্ত কখন বুঝিবে? স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কতক সময় পরচিত্ত বুঝিতে নিয়োজিত করিবে। অপরের কোনও কাজের কোনও দোষ বাহির করিবার পূর্ব্বে চিন্তা করিবে যে, তাহার অবস্থায় পড়িলে তুমি কি করিতে। যে সময়ে সে ব্যক্তি সেই কাজ করিয়াছিল, তখন তাহার চিত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল? তুমি একজন বাঙ্গালী। যদি তুমি চাকুরির চেষ্টায় দেশ ছাড়িয়া বহুদূর সমুদ্র-পারে ইংরাজের মত বিদেশে গিয়া পড় এবং যদি সেখানে তোমাকে

উক্ত দেশে বুদ্ধিমান অথচ আফ্রিকার মত কৃষ্ণবর্ণ লোকদের সঙ্গে সর্ব্বদা কার্য্য করিতে হয়, তবে সেখানে ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়? তুমি যদি ছুটী পাইয়াও কার্য্যের ভিড়ের জন্য দেশে আসিতে না পার,তবে কি তোমার মেজাজ ঠিক থাকে? তুমি মনিবের কাজ খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদন কর কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থার প্রতি আদৌ নজর রাখ না। ইহার পরিণাম উভয়ে সম্পূর্ণ একতার সহিত কার্য্য করিতে না পারিয়া শেষে ছাড়াছাড়ি হইবে। স্বার্থত্যাগ করিয়া কতক সময় তোমার মনিবের চিত্ত বুঝিতে নিয়োজিত করিবে। পৃথিবীতে মানব-সমাজে যে ঘোর অশান্তি বিরাজ করে তাহা দূরীকরণের একটি মহৌষধ পরচিত্ত বুঝা। পরচিত্ত বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, অপরের কোনও কথায় বা কার্য্যে একটি কুভাব আছে বলিয়া ধরিয়া লইবে না। দ্বিতীয়তঃ স্বার্থত্যাগ না করিলে অর্থাৎ নিজের কাজের ব্যাঘাত করিয়া কতক সময় ঐ কার্য্যে নিয়োজিত না করিলে পরচিত্ত বুঝা যাইবে না। এই কার্য্যের অভ্যাস করা দরকার। আমাদের উচিত বালকবালিকাগণকে বাল্যাবধি এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া।

তপোবন-চিত্র।

নির্ম্মল তটিনীতটে ঘন বনচ্ছায়ে
পুণ্য শান্ত তপোবন। বিমল উষার
তরুণ অরুণ কর আলিখিত কিবা
উটজ-প্রাঙ্গণ' পরে। তপের প্রভাবে
নাহি হেথা দ্বেষ-হিংসা, শান্ত-সখ্যভাবে
জীবগণ রহে নিত্য—আমিষ ত্যজিয়া
চর্ব্বিছে নীবারবলি বৃকঋক্ষগণ।
সিংহী মৃগী দর্ভ শষ্প করে বিনিময়
দোঁহে দোঁহা। খগকুল সানন্দে বিচরে।
করুণা, সন্তোষ, ক্ষমা, মূর্ত্তি ধরি হেথা,
ক্রোধ-পাপ-ভুজঙ্গের মন্ত্রৌষধি বহি
সতত বিহরে যেন। আতপ-তাপিত
ভুজগ শায়িত, শিখিকলাপের ছায়ে,
করিতেছে স্তন্য পান—সিংহশিশুসহ
হরিণশাবক সুখে—সিংহীক্রোড়োপরে।
কৃষ্ণসার প্রেমভরে যত্নে শৃঙ্গ দিয়া
মৃগীর নয়নকোণ করে কণ্ডূয়ন।
ক্রীড়াশীল করিশিশু শুণ্ড প্রসারিয়া
আকর্ষিছে হরিশিশু। নব কিসলয়ে
মঞ্জরিছে শুষ্ক বৃক্ষ। সত্যযুগ যেন
কলি ভয়ে পলাইয়া নিবসে হেথায়।
বদ্ধাঞ্জলি পত্রপুট বৃক্ষরাজি কিবা
দাঁড়ায়ে রচেছে কুঞ্জ—শাখে শাখা বাঁধি
শিরীষ শিংশপা শমী সর্জ্জ কুরুবক

চূর্ণক চন্দন চূত মধূক মন্দার
নক্তমাল প্লক্ষ ধাত্রী বদরী হিন্তাল
শ্রীফল শ্রীবৃক্ষ বট আদি তরুশ্রেণী,
মল্লিকা মালতী লোধ্র চম্পক অশোক
কোবিদার নাগেশ্বর কদম্ব কিংশুক
মাধবী বকুল যূথী—মঞ্জুল রুচির
মঞ্জরিত রচিয়াছে বসন্ত সুচির।
কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা ঐ ভ্রমরনিকর
পুঞ্জে পুঞ্জে পুলকিত ফিরে গুঞ্জরিয়া।

অদূরে মঞ্জুল কুঞ্জ চিরমুখরিত ;
দাত্যূহ কপোত শুক শিখী পুংস্কোকিলে
তপোবন সরোবরে সারস কুরর
কেলিপর কলহংস মরাল মরালী,
চক্রবাক কারণ্ডব—চিরসক্তপ্রিয়
সানন্দে সাঁতারি ধায় কলতান তুলি,
কমল কুমুদ কহ্লার-বল্লরী পরে
যেন বিরাজিতা সরোলক্ষ্মী—বিছাইয়া
সুচঞ্চল চেলাঞ্চল—মরাল-অঙ্কিত
কলকণ্ঠ বিহগের মধুতান তার
বাজিতেছে মণিবন্ধে কঙ্কনঝঙ্কার।

বৈদূর্য্য স্ফটিকস্বচ্ছ অচ্ছোদ সরসে,
তুলিছে উচ্ছল জল মৃণ্ময় কলসে
বল্কলিনী ঋষিপত্নী, বনবীথিগুলি
জলসিক্ত পদচিহ্নে রয়েছে অঙ্কিত।
ঘাটে তুলসীর তলে শিলাখণ্ড 'পরে
বিদীর্ণ ইঙ্গুদীফলে স্নেহরাশি ঝরে।

ভালে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক শিরে জটাভার,
শ্রবণে স্ফটিক-মালা, স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন
বামকরে কমণ্ডলু—গলে উপবীত
দক্ষিণে আষাঢ়দণ্ড ঋষিশিষ্যগণ
চলিয়াছে ফলদর্ভ-সমিৎসংগ্রহে।
রাশি রাশি পুষ্প কেহ করিছে চয়ন
সুসিত প্রস্রুত ক্ষীর বৃন্ত হ'তে ঝরি
প্রমাণে চয়ন-চিহ্ন—ফলভারানত
তুলিয়া পড়িছে তরু ঋষিভোগ্য হ'তে
সুন্দর—অকষ্টরোহী, সুপত্র সুরস,
কস্তূরী-সুগন্ধীকৃত—বেদীমধ্যগুলি
মার্জ্জন করিছে কেহ স্রুক্-বিকঙ্কত
দর্ভরাজি যূপপার্শ্বে আস্তীর্ণ করিয়া
যজ্ঞদ্রব্য সহ কেহ রাখে সাজাইয়া।

শান্ত বনস্পতিচ্ছায়ে মনঃশিলাতলে
উপবিষ্ট শুকদেব। চারি পার্শ্বে তার
সদ্যঃস্নাত ভক্তিপূত ঋষিবালগণ
গলে শুভ্র যজ্ঞসূত্র অক্ষমালা করে
করে পাঠ ভূর্জ্জত্বচে সুলিখিত শ্রুতি
উদাত্তাদি স্বরে। সমস্বরে সামগান
ওঙ্কার ঝঙ্কৃত—হইতেছে উদীরিত
সুচারু পতত্রিশিঞ্জে করি অভিভূত।
"আগহি মন্দিরপ্র" ঋগ্বেদী তাপস
উচ্চারিছে প্লুতিস্বরে—"ওঁ মধুবাতা
ঋতায়তে" স্বরে কেহ তুলিয়াছে তান।
ব্রহ্ম শব্দে নিনাদিত ব্রহ্মলোক সম
দেবশিশু শিষ্য হেথা আরাধ্য আশ্রম।
বুভুৎসিত তুষ্ট হেথা নানা তথ্য লভি'
আগমনিগমচ্ছন্দঃ নিরুক্ত পুরাণ
ব্রহ্মবিদ্যা—তন্ত্র-আত্মবিবেকসংহিতা,
নানা শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন নিয়ত
মহর্ষি ত্রিকালদর্শী। উপনিষদের
বিচার শুনিয়া শুক—বিমুগ্ধ তিত্তির।

মৃণাল-বলয় করে ঋষিবালাগণ
বরতনু সুকঠোর বল্কলে আবরি,
লতামূলে আলবালে সেঁচিছে সলিল
ভৃঙ্গার ভরিয়া আনি। সঞ্চারিণী লতা,

অজঙ্গমা লতাটীকে দিছে জড়াইয়া
সহকার-বক্ষ' পরে। ফলদানতরে
বিলোলা নংনমামাস—ব্রততীসুন্দরী
ঢলিয়া পড়িছে অঙ্গে কৃতজ্ঞতাভয়ে।
তুলা-আঁখি মৃগীগুলি কারো হাত হ'তে
লীলাকমলের দল করিছে ভক্ষণ,
কণ্ডূয়ন তরে গণ্ডলেহনতৎপরা
সোহাগে ঢলিছে অঙ্গে। দর্ভ-ক্ষত বণে
কেহ বা ইঙ্গুদী-তৈল করিছে লেপন।
অব্যাকুল নীলকণ্ঠ বসিয়া স্কন্ধেতে
খুঁটিছে নীবার-কণা—করপুট হ'তে।
কুরুবকদ্রুমে যদি বাঁধিছে অঞ্চল
চঞ্চল শশকশিশু করিছে মোচন।
কুসুম ত্যজিয়া অলি চকোরের মত
বালার বদন-ইন্দু বেষ্টি বারবার
গুঞ্জরিছে শতচ্ছন্দে বিড়ম্বিতা বালা
তাড়ায় মৃণাল-ভুজে তবু দুষ্ট অলি
ঘুরে মরে ক্লান্ত শেষে শ্রবণভূষণ
শিরীষ কুসুমে বসে পেলব প্রসূন
কোনও মতে পদভার সহিতে তাহার।
সোহাগ করিয়া কেহ চক্রবাকী ধরি
অভিমানী চক্রবাকে দেয় মিলাইয়া.
কুসুমে বসায়ে দেয় ভ্রমর ধরিয়া
ফুলমালা দিয়ে দেয় বাঁধি কোনো বালা
মৃগসনে মৃগী। বৃক্ষের কোটরচ্যুত
শুক-শাবকেরে যতনে সলিল দানি
রাখে পুনঃ কোটরেতে ধীরে ধীরে কেহ।
কভু তারা ফলজল করে না গ্রহণ
তরুলতা মৃগশাবে না পিয়ায়ে জল
ভুলেও ভূষণতরে ছিঁড়ে না কখন
পল্লবিনী লতা হ'তে পল্লব শ্যামল।
বর্দ্ধিত তনয়-স্নেহে নীপ তরু' পরে
নাচিছে নীবারপুষ্ট ময়ূরশাবক
করতালি তালে তালে। কৃতকতনয়
করভ প্রসারি শুণ্ড আনন্দ চঞ্চল
উচ্চ তরুশাখা হ'তে পাড়ি দেয় ফল।
হোমধেনুগণ স্থির আছে দাঁড়াইয়া
শ্যামশষ্প-শ্যামাতৃণ করায় ভক্ষণ
বৈখানসসুতগণ। দুগ্ধ ধারাধ্বনি
ব্যাপিতেছে তপঃ-কুঞ্জ উঠিতেছে ভরে
আপনি মৃণ্ময়পাত্র সংস্কৃত ক্ষীরে।
মেধ্যাজিনসমাস্তীর্ণ—পর্ণকুটীরেতে
পাদ্যঅর্ঘ্য শাস্ত্যুদক উশীর চন্দন
মধুপর্ক স্রক্ আদি তৃণ ধান্য সহ
সুসজ্জিত অতিথির সেবার কারণ,
সমৃণাল অরবিন্দ সুশোভিত দ্বারে
মুখরা শারিকা রাজে আবাহন তরে।
কুটীরদ্বারের পরে উৎকলাপ শিখী
শিখায় শ্যামারে নানা ভঙ্গে নৃত্যকলা—
কেকারবে কণ্ঠছাড়ি ধরে যবে গান
সবায়ুকীচকরন্ধ্র ধরে তার তান।
শমীতরুতলে হেথা অগ্নিহোত্র পাশে—
বসিয়া আহিতাগ্নিক কুশবৃষীপরে,
বহ্নিমুখে নিত্য নব আহুতি প্রদানে
তুষিছেন দেবগণে। দ্বিতীয় কৃশানু
যতাত্মা জ্বলৎপ্রভ ত্রিবলী-অঙ্কিত
ভালে দীপিতেছে তেজ—'ওজঃ বিকিরিত,
বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি ঝরিতেছে গলে
বিনির্গত পদ্ম-গন্ধ। যোগায় ইন্ধন
শিষ্যবৃন্দ। ঝরিতেছে আজ্য সুবিমল।
উঠে স্বাহাস্বধাধ্বনি অন্তঃস্থল হ'তে
প্রজাপতি ঋষিস্তোত্রে—মিত্র দেবতায়
আহ্বানে গায়ত্রীচ্ছন্দে। দাউ দাউ করি
জ্বলিতেছে হোমবহ্নি—হবির্গন্ধপূত

ধূমরাজি কুণ্ডলিত উঠিছে গগনে
এলাইয়া কেশপাশ যেন বনমাতা
মৃগমদবিলেপনে হ'য়েছে ভূষিতা।
ঋষির সংসর্গে যেন বিটপী সকল
লভেছে ঋষির ধর্ম্ম। বেদীমধ্যগত
বৃক্ষশ্রেণী শোভিতেছে যেন যোগাসনে
উপবিষ্ট যোগিবর। শুখাছে বল্কল
তরুশাখে দুলে জপমালা, কমণ্ডলু
কাণ্ড হ'তে যেন ঋষি প্রব্রজ্যা লইয়া
চলেছে সন্ন্যাসব্রতে। হোম-ধূমরাশি
তরুপত্রশাখাশির করেছে মলিন
ধূম্রনিপীড়িত নেত্রে যজ্ঞান্তে যেমন
দাঁড়ায়ে রয়েছে কিবা অগ্নিহোতৃগণ।
বাকল কটিতে আঁটি জটাচীরধারী
নৃপতিনন্দন ত্যজি স্বর্ণ সিংহাসন
শিষ্য এই তপোবনে। ক্ষত অঙ্গ তার
যজ্ঞকাষ্ঠ ভাঙ্গি নিত্য, বিক্ষত চরণ
দর্ভাঙ্কুরে—ছিন্ন কর কুসুমকণ্টকে
নাহিক ভ্রূক্ষেপ তায় শীতাতপ সবই
সহিছেন অনায়াসে। বাতাহত তরু
কুসুমমঞ্জরী চারু চামরব্যজনে,
পৃথুছায়া দ্রুমছত্রে শিলার আসনে
পত্রের শয়নে, আর ভৃঙ্গাঙ্গনাগণে
ফলপুষ্পরসাসবে, নৃপতি সতত
রাজোচিত সেবা নিজ করেছে সংযত।
কোথা গেল হে ভারত—তোমার সুন্দর,
সেই শান্ত তপোবন! সে জ্ঞান-গৌরব
সে জীবন সে বৈরাগ্য সে মুক্তি কল্যাণ
আর আসিবেনা ফিরে। কোন্ কুম্ভীপাকে,
পড়ি আজি চাহিতেছি কোন স্বর্গ পানে।
আজি তুমি হত্যাভূমি ভীষণ শ্মশান
পিশাচের নাট্যশালা, কঙ্কাল সাজায়ে,
যথা ঐ অট্টালিকা হাসে অট্ট হাসি
খলখলে প্রেতবৃন্দ মজ্জা সজ্জা তার।
সৌন্দর্য্যসানন্দস্বাস্থ্যে শিরা উপশিরা
ছিল তব সঞ্জীবিত স্বরগ ছাড়িয়া
দেবশিশু তব কোলে লভিত বিরাম
চক্ষু ফাটি ঝরে জল সে দিন স্মরিয়া
দীর্ঘশ্বাসে টুটে যায় আত্মার পিঞ্জর
সন্তাপেতে ফেটে যায় বক্ষের পঞ্জর।
হে বিধাতঃ! দয়াময় দাও ফিরে দাও
পুনঃ পুণ্য তপোবন। লও এ সভ্যতা
বিদ্যালয় রাজপথ নগরী উদ্যান—
গাভীরক্ত-কলঙ্কিত, এ সমগ্র সুখ।
নিতান্ত মুমুক্ষু আমি। করে দাও মোরে
সর্ব্বহারা লক্ষ্মীছাড়া কোপীনসম্বল
রিক্তবক্ষ মুক্তচক্ষু দীনাদপি দীন
চূর্ণ করি পদাঘাতে সুবর্ণ পিঞ্জর,
ভাঙি মম প্রভাময় হীরক শৃঙ্খল
আমি ছুটে যেতে চাই কাননের মাঝে
বিদেশীয় বাসবন্ধ করি পরিহার
বাকল কটিতে আঁটি পাগল হইয়া,
লও সবি তারি—সাথে দাসত্ব-জীবন,
শুধু ফিরে দাও মোর সেই তপোবন।

সাহিত্য ও সমাজ।*

—★— -

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিবিধ শক্তির অনন্ত আধার। জড় ও জঙ্গম জগতের যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই সেই সকল শক্তির প্রচ্ছন্ন ও প্রকট লীলা নয়নগোচর হইয়া থাকে। সেই শক্তি কোথাও শান্তা, কোথাও রৌদ্রা, কোথাও কল্যাণী, আর কোথাও বা ভীষণা। দেবীমাহাত্ম্যে যিনি বিষ্ণুমায়া ও চেতনা নামে অভিহিতা হইয়াছেন, শান্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রীতি, দয়া, লজ্জা ও নিদ্রারূপে যিনি সর্ব্বপ্রকার চেতন ও অচেতন পদার্থে সর্ব্বাবয়বে বিরাজমানা; শিশুর সরল সৌকুমার্য্যে, জ্যোৎস্নাস্নাত সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের মাধুর্য্যরূপে, অনুদিন স্ফুরিত হইয়া যিনি ভূতলে স্বর্গের শোভা সংযোজিত করিয়া দেন, তাঁহার তুলনা কোথায় পাইব? সেই শক্তি স্থূলতঃ দ্বিবিধ,—অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা। যিনি অন্তরঙ্গা, তিনিই চিৎশক্তি, সনাতনী বা মহামায়া; যিনি বহিরঙ্গা তিনিই মায়া। তিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। তাঁহার গুণেই রজ্জুতে সর্পভ্রম জন্মিয়া থাকে,—অস্তিত্বহীন বিশ্বপ্রপঞ্চে বাস্তব নিশ্চয়তা আরোপিত হইয়া মায়া-মমতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া দেয়। সুতরাং বুঝা যইতেছে যে, মহামায়ার মহাশক্তি অনন্তশক্তিশালিনী হইলেও অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা,—তাহা স্থূল দৃষ্টির অগোচর; কিন্তু সমগ্র বিশ্বসংসার ধ্বংস করিতে পারে। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী। মায়ারূপ উপাদানে তিনি পৃথিবী গড়িতেছেন, সেই মায়ারূপেই তাহার রক্ষণ ও পালন করিতেছেন, আবার মহারৌদ্রা মূর্ত্তিতেই তাহার ধ্বংস করিতেছেন।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত সাহিত্যের এবং বহিরঙ্গা শক্তির সহিত সমাজের সাদৃশ্য কল্পিত হইতে পারে। সাহিত্য বলিলেই বোধ হয় কেবল গ্রন্থনিবদ্ধ ভাষা-শৃঙ্খলা বা পারিপাট্য বুঝায় না। ভাবনিবহের পরিণত ও সুসম্বদ্ধ বিকাশসমষ্টিই সাহিত্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির সহিত তাহার পূর্ণ সাদৃশ্য রক্ষিত হইতে পারে। মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয় স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ। ভাব মহাশক্তির স্ফুরণ; সেই মহাশক্তি পূর্ণ প্রতিভাত হইলে তবে ভাব পরিণতি লাভ করিতে পারে। পরে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাত্র হইতে প্রেরিত, ক্রমে মার্জ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এক একটি বূহ বা সমাজের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

সমাজ একধর্ম্মান্বিত জাতি, বর্ণ বা গণসমূহের নির্ব্যূঢ় সমষ্টি। ইহার বিরাট শরীর।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের বহরমপুর শাখার দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

সেই বিপুল দেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুরূপ সুকৌশলে সংন্যস্ত.— এরূপ সমবেদনা-সূত্রে পরস্পরে গ্রথিত যে, একটি সামান্য প্রত্যঙ্গের কার্য্যবিকারে সমগ্র সমাজ-শরীর সময়ে সময়ে বিক্ষুব্ধ— এমন কি, কখন কখন বিপর্য্যস্ত হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভাবই সমাজের প্রাণনিয়োজক বা স্রষ্টা এবং ভাবনিবন্ধের পরিণত ও সুসম্বদ্ধ বিকাশসমষ্টিই সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; সুতরাং সমাজের উপর ভাবের পূর্ণ প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক, নতুবা কোন সমাজই স্থায়িত্ব লাভ করে না। মেয়রা. ফিজিয়ান. পলিনেশিয়ান, জুলু, বা বেনিন নিগ্রোগণের,—সভ্য সমাজের ন্যায় বিশাল সাহিত্যশাস্ত্র নাই, কিন্তু তাহাদের ভাব আছে। সেই ভাব পরিপুষ্ট; তাহাই তাহাদের ধর্ম্মের প্রযোজক. তাহাদের সমাজের স্রষ্টা বা পরিচালক। সেই ভাবই তাহাদের মনোরাজ্যের সম্রাট. হৃষীকেশ বা হৃদয়নাথ। সর্ব্বপ্রাণে তাহারা সেই ভাবের আরাধনা করিয়া থাকে এবং তদুপরি আক্রমণ হইলে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য প্রবল সমাজসঙ্ঘের সহিত ভীষণ সঙ্ঘর্ষে তাহারা দলে দলে উচ্ছিন্ন হইতেছে. কিন্তু তাহাদের সেই ক্ষুদ্র সমাজের সৃষ্টিকালে ভগবানের যে অন্তরঙ্গা শক্তি তাহাদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আজিও তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; করিলে, তাহাদের অস্তিত্ব কোন্ যুগে বিলুপ্ত হইত।

মেয়রীর ন্যায় ফিজিয়ান, পলিনেশিয়ান, পাপুয়ান বা বেনিন-নিগ্রোগণের সম্বন্ধে প্রায় একই কথা বলা যাইতে পারে। তাহাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পূজাপদ্ধতি ও আচার ব্যবহারের অনেক স্থলে প্রগাঢ় সাদৃশ্য দেখা যায়। ইষ্টদেবতার সম্মুখে সেই আসুরিক উপচার—সেই বীভৎস নরবলি; সেই লোমহর্ষণ নরমেধযজ্ঞ;—সেই পিশিতাশন ক্রব্যাদগণের করালবদনে ভীষণ হাস্যসহ আমনরমাংসাস্থিচর্ব্বণ; দন্তপংক্তির কণ্ঠহার, কেশকলাপের কবচ রচনা, বিলোল রসনায় খর্পরপাত্রে অবিরত শক্ররক্তপান। সকলই আসুরিক ব্যাপার;—ভাবিতে গেলেও হৃদয় শিহরিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলিতেছেন. তাহাদের ধর্ম্মভাবের নিকট অনেক সুদক্ষ খৃষ্টান মিশনারীর উন্নত মস্তক অবনত হইয়াছিল।*

তাহাদিগের বড় বড় সাহিত্য গ্রন্থ নাই, বাল্মীকি, ব্যাস. সক্রেটিস্ বা এরিষ্টটল. প্লেটো বা ট্যাসিটস্, শেক্ষপীর বা মিল্‌টন, ভল্‌টেয়ার বা রুষো তাহাদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে নাই; কিন্তু তাহারা স্ব স্ব ক্ষীণ প্রাণের সূক্ষ্ম ভাব লইয়া যে সকল সমাজ গঠিত করিয়াছিল, তৎসমুদায় তাহাদের সম্বদ্ধ ভাবনিবহের স্বতঃপ্রেরণা বলিয়া বর্ণিত হইতে পারে। সেই ভাবই তাহাদের সাহিত্য; তাহাদের প্রাচীন গল্পগাথায় পিতৃপিতামহগণের অবদান-কথায় সেই ভাবের মহাশক্তি স্পষ্ট পরিব্যক্ত। সভ্যতার সোপানে তাহারা কোন্ পংক্তিতে আসীন, এস্থলে তাহার আলোচনা হইতে পারে না; কিন্তু তাহাদের ভাবের বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, তাহারা দৈত্য বা দানব, ক্রব্যাদ

* Nineteenth Century, January, 1885 page III.

বা Cannibalই হউক, তাহারা সত্যের চির উপাসক ; কৈতব বা কাপট্যের কলুষ-কালিমায় হৃদয় সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহারা মিথ্যা ভাণ করিতে জানে না। তবে মেয়রী বা ফিজিয়ানের সঙ্কিপ্ত ভাব-সাহিত্য ও সঙ্কীর্ণ সমাজ, না আধুনিক সভ্যতাভিমানী বিদ্যমান মহাত্মগণের বিরাট্ সাহিত্য ও সমাজ উন্নত? বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই এ বিষয়ে একটু মস্তিষ্ক চালনা করা উচিত।

"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বীঃ"

কাল অনন্ত, কিন্তু পৃথিবী বিশাল হইলেও অন্তবতী। পৃথিবীতে মানবসৃষ্টির সময় হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টি বা সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সমাজেরও সৃষ্টি হইয়াছিল, শুনা যায়। তন্মধ্যে অনেক সমাজ হিন্দুসমাজ অপেক্ষা অর্বাচীন হইলেও কোন্ যুগে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সাহিত্য আজিও প্রায় পূর্ণাবয়বে বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাহাদের ভাব বা সাহিত্য কিংবা তাহার কার্য্যফল অনন্তকালের জন্য তাহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় আর্য্য, ইজিপ্শিয়ান্, গ্রীক্, রোমক প্রভৃতি সকল প্রাচীন জাতির পক্ষে এই প্রশংসাবাদ সম্পূর্ণ প্রযুক্ত হইতে পারে। সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে একমাত্র ভারতীয় আর্য্য ভিন্ন অবশিষ্ট সকলেরই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদিগের কীর্ত্তিকলাপ তাহাদিগকে মহাকালের অনন্ত শ্মশানক্ষেত্রে স্তূপীকৃত চিতাভস্মের মধ্যেও অমর করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র ভারত—সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র—পবিত্র ভারত অতি প্রাচীনকাল অবধি নানাবিধ অসীম উপদ্রব ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও শত শত প্রচণ্ড শত্রুর পাশব আক্রমণ হইতে আপনার ধর্ম্ম ও রীতি-নীতি এখন পর্য্যন্তও প্রায় অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে।—কিন্তু বোধ হয় আর পারে না। বুঝি ভবিষ্য-পুরাণের ভয়াবহ কঠোর বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হয়।

দুরন্ত কলির করালচ্ছায়া ভারতের সর্ব্বাঙ্গে বিসারিত হইবার পূর্ব্বে একদা ত্রিকালজ্ঞ ভগবান্ পরাশর প্রিয় শিষ্য মৈত্রেয়কে বলিয়াছিলেন।

ততশ্চানুদিনমল্পাল্প
হ্রাসাদ্ব্যবচ্ছেদাৎ,
ধর্ম্মার্থয়োর্জগতঃ
সংক্ষেপো ভবিষ্যতি।

ততশ্চার্থ এবাভিজনহেতুর্দ্ধনমেবাশেষ ধর্ম্মহেতুরভিরুচিরেব দাম্পত্যসবন্ধহেতুরনৃতমেব ব্যবহারজয়হেতুঃ স্ত্রীত্বমেবোপভোগহেতুঃ রত্নতাম্রভাগিতৈব পৃথিবীহেতুর্ব্রহ্মসূত্রমেব বিপ্রত্বহেতুঃ লিঙ্গধারণমেবাশ্রমহেতুরন্যায় এব বৃত্তিহেতুঃ॥

দানমেব ধর্ম্মহেতুঃ আঢ্যতৈব সাধুত্বহেতুঃ। স্নানমেব প্রসাধনহেতুঃ স্বীকরণং বিবাহহেতুঃ সদ্বেশধার্য্যেব পাত্রং দূরায়তনোদকমেব তীর্থমিত্যেবং শ্রৌতস্মার্ত্তধর্ম্মে বিপ্লবমত্যন্তমুপাগতে—

অনন্তর এই জগতে ধর্ম্ম ও অর্থের দিন দিন হ্রাস হইয়া নিতান্ত ন্যূনতা ঘটিবে। তখন ধনই কৌলীন্যজনক, অর্থই ধার্ম্মিকতার পরিচায়ক, অভিরুচিই দাম্পত্য সম্বন্ধের প্রয়োজক, মিথ্যাই ব্যবহারাধিকরণে জয়হেতু, কামিনীই ভোগ্য বস্তু, রত্নতাম্রলৌহ প্রভৃতির

সত্তাই উত্তম ভূমিত্বের কারণ, যজ্ঞোপবীত ধারণই আশ্রমধর্ম্মের লক্ষণ এবং অন্যায়াচরণই জীবিকানির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ হইবে। দানই ধর্ম্মের কারণ, ধনবত্তাই সাধুতার হেতু, স্নানই প্রসাধনের হেতু, স্বীকারই বিবাহের নিদর্শন, সুবেশধারী ব্যক্তিই সৎপাত্র, এবং দূরস্থিত জলই তীর্থ হইবে। এইরূপে সেই সময়ে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত সমুদায় ধর্ম্মই বিলুপ্তপ্রায় হইবে।

দুরন্ত কলির আগমনে ভগবান্ পরাশরের উক্ত চিত্র যে, অক্ষরে অক্ষরে সার্থক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কলির কুটিল প্রভাবে তখন মানবের বুদ্ধি-বৃত্তি কলুষিত ও বিকৃত হইতেছিল, স্বার্থের অবিরত সঙ্ঘর্ষে, জীবন-সংগ্রামের কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতীত গৌরবের ভস্মরাশির উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া ভারতবাসী মাত্রই পরস্পরের শোণিতপাত করিবার উদ্যোগ করিতেছিল; কুরুক্ষেত্রের বিশ্বদাহী সমরানলে ক্ষত্রিয়ের বলবিক্রম দগ্ধ হইলে, শূদ্রগণ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছিল। বৈশ্যগণ ধন ও স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া বাণিজ্যাদি ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল, এবং ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া তপস্যা ও যজ্ঞের ফলবিনিময়ে আত্মরক্ষার মন্ত্রণায় নিবিষ্ট ছিলেন।

কলির প্রারম্ভকালে, কালকবলিত ভারতের সেই বিপ্লুত অবস্থায়, কুল, শীল, বিনয় ও শ্রৌতস্মার্ত্তাদি কর্ম্মকলাপের মুমূর্ষু কালে সমাজতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে ভারতের যে ভাবী চিত্র সর্ব্বসমক্ষে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, আজি সহস্র সহস্র বৎসর পরে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। সেই ব্রাহ্মণ সেই একই যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া সেই অসিত, দেবল, ভৃগু, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রপতিগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের সে তেজ, সে তপোবল, সেই অধৃষ্য আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ কোথায়? যাঁহারা ভূদেব নামে পূজিত হইয়া সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর একাধিপত্যও হস্তামলকবৎ অগ্রাহ্য করিতেন, আজি তাঁহাদের নির্ম্মল শ্রুতিজ্ঞান হীন, স্বার্থবাঞ্চিত ও অধঃপতিত সন্তানগণ ধর্ম্মধ্বজী অহম্মন্য শূদ্র ও বৈশ্যদিগের সম্মুখে শিষ্যবৎ বিনীত ভাবে নিষণ্ণ। আজি তাঁহারা উদরান্নের জন্য যবনেরও কৃপাকটাক্ষকণা লাভ করিবার আশায় নিরন্তর উদ্গ্রীব। আজি ক্ষত্রিয় অসিতূণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মসিপেষণ দ্বারা প্রভুগণের তুষ্টিবিধানে অবিরত বিব্রত, বৈশ্য স্বাধীনবৃত্তি ত্যাগ করিয়া দাস্যের সাহায্যে আত্মরক্ষার নিমিত্ত লালায়িত; শূদ্র নিম্নশ্রেণী হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া দ্বিজগণের অধিকার হস্তগত করিতে উদ্যত। যাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কেবল গোচারণ, দোহন, তক্ষণ, হল বা বলীবর্দ্দ চালনা করিয়াই গিয়াছে, সেই আভীরগোপ, সূত্রধার, কর্ম্মকার বা সদ্গোপগণের মধ্যে কেহ কেহ আজি দুই-চারিটী পতিত ব্রাহ্মণের সাহায্যে বেদ রূপ বিশাল বৃক্ষ হইতে দুই একটি পুরাতন ফল হরণ করিয়া নূতন ধর্ম্মের প্রবক্তা হইতেছে। কোন কোন কৈবর্ত্ত ধীবর, শবর বা শৌণ্ডিক আজি কাশী বা নবদ্বীপের তীর্থোদকে দুই দিন স্নান করিয়া এবং সাঙ্খ্য বা পতঞ্জলির দুই একটী সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া সর্ব্বত্র সদম্ভে পাদক্ষেপপূর্ব্বক মেদিনীর ভীতিসঞ্চার করিতেছে। কেহ বা

জগন্নাথক্ষেত্র, বা সুদূর হরিদ্বারে নূতন মঠ স্থাপিত করিয়া অভিনব যুগধর্ম্মের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে প্রবৃত্ত, কেহ বা লুপ্ততোয়া সুরধুনীর তীরে সঙ্কীর্ণ চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্ব্বক "নিরস্ত পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে" বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে।

ফলকথা, বঙ্গের বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের যে কোন স্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তাহার সর্ব্বত্রই এই দারুণ বিপ্লবের প্রমাথিনী ভৈরবী মূর্ত্তি। ইহার প্রকৃত কারণ কি? জীবন-সংগ্রামে জীব মাত্রেরই নূতন নূতন আত্ম রক্ষিণী শক্তি উদ্ভাবিত হয়; সেই সমস্ত শক্তির সজ্ঘর্ষ অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে কতকগুলি ক্ষুণ্ণ হইয়া অপর গুলিতে লীন হইয়া যায়; তখন তাহাদের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। অবশিষ্ট শক্তিনিচয় সময়ে পরিপুষ্ট হইয়া ক্রমে দ্বিগুণতর ফল উপচয় করিতে থাকে, দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে আরম্ভ করে। এই সমবেত দৃঢ়ীভূত শক্তি-নিবহের চরম পরিণতি বা স্ফূর্ত্তিই জগতের স্থিতিহেতু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে।

জীবসমাজের সকল স্তরেই এইরূপ জীবন-সংগ্রামের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভিন্ন রুচি শালী বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী অনাত্মীয় পাশ্চাত্য জাতির শাসনে,—পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির অসাত্ম্য প্রভাবে বঙ্গসমাজ এখন আমূল আলোড়িত; আজি প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব। লোকসৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বপর্য্যন্ত বঙ্গে এরূপ সর্ব্বজনীন বিপ্লব কখনও ঘটে নাই; সাম্যবাদী বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব এরূপ বিপ্লুত ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই; মুসলমানের উন্মুক্ত কৃপাণ কখনও বঙ্গের বিরাট্ সমাজ-শরীরকে এত শতধা খণ্ডিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজি যেন সমস্তই "ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবসম্বন্ধে হিন্দু-মাত্রেরই চিন্তা করা আবশ্যক। "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ-বন্ধূনা ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" এই মহাশাস্ত্র-বচন এখন চিন্তাশীল হিন্দু মাত্রেরই নিত্য চিন্তনীয় ও প্রধান আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। দ্বিজবন্ধুর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক অধিক। তাহারা আত্মাভিমানের অহমিকায় বিমূঢ় হইয়া অধস্তনের নিম্নতম কূপে ক্রমেই নিমগ্ন হইতেছে। কে তাহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবে? দীর্ঘকালব্যাপী বৌদ্ধবিপ্লব ও মুসলমান-শাসন হিন্দুর সংসার-রঙ্গালয়ে যে যবনিকা নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আর উঠিল না। যবনিকার অন্তরালে কত করুণ ও বীভৎস রসের অভিনয় হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

মুদ্রাযন্ত্র এখন জগতের সর্ব্বত্র যে বিপ্লবের উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহার প্রচণ্ড বেগের সম্মুখে শাস্ত্রবন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। কে এখন তাহার বেগ রোধ করিবে? এই নূতন মহাশক্তি বা অভিনব সাহিত্যের সম্মুখে সমাজ চূর্ণ হইয়া পড়িবে, না বিষ্ণুমায়া তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন, কে তাহা অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতে পারে? মহানিদ্রার অবসানে জাগরণ সদৃশ আজি প্রাচ্য জগতের সর্ব্বস্থলই জাগিয়া উঠিতেছে। এইরূপ জাগরণে সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কায়স্থ, যুগী প্রভৃতি শ্রেণীসমুদায়ের যজ্ঞো-

পবীত-গ্রহণে বঙ্গের স্থানে স্থানে সেই বিপ্লব-ভেরী অগ্রেই নিনাদিত হইয়াছে। ক্রমে পূর্ব্ববঙ্গে নমঃশূদ্র এবং দক্ষিণাপথে ফেরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়সমূহের প্রবল দীর্ঘশ্বাসে বিপ্লব-ঝটিকার পারম্ভ-শ্বাস শ্রুত হইতেছে। ইহার পরিণাম কি হইবে, অনুমানসাহায্যে তাহা নির্ণীত হইতে পারে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অসাত্ম্য প্রভাবে আমাদের মস্তিষ্ক এমনই আলোড়িত হইয়াছে যে, ভগবদ্বাক্যে ও ঋষিবচনে আমরা আর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। ভগবান বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য
গ্লানির্ভবতি ভাবত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য
তদাত্মানং সৃজাম্যহম।

এই মহাবাক্যের সার্থকতা জগতে কতবার দেখিলাম—কতবার শুনিলাম, কতবার প্রাণে প্রাণে প্রণিধান করিলাম, তথাপি এখনও সন্দেহ—সংশয়—অবিশ্বাস। ভগবান্ স্বয়ং যে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে কতবার তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল;—কত শুম্ভনিশুম্ভ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, সেই পরম পবিত্র বর্ণব্যবস্থা আলোড়িত করিয়া নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কত শুস্থকা, অশোক, মিহিরকুল তাহার সংহারসাধনে ধৃতব্রত হইয়াছিল; শাক্যসিংহের পরবর্ত্তী উচ্ছৃঙ্খল বৌদ্ধগণের পাপ-প্ররোচনায় সুবিশাল ভারতভূমে কতবার বর্ণবিপ্লবের প্রচণ্ড তূর্য্য নাদিত হইয়াছিল, কিন্তু কৈ কেহই ত তাহার সমূলে উচ্ছেদসাধন করিতে পারে নাই! তবে কি বিংশ শতাব্দীর উন্নত নীতি ও বিজ্ঞানের অমোঘ ভাববিপ্লবে সেই ভগবদ্বাক্য বিফল হইবে? সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের মতধ্বনি আজি চাতুর্ব্বর্ণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত, এবং বঙ্গের অনেক স্থল তাহার প্রতিকূলে সজ্জিত হইলেও আমরা কিছুতেই ভগবানের অভয়বাণী অবহেলা করিতে পারি না।

শূন্য গৃহ।

গৃহেতে আমার জ্বালেনি কেহ ত
সন্ধ্যা প্রদীপ আজি।
সাজা'য়ে রাখেনি যতনে কেহ রে
রজনীগন্ধারাজি।
ধূপের গন্ধ নাহি কোথা উঠে.
শঙ্খনিনাদ নাহি কোথা ফুটে
আশা-পথ চেয়ে বসিয়া নাহি রে
কেহ মোর তরে আজি!

শয্যা আমার রয়েছে পড়িয়া
যতনে পাতেনি কেহ।
সকলি শিথিল, লুটায় ধূলায়.
হাহাকারে কাঁদে গেহ।
কোথায় লুকাল গৃহদেবী মোর
সুখের বাসর হয়নি ত ভোর,
কে তাহারে নিয়ে গেল ভুলাইয়া
দেখেনি কি হায় কেহ!

হাহা করি বহে মত্ত ঝটিকা,
রাত্রি আসিল ওরে!
আঁধারের পর ভীষণ আঁধার
ঢাকিয়া ফেলিছে মোরে।
কোথা চাঁদ মোর জীবন-গগনে,
আঁধার জগতে রহিব কেমনে,
তামসী এ নিশি কেমনে যাপিব
একেলা নয়নলোরে!

ক্ষুদ্র বালিকা, এরে লয়ে একা
কেমনে কাটা'ব দিন।
জগতের মাঝে আরত দেখি না
আলোকের রেখা ক্ষীণ!
নিরাশ হৃদয়ে নয়নের জলে
মৃত্যু আমার হ'বে পলে পলে,
দেবীহীন এই শূন্য গৃহেতে
পড়ে রব দীন-হীন!

উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

তপোবনে জীবনধারণার্থে ভিক্ষাদিদ্বারা অল্প পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া ভক্ষণের নিয়ম আছে ;

চতুর্ষু বর্ণেষু ভৈক্ষচর্য্যং চরেৎ। পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ। ঔষধবৎ প্রাশ্নীয়াৎ। যথালাভমশ্নীয়াৎ প্রাণসন্ধারণার্থং যথামেদোবৃদ্ধির্ন জায়তে। (কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ।)

অনুবাদ। চারিবর্ণের নিকটেই ভিক্ষা গ্রহণ করিবে ; পাণিপাত্রে ভোজন করিবে। (অন্য ভোজনপাত্র রাখিবার প্রয়োজন নাই।) যেমন ঔষধ বিস্বাদ হইলেও লোকে পান করে, তেমনি অন্ন ভাল মন্দ যেরূপই হউক না কেন ভক্ষণ করিবে। প্রাণধারণার্থে যে পরিমাণ আহার করা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ আহার করিবে। দেখিবে যে ভোজনবশতঃ যেন মেদোবৃদ্ধি না হয়।

বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের অন্যান্য কর্ত্তব্যের সংক্ষেপ বিবরণ এই ;—

ব্রহ্মচর্য্যামহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত হে রক্ষত।

অনুবাদ। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসিগণ ! তোমরা ব্রহ্মচর্য্য (যুবতীদিগের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, উপভোগ, সংকল্প, অধ্যবসায়, ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই অষ্ট প্রকার মৈথুন বর্জ্জন), অহিংসা (কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের অনিষ্টবর্জ্জন), অপরিগ্রহ (দণ্ডকৌপীনাদি ভিন্ন পরিগ্রহ বর্জ্জন), সত্য (সত্য অথচ প্রিয় ও হিতবাক্য), অস্তেয় (চুরি না করা) এইগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে। প্রাণ গেলেও এইগুলি পরিত্যাগ করিবে না।

বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভৈক্ষাশ্রমিগণ ইচ্ছা করিলে তীর্থক্ষেত্রাদি ভ্রমণ করিতে পারে, কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থে আধ্যাত্মিকভাবে তীর্থ কৃতাই তাঁহাদের লক্ষ্য। সুতরাং অন্য তীর্থ ভ্রমণের আবশ্যক দেখা যায় না।

সোঽবিমুক্তঃকস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি বরুণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কাবৈবরুণা কাচনাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি বরণাভবতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশীভবতি।

(জাবালোপনিষৎ।)

অনুবাদ। পুনর্ব্বার অত্রি জিজ্ঞাসা করিলেন সেই অবিমুক্ত স্থান কোথায় অবস্থিত থাকে ? তখন যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জনিত দোষ নিবারণ করে তাহা বরণা এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ নাশ করে তাহাই নাশী। এই বরণা ও নাশী এই উভয়ের যোগে বারানসী (শী) নাম হইয়াছে।

অবিমুক্তে দ্বারকায়াং
শ্রীশৈলেপুণ্ডরককে।
দেহান্তে তারকং ব্রহ্ম
লভন্তে মদনুগ্রহাৎ ॥

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা
মুপনীতোঽথবাদ্বিজঃ ॥
বসস্থো বা বনস্থো বা
যতী পাশুপতব্রতী ॥
বহুনাত্র কিমুক্তেন
যস্তভক্তি শিবার্চ্চনে।
সএবাত্রাধিকারীস্যাৎ
নান্যচিত্তঃ কদাচন ॥
নামসংকীর্ত্তনে ধ্যানে
সর্ব্বএবাধিকারিণঃ।
সংসারান্মুচ্যতে জন্তুঃ
শিবতাদাত্ম্য ভাবনাৎ ॥
যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ
মনশ্চৈবসুসংযতম্।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ
সতীর্থফলমশ্নুতে ॥
(শিবোপনিষৎ।)

অনুবাদ। শিব কহিলেন, অবিমুক্ত (কুরুক্ষেত্র ও কাশী) দ্বারকা, শ্রীশৈল ও পুণ্ডরীক এই সকল তীর্থে দেহ ত্যাগ করিলে আমার অনুগ্রহে তত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তারকব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, অনুপনীত, ব্রাহ্মণ, বনস্থ বা অবনস্থ, যতী এবং পাশুপতব্রতধারী যাহাদের শিবার্চ্চনে ভক্তি আছে তাহারা সকলেই মোক্ষমার্গে অধিকারী। যে আশ্রমস্থই হউন না কেন, যে তীর্থবাসই করুন না কেন, যাহারা ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তাসক্ত, তাহাদের মোক্ষমার্গে অধিকার নাই। আমার নামসংকীর্ত্তন ও ধ্যানে সকলেরই অধিকার আছে। "শিবোঽহং" এইরূপ শিবতাদাত্ম্য ভাবনা করিলে জীবমাত্রই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। যাহার হস্ত, পাদ ও মনঃ সুসংযত, এবং যাহার বিদ্যা, তপস্যা ও সাধুজনোচিত খ্যাতি আছে, সেই প্রকৃতপক্ষে তীর্থফল লাভ করিতে পারে।

ভৈক্ষ্যাশ্রম।

যখন বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া মনঃ এরূপভাবে গঠিত হয় যে, কোন প্রকার আহার পাইলেই হইল, যে কোন স্থানে থাকিলেই হইল, তাহাতে কোন কষ্টবোধ নাই, তখন অন্তর্দর্শনের উৎকর্ষের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। শয়নে, জাগরণে, উপবেশনে, ভ্রমণে সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র পরমব্রহ্মের ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতে হইবে। যখন এইরূপ অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়, তখন বানপ্রস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ভৈক্ষাশ্রম গ্রহণ করিবে। এই আশ্রম বানপ্রস্থাশ্রম অপেক্ষাও সর্ব্বপরিবর্জ্জনসঙ্কুল। এই আশ্রমে কোন প্রকার নিকেতন রাখিবার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি রাখিতে নাই। যেখানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেখানেই থাকিয়া রাত্রি কাটাইবে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, মান ও অপমান, বিষ্ঠা ও চন্দন, সুস্থান ও কুস্থান ইত্যাদি সকল সমানভাবে জ্ঞান করিবে। নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া এবং সমস্ত ব্রহ্মময় ভাবিয়া ধর্ম্মজীবনের চরম সুখ লাভ করিবে। ভৈক্ষাশ্রমীদিগের অনুষ্ঠেয় সংক্ষিপ্ত নিয়মগুলি এই ;—

কৃশীভূত্বাগ্রামে একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং চতুরো মাসান্ বার্ষিকান্ গ্রামে বা নগরেবাপি বসেৎ। (কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ।)

অনুবাদ। কৃশভাবে থাকিয়া গ্রামে এক রাত্র ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করিবে। বর্ষার

চারিমাস গ্রামেই হউক বা নগরেই হউক বাস করিবে।

নদীপুলিনশায়ীস্যাদ্দে
বাগারেষু বা বসেৎ।
নাত্যর্থং সুখদুঃখাভ্যাং
শরীরমুপতাপয়েৎ॥
স্তূয়মানো ন তুষ্যেত
নিন্দিতো নশপেৎ পরান্।
এবং বৃত্তিমুপাসন্তে
যাতয়স্ত্রীন্দ্রিয়ানথ॥
(কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ।)

অনুবাদ। কখন নদীপুলিনে শয়ন করিয়া থাকিবে, কখনও বা দেবাগারে বাস করিবে। অতিশয় সুখ ও দুঃখে কখন শরীরকে উপতাপিত করিবে না অর্থাৎ মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট করিবে না এবং অতিশয় দুঃখ সহ্য করিয়া শরীরকে দুর্ব্বল করিবে না। কেবল নানাস্থানে গমনোপযোগী সামর্থ্য থাকে, এইরূপভাবে শরীর ধারণ করিবে। কেহ প্রশংসা করিলে তাহাতে তুষ্ট হইবে না, এবং কেহ নিন্দা করিলেও তাহার উপর আক্রোশ করিবে না। এইরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিবে, কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের বাধ্য হইবে না।

যাঁহারা দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর যজ্ঞোপবীত শিখা, তিলক কিছুই ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমে যে উদ্দেশ্যে শিখা তিলকাদি ধারণ করা হইত, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই সেই আশ্রমোচিত কৃত্যও সম্পন্ন হইয়াছে। যে আশ্রমে জাতি-বিচার নাই, যে আশ্রমে ভেদবুদ্ধি নাই, যে আশ্রমে থাকিয়া সমাজে মিশিবার প্রয়োজন নাই, যে আশ্রমে রাজকর দিবার কারণ নাই, স্ত্রীপুত্রাদি পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের জন্য দায়িত্ব নাই, গৃহভবনাদি সংস্কারের চিন্তা নাই, পরদিনকার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার আবশ্যক নাই, মনুষ্যাদি প্রাণী হইতে অবিচার অত্যাচারের ভয় নাই, সেই সর্ব্বত্যাগ রূপ আশ্রমে যে শিখা, তিলক ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগও করণীয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই আশ্রমের কার্য্যবল, চিন্তাবল, ধর্ম্মবল সকলই আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ।

বাশিখঃ পবনং কৃত্বা
বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বুধঃ॥
যদক্ষরং পর ব্রহ্ম তৎ
সূত্রমিতিধারয়েৎ॥
সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ
সূত্রং নাম পরং বিদুঃ।
তৎসূত্রং বিদিতং যেন
স বিপ্রো বেদপারগঃ॥
তেন সর্ব্বমিদং প্রোতং
সূত্রে মণিগণাইব।
তৎসূত্রং ধারয়েদ্যোগী
যোগবিৎ তত্ত্বদর্শিবান্॥
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং
ধারয়েৎ যঃ সচেতনঃ।
ধারণাত্তস্য সূত্রস্য
নোচ্ছিষ্টঃ নাশুচির্ভবেৎ॥
অগ্নেরিব শিখানান্যা
যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
সশিখীত্যুচ্যতে বিদ্বা
নিতরে কেশধারিণঃ॥
(ব্রহ্মোপনিষৎ।)

অনুবাদ। জ্ঞানী ব্রাহ্মণ শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিয়া বাহ্য সূত্র পরিত্যাগ করিবে। যাহা অক্ষয় পরমব্রহ্মস্বরূপ সেই শিখা ধারণ করিবে। উপনিষৎ দ্বারা পরমব্রহ্ম সূচিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে সূত্র বলে। যে বিপ্র এই সূত্রকে জানিতে পারিয়াছেন তিনিই বেদপারগ। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি এই ব্রহ্ম-সূত্রে সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে। যোগবিৎ তত্ত্বদর্শী দ্বিজ এই সূত্র ধারণ করিবেন। যিনি এই ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন, তিনি কখন উচ্ছিষ্ট দূষিত অশুচি হন না। যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে অগ্নির শিখা কিছুই নহে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকেই শিখী বলা যায়। ইহা ভিন্ন অজ্ঞানেরা যে শিখা ধারণ করে, সে কেবল কেশরাশিই ধারণ করে।

আধ্যাত্মিকভাবে উপবীত ধারণের ন্যায় সন্ন্যাসীদিগের সন্ধ্যাও আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ। যথা ;—

যদাত্মা পরমাত্মানং
সন্ধত্তে পরমাত্মনি।
তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব
তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥
নিরোদকা ধ্যান সন্ধ্যা
বাক্কায়ক্লেশবর্জ্জিতা।
সন্ধিনী সর্ব্বভূতানাং
সা সন্ধ্যা হ্যেকদণ্ডিনাম্॥

(ব্রহ্মোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যে সময় প্রজ্ঞাদ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সন্ধান করা যায় অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বোধ জন্মে, তাহাকেই প্রকৃত সন্ধ্যা বলে। এই আত্মধ্যানই সন্ধ্যা শব্দের বাচ্য, অতএব এইরূপ সন্ধ্যাবন্দনাদির আবশ্যক আছে। এই ধ্যানসন্ধ্যা করিতে হইলে জলের আবশ্যক নাই এবং মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া বাগিন্দ্রিয় ও দেহকে কষ্ট দিতে হয় না। উহা সর্ব্ব প্রাণীর সম্বন্ধে সন্ধিনী অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবোধিকা। একমাত্র দণ্ডীদিগেরই ঐরূপ সন্ধ্যা উপাস্যা। ভিক্ষু আশ্রমিগণ কিরূপে আত্মতত্ত্ব সাধন করিবে তদ্বিষয়ে উপনিষদে এইরূপ উপদেশ আছে।

অধুনা সত্যাদীনিভিক্ষোঃ সম্যগ্জ্ঞান সহকারীনি সাধনানি বিধীয়ন্তে নিবৃত্তি প্রধানানি।

(শঙ্করভাষ্যম্।)

অনুবাদ। এক্ষণে ভৈক্ষ্যাশ্রমীর সম্যগ্ জ্ঞানসহকারী নিবৃত্তিপ্রধান সত্যাদি সাধন বলা যাইতেছে।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা
সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেন নিত্যম্।
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়োহি শুভ্রো
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ।)

অনুবাদ। এই আত্মা সত্যদ্বারা অর্থাৎ অনৃতবাক্যত্যাগদ্বারা, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপস্যাদ্বারা, সম্যগ্জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদর্শন দ্বারা এবং ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ স্মরণাদি অষ্টবিধ মৈথুনত্যাগদ্বারা প্রাপ্তব্য। সেই জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কলঙ্ক পরমব্রহ্ম শরীরের অভ্যন্তরে বিরাজিত আছেন। যোগিগণ নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করেন।

সর্ব্বাশ্রমীদিগের একমাত্র লক্ষ্য সেই পরমাত্মার বিষয়ে উপনিষদে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

(আত্মতত্ত্ব।)

স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষাতীতো "ঽবস্থাত্রয়স্য সাক্ষী সচ্চিদানন্দ স্বরূপঃ সন্ যস্তিষ্ঠতি স আত্মা। (তত্ত্বোপনিষৎ।)

অনুবাদ। যিনি স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর এই ত্রিবিধ শরীর হইতে পৃথক্; যিনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ হইতে ভিন্ন; যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার সাক্ষী, যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনিই আত্মা।

উদ্ধৃত লক্ষণে যে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের বিষয় বলা হইয়াছে, সেই শরীরত্রয় কি তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে বুঝান যাইতেছে। ঈশ্বর জীবের উপভোগসম্পাদক স্থূল বিষয়ের সম্পাদনার্থ পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের পঞ্চীকরণ করেন। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতকে স্থূল ভূত কহে। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমানাংশে দুইভাগে বিভক্ত করিলে সাকল্যে দশভাগ হয়। পরে প্রত্যেক ভূতের একএকটী অংশকে চারি চারি খণ্ড করিয়া পূর্ব্বস্থিত আকাশাদির মধ্যে যে কোন ভূতের দুই খণ্ডের যে এক খণ্ড আছে, তাহার প্রত্যেক প্রথমাংশে প্রত্যেক চারি অংশ যোগ করিলে পঞ্চীকরণ হইয়া থাকে। যেমন পঞ্চীকৃত পৃথিবীতে পৃথিবীর ½ অর্দ্ধাংশ ও অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকটী ⅛ এক অষ্টমাংশ করিয়া যোগে ½ অর্দ্ধাংশ আছে। পঞ্চীকৃত জলাদিতেও ঐরূপ জানিবে। এইরূপ পঞ্চীকৃত স্থূল ভূতই শব্দাদি গুণের অভিব্যক্তি সম্পাদন করে। পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ কালে আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জল শব্দ স্পর্শ রূপও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ গুণ প্রকাশিত হয়। এইরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে উৎপন্ন, কার্য্যরূপ সুখদুঃখাদি ভোগের আয়তন মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদজ এবং বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জ উৎপন্ন হয়। ইহা কালক্রমে জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষীণ ও বিনষ্ট হয় এই ছয় প্রকার বিকারযুক্তই স্থূল শরীর। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে জাত সুখ দুঃখাদি ভোগের কারণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চপ্রাণ (প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), আর মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশাত্মক যে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ কহে। যিনি অনির্ব্বচনীয় (সত্য ও অসত্য এবং সত্যাসত্য মিলিত, ভেদ ও অভেদ এবং ভেদাভেদ বিমিশ্রিত, নিরবয়ব ও সাবয়ব এবং সাবয়ব ও নিরবয়ব বিমিশ্রিত) অনাদি ও অবিদ্যারূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের কারণ এবং স্বরূপ জ্ঞানের আবরণকারী নির্ব্বিকাররূপ আছেন, তাঁহার নাম কারণ-শরীর। এই ত্রিবিধ শরীরের যিনি অতীত তিনিই আত্মা। উদ্ধৃত অংশে যে আত্মা পঞ্চকোষ হইতে পৃথক এইরূপ বলা গিয়াছে এক্ষণে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে। যে অন্নরসের দ্বারা উৎপন্ন আবার রসের দ্বারাই অভিবৃদ্ধি হয়, আর অন্নরূপ পৃথিবীতে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম অন্নময়কোষ। ইহাই স্থূল শরীর। উপরে বর্ণিত যে প্রাণ (ঊর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রস্থিত-বায়ু,) অপান (অধোগমনশীল বায়ু,) ব্যান

(সর্ব্ব নাড়ীতে গমনশীল সর্ব্বশরীরস্থায়ীবায়ু,) উদান (ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থানস্থায়ী উৎক্রমণ বায়ু,) সমান (ভুক্তঅন্ন ও পীতজলাদির সমীকরণকারী বায়ু.) এই পাঁচটী বায়ু বাক্ প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রয়োজনানুসারে মিলিত হয়, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। মনঃ শ্রোত্রাদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে তাহাকে মনোময় কোষ বলে। বুদ্ধি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিয়া বিজ্ঞানময় কোষ হয়। এই প্রকার কারণ শরীরভূতা ও মলিনসত্ত্বাদিগুণপ্রধানা অবিদ্যা প্রিয়াদি বৃত্তির সহিত মিলিলে তাহাকে আনন্দময় কোষ কহে। এই পঞ্চ কোষের যিনি অতীত, তিনিই আত্মা।

উদ্ধৃত আত্মার লক্ষণে যে আত্মাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইতে পৃথক বলা হইয়াছে, সেই তিন অবস্থা কি তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যে শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান হয়, ঐ অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা কহে। স্থূলশরীরাভিমানী আত্মাকে এই অবস্থায় বিশ্ব বলে। জাগ্রদবস্থায় যাহা দেখা যায় ও শুনা যায়, তাহা হইতে বাসনা জন্মে। সেই বাসনা দ্বারা নিদ্রা-সময়ে যে প্রপঞ্চ প্রতীয়মান হয়, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। সূক্ষ্মশরীরাভিমানী এইরূপ আত্মা তৈজস বলিয়া কথিত হয়। যে সময়ে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কারণে উপরত হইয়া যায়, সুতরাং বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না, ইহাই আত্মার তৃতীয় অবস্থা বা সুষুপ্তি অবস্থা; অর্থাৎ আমি কিছুই জানিনা, কেবল সুখে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতে ছিলাম, এইরূপ যে নিদ্রা তাহাকে সুষুপ্ত্যবস্থা কহে। কারণ-শরীরাভিমানী আত্মাকে এই অবস্থায় প্রাজ্ঞ বলে। যখন আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা হইতে বিমুক্ত হন অর্থাৎ নির্লেপ হন, ব্যবধায়ক বস্তন্তররহিত থাকেন অর্থাৎ যখন ইহার কোন প্রকার বস্তু ব্যবধান থাকে না, কেবল একমাত্র ইনিই চৈতন্যমাত্র অবস্থান থাকেন—এইরূপ যে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়বিনির্ম্মুক্ত, তাহাই আত্মা।

উদ্ধৃত আত্মার লক্ষণে তাঁহাকে সাক্ষী ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কেন বলা হইয়াছে, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানামাবির্ভাবতিরোভাব জ্ঞাতা স্বয়মেবাবির্ভাবতিরোভাবহীনঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ স সাক্ষীত্যুচ্যতে।

সর্ব্বসারোপনিষৎ।

অনুবাদ। যিনি জ্ঞাতৃ ও জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি ও বিষয় এই দুইটীর আবির্ভাব ও তিরোভাব জানেন, কিন্তু নিজে আবির্ভাব ও তিরোভাবহীন, স্বয়ং জ্যোতিঃ স্বরূপ তাঁহাকে সাক্ষী বলে। যিনি অব্যবধানে থাকিয়া অর্থাৎ সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিয়া সমস্তের দ্রষ্টা তাঁহাকে সাক্ষী বলে।

উপাসনা।

কর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচার।

(৮)
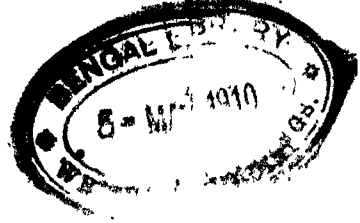
যোগ ও সগুণোপাসনাতত্ত্ব।

(পঞ্চমাংশ।)

(১০) সঙ্কল্প ও অপণ।

৬৭। এইক্ষণে সঙ্কল্প ও অর্পণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি। এই বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে ক্রিয়া সকল প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক ক্রিয়া সমস্ত যজ্ঞ শব্দে কথিত হয়। দৈব, পৈত্র্য, ইষ্টাপূর্ত্ত প্রভৃতি ক্রিয়া, অনন্ত ও সাবিত্রী আদি ব্রত ও সর্ব্বপ্রকার নৈমিত্তিক কর্ম্ম তাহার অন্তর্গত। এই সকল যজ্ঞের মধ্যে দৈবকর্ম্ম অর্থাৎ দেবার্চ্চনা, ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ পুষ্করিণ্যাদিপ্রতিষ্ঠা এবং শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বৈদিক ব্রতানুষ্ঠানে ও কোন কোন নৈমিত্তিক কর্ম্মে বৈদিক হোম হইয়া থাকে। কিন্তু পিতৃযজ্ঞে হোম নাই। এই উভয় প্রকার বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানেই "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনায়" সঙ্কল্পের সহিত ক্রিয়ারম্ভ হয় এবং "শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণমস্তু" বলিয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ করা হয়। ইহাতে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মই কামনার বিষয় হইল। কিন্তু "অকামোবিষ্ণুকামোবা।" অর্থাৎ বিষ্ণুপাদ-পদ্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক এবং তাঁহাতে অর্পণপূর্ব্বক যে ক্রিয়া আচরিত হয় তাহাই নিষ্কাম ক্রিয়া। ইহারই নাম "ব্রহ্মার্পণ", "পরমেশ্বরার্পণ" বা "ঈশ্বরার্পণ।" এই সঙ্কল্প ও অর্পণ, কার্য্যেতে পরিণত আছে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহারই উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত ক্রিয়া কাম্যক্রিয়া নহে। কেবল বিধিপালন মাত্র নহে। কিন্তু "কর্ম্মযোগ।" ইহারই উপদেশ গীতাদি যোগ-শাস্ত্রে। কর্ম্মানুষ্ঠানের এই পদ্ধতি দীর্ঘ-কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। গীতাদি যোগশাস্ত্রের ঐ উপদেশ, তৎপ্রাক্‌কাল বা তৎপরসময় হইতে এইরূপে কার্য্যে পরিণত হইয়া আছে। মন্ত্রপূত যজ্ঞভূমে আসীন হইলেই যজমান সে উপদেশের সফলতা অনু-ভব করিতে পারিবেন।

৬৮। শারদীয়া ও বাসন্তী পূজা উভয়ই

দুর্গোৎসব। পশ্চিম অঞ্চলে উহা শারদীয়া ও বাসন্তী-নবরাত্রী নামে উক্ত হয়। ঐ উভয়ই বৈদিক ও পৌরাণিক মন্ত্র ও ব্যবস্থা-সম্মত মহাযজ্ঞ। শ্রীদুর্গাদেবী, পরমা প্রকৃতি, মহামায়া ও মহাবিদ্যা স্বরূপিণী। তিনি বেদ, পুরাণ ও আগমসিদ্ধ। তাঁহার মহাপূজা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের সমবেত সিদ্ধান্ত। এই মহা-যজ্ঞেতে বহু বৈদিক দেবতার সমবেত অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ইহাতে বৈদিক হোম সম্পাদিত হয়। এই জন্য ইহা বৈদিক যজ্ঞ ও লোকতঃ কলির অশ্বমেধ নামে প্রশংসিত হয়। এই যজ্ঞেতে যে সঙ্কল্প হয় তাহা এতদ্দেশে "শ্রীদুর্গা-প্রীতি কামনায়" কৃত হয়। এস্থানে "শ্রীদুর্গা" শব্দ "শ্রীবিষ্ণু" শব্দের স্থান গ্রহণ করে। উভয় শব্দই একই ব্রহ্ম প্রতিপাদক এবং সঙ্কল্পস্থলে "অকাম" জ্ঞাপক। "শ্রীদুর্গা প্রীতিকামনায়" সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তে কোন দেশে "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনায়" মন্ত্র ব্যবহৃত হয় কি না জানি না। হইলেও হইতে পারে। কেননা দুর্গোৎসবে বহু দেবতার পূজা ও বৈদিক হোম হয়। তাদৃশ সমস্ত যজ্ঞে পরমাত্মার "শ্রীবিষ্ণুসংজ্ঞা" তদধিপতি ও যজ্ঞেশ্বর রূপে গৃহীত হইয়া থাকেন। ফলে "শ্রীদুর্গা" ও "শ্রীবিষ্ণু" সংজ্ঞা একই ব্রহ্ম প্রতিপাদক। এই দুই নামের যে কোন নাম সঙ্কল্পে উচ্চারিত হউক, তাহাতেই নিষ্কামযজ্ঞ সিদ্ধ হয়। অতঃপর ক্রিয়া সমাপন কালে ব্রহ্মার্পণ স্থলে, এ সমস্ত যজ্ঞের ফল শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মেই অর্পিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ যে সকল যজ্ঞে বহু দেবতার বরণ ও বন্দন, অথবা বৈদিক হোমের অনুষ্ঠান হয়, তৎসমস্ত শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মেই সমর্পিত হয়। ইহাই "ব্রহ্মার্পণ-ন্যায়।" এবং চিরপ্রসিদ্ধ। নতুবা বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণের মধ্যে কোন ব্রহ্মোপাসক যদি কোনরূপ নৈমিত্তিক কর্ম্মের স্বকপোল-কল্পিত পদ্ধতি প্রস্তুত করেন এবং "শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে অর্পণমস্তু" শব্দের পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলেন, তাহা অবিধি হইবে। যাঁহারা গীতা প্রভৃতি কর্ম্মযোগপ্রতিপাদক শাস্ত্র পড়েন, ব্রহ্মার্পণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের এই যে কার্য্যবিধি তাহাও তাঁহাদের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

৬৯। তান্ত্রিক কর্ম্মের সঙ্কল্প ও অর্পণ-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। শ্যামা, জগদ্ধাত্রী, ফলহারিণী ও অন্যান্য মহাবিদ্যা প্রভৃতি দেবীগণের অর্চ্চ-নাই তান্ত্রিক কর্ম্ম। সেই সমস্ত পূজাতে যে হোম হয় তাহা তান্ত্রিক হোম। তৎসমস্ত ক্রিয়া তত্তৎ দেবীগণের প্রীতিকামনায় সঙ্কল্পিত ও তাঁহাদের চরণে অর্পিত হয়। তাহাতেই যজমানের মনোগত অবৈধ স্বাভাবিক ফল-কামনা ঈশ্বরি-কামনাতে পরিণত হয়। তান্ত্রিক কর্ম্মানুষ্ঠানে ইহাই ব্রহ্মোদ্দিষ্ট ও ব্রহ্মার্পিত ক্রিয়া। এ সকল কর্ম্মে "শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনায়" সঙ্কল্প ও "শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে" কর্ম্মসমর্পণ করা যায় না। এস্থানে একমাত্র দেবীই পূজিতা এবং তিনি পূর্ণব্রহ্মসনাতনী। বৈদিকক্রিয়াতে অর্চ্চিত দেবগণও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেক বৈদিক কর্ম্মে বহুতর দেবগণের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। যথা গণেশাদি পঞ্চদেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল, গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা, দর্ভময় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। এই প্রত্যেক বৈদিককর্ম্ম প্রত্যেক দেবতার প্রীতিকামনায় সঙ্কল্পিত এবং প্রত্যেক দেবতার চরণে অর্পিত হওয়া সহজ নহে। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। যজ্ঞাধি-কারে, পরমাত্মা ব্রহ্মের "শ্রীবিষ্ণুসংজ্ঞা" ঐ

সকল দেবগণের অভিন্নস্বরূপ। শুদ্ধ তাহাই নহেন, কিন্তু "যজ্ঞই বিষ্ণু" এই শ্রুতি অনুসারে তিনিই সর্ব্বদেবতাস্বরূপে সর্ব্বযজ্ঞের অধিপতি যজ্ঞেশ্বর। এই নিমিত্ত যজ্ঞ সকল তাঁহাতে সঙ্কল্পিত ও অর্পিত হয়। কিন্তু তান্ত্রিক-দেবী-পূজায় একমাত্র দেবীরই অর্চ্চনা, এবং প্রত্যেক দেবীই যখন পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী এবং একমাত্র তিনিই যখন সে উৎসবের ঈশ্বরী, তখন আরম্ভে তাঁহারই প্রীতিকামনায় সে ক্রিয়ার সঙ্কল্প হয় এবং অন্তে তাঁহারি শ্রীচরণে তাহা অর্পণ করা গিয়া থাকে। "সর্ব্বংব্রহ্মময়ি ত্বয়ি সমর্পিতমস্তু" হে ব্রহ্মময়ি সমস্ত কর্ম্ম তোমাতে সমর্পণ করিলাম। এই বলিয়া যজমান অর্পণ কার্য্য সমাধা করেন। অথবা—

যথা—বিশ্বসার তন্ত্রে—

"নান্যং বদামি ন
শৃণোমি ন চিন্তয়ামি।
নান্যং স্মরামি ন
ভজামি ন চাশ্রয়ামি॥
ত্যক্ত্বা ত্বদীয় পদ-
পঙ্কজ মাদরেণ।
মাং ত্রাহি ভৃতকৃপয়া-
ময়ি দেহি সিদ্ধিং॥
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা
বৈকল্যাৎ সাধনস্যচ।
যন্ন্যূন মতিরিক্তম্বা
তৎসর্ব্বং ক্ষন্তু মর্হসি॥
দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং
শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতং।
তৎসর্ব্বং কৃপয়া দেবি
ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে॥
যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম
জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু।
তৎসর্ব্বং তাবকী পূজা
দয়াবৃত্যৈ নমঃ শিবে॥
যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম
যন্মহৎ স্বপ্নমেববা।
তৎসর্ব্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি
ক্ষন্তব্যামম্মঙ্গলিঃ॥"

এই বাক্যগুলি মন্ত্রমাত্র। কর্ম্ম সমর্পণ-কালে তাহার পাঠমাত্রই ফলপ্রদ। ভাষা তাৎপর্য্যে ফল নাই।

১০। এস্থানে কাম্য পূজা ও যজ্ঞাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞাপন করা প্রয়োজন হইতেছে। প্রাগুক্ত সমস্ত যজ্ঞে শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামনায় "সঙ্কল্প" ও শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে কর্ম্ম-ফল "অর্পণ" হয়। দুর্গোৎসবে শ্রীদুর্গাপ্রীতি-কামনায় "সঙ্কল্প" ও শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে "অর্পণ" হয়। তান্ত্রিক দেবীপূজায় দক্ষিণাকালিকা প্রভৃতি দেবীগণের প্রীতিকামনায় "সঙ্কল্প" এবং দেবিচরণে অর্পণ" হয়। অতএব এই সমস্ত যজ্ঞ ও অর্চ্চনা সবই নিষ্কাম ও ঈশ্বরার্থ। কিন্তু তদ্ব্যতীত, ইষ্টকামনার সহিত সঙ্কল্পিত হইয়া স্বতন্ত্ররূপে দেবদেবীগণের পূজাও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য তাদৃশস্থলে তাহা "কর্ম্ম-যোগ" শব্দের বাচ্য না হইতে পারে। ফলে, তাদৃশ ফলকামনা-সঙ্কল্পস্থলেও, কর্ম্মসমাপ্তিকালে সমস্ত ফল যথাধিকার শ্রীবিষ্ণু বা দেবিপাদপদ্মে অর্পিত হইয়া থাকে। অপরঞ্চ দেবিচরণে সঙ্কল্পিত ও অর্পিত নিষ্কাম পূজাতেও যথাপদ্ধতি স্তব স্তুতিতে নানাবিধ অভিষ্টকামনার যাচ্ঞা থাকা দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। কিন্তু কর্ম্মসমাপ্তি-কালে অবশ্য সমস্ত কর্ম্মফলই শ্রীবিষ্ণু অথবা

দেবিপাদপদ্মে অর্পিত হইয়া থাকে। সর্ব্বকর্ম্মে এইরূপ ঈশ্বরার্পণই স্থাপিত বিধি। যজমান, কোনরূপ ফলকামনার সহিত যদি কোন যজ্ঞ ও অর্চ্চনা আরম্ভ করেনও, তাঁহার মনে তাঁহার প্রার্থনায় ও স্তবে তাঁহার স্বাভাবিক কামনা থাকিলেও, একমাত্র ব্রহ্মার্পণ-বিধিকর্ত্তৃক সমস্ত অনুষ্ঠানই "নির্ম্মলকর্ম্মযোগ" ও "নিষ্কামধর্ম্মরূপে" পরিণত হইয়া আছে। কিন্তু ইহা বলা বাহুল্য যে কামনার অধিকারে কর্ম্মযোগ ব্যর্থ হইলেও মন্ত্রশক্তি ব্যর্থ হইবার নহে।

৭১। যাহাহউক, শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে সমস্ত বৈদিকযজ্ঞ এবং দেবিপাদপদ্মে সমস্ত তান্ত্রিক ক্রিয়া অর্পিত হওয়ার এই চিরপ্রচলিত পদ্ধতি ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে যে, শ্রীবিষ্ণু এবং মহাদেবী উভয়ই ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইয়াছেন এবং তাহাতেই ব্রহ্মার্পণন্যায় সার্থক হইয়াছে। শ্রীসদাশিব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি ঈশ্বরের অন্যান্য সংজ্ঞাও ঐরূপ অর্পণ-বিধির অন্তর্ভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই উভয় পদ্ধতি ব্যতীত ব্রহ্মার্পণের অন্য অর্থ, কর্ম্মযোগের অধিকারে হইতে পারে না। অতএব এই সমস্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াই "কর্ম্মযোগ" শব্দের বাচ্য। গীতা প্রভৃতি কর্ম্মযোগপ্রতিপাদক যোগশাস্ত্রের অন্য অর্থ, যজ্ঞাধিকারে অসম্ভব। অতঃপর ইহাও স্মরণে রাখা উচিত যে, যজ্ঞাধিকারে, যখন সমস্ত ক্রিয়াই "কর্ম্মযোগের" আকার ধারণ করিয়াছে তখন কেবল বিধিপর বা ফলার্থ নিরীশ্বর ক্রিয়া এখন আর নাই। আমি সংকল্প ও অর্পণ সম্বন্ধে এতদুর যে নিবেদন করিলাম তাহা ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত।

(১১) মহাশক্তি বা মহামায়া (শেষ)।

৭২। এক্ষণে মহাশক্তিবিষয়ক প্রসঙ্গ শেষ করিব। মহাশক্তিস্বরূপিণী মহামায়াদেবী পরব্রহ্মেরই শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা বিমলা শক্তি। তিনি সৃষ্টিরূপ বিকারের অতীত, শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ, ব্রহ্মপদ হইতে অস্বতন্ত্রা। কেবল জীবের কর্ম্মব্যপদেশেই রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত-উপাদান ন্যায়ে তিনি জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়ের হেতুভূতা। নতুবা তিনি উপাদানময়ী ও কর্ম্মরূপিণী সমলা প্রকৃতিরূপে পরিণত হন নাই। সে প্রকৃতি জীবের মায়াবন্ধন মাত্র। সেই প্রকৃতি হইতে জীব স্বতন্ত্র এই বিবেকজ্ঞানে অথবা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে ঐ বন্ধন বিনাশ পায়।

৭৩। বেদে আছে—

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" (শ্বেতাশ্বতর উ) দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্তস্য মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং ন সাংখ্য পরিকল্পিত প্রধানাদিব পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং। অথবা দেবতাত্মনা ঈশ্বররূপেণাবস্থিতাং শক্তিং। অথবা দেবস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাং তু জগদুদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাং শক্তিমিতি।

"দেবাত্মশক্তি" পরমেশ্বরের যে শক্তি তাহা তাঁহার আত্মভূতা। তাহা তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। তাহা সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধানের ন্যায় পৃথগ্‌ভূতা অচেতন শক্তি নহে। অথবা এমনও বুঝিতে, পার যে, সে শক্তি ঈশ্বররূপেতে অবস্থিত দেবতাত্মিকা চৈতন্যময়ী শক্তি। অথবা ইহাও বুঝিতে পার যে উক্ত শক্তি পরমেশ্বরের আত্মভূতা, জগদুৎপত্তি, স্থিতি, লয়ের হেতুভূতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মিকা শক্তি। ঐ শক্তিস্বকীয় সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের দ্বারা নিগূঢ় পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী। (শাঃ ভাঃ)